তিমুর
পুলাতভ

আলোকপাতের মুহূর্তে

তিমুর পুলাতভ আলোকপাতের মুহূর্তে

তিমুর পুলাতভ

আলোকপাতের মুহূর্তে

বড়গল্পের সংকলন

রাদুগা' প্রকাশন
তাশখন্দ

অনুবাদ: পূর্ণিমা মিত্র

অঙ্গসজ্জা: মেদাত কাগারোভ

ТИМУР ПУЛАТОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

На языке бенгали

TIMUR PULATOV

STORIES

In Bengali

$П \frac{4702570200—657}{031(05)—88}$ 099—88

© বাংলা অনুবাদ • অঙ্গসজ্জা • 'রাদুগা' প্রকাশন • তাশখন্দ • ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001766-1

কাইপের দ্বিতীয় যাত্রা

১

কাইপের সেই বয়স বহুদিনই পেরিয়ে গেছে যখন মানুষ হঠাৎ কোন কারণে মরে কোন অল্পস্থায়ী রোগে, সর্দিগর্মিতে, সাপের কামড়ে বা মাছের বিষে, চোখকানা হওয়ায় বা কানে শুনতে না পাওয়ায়, কাশি হয়ে বা কুনজর লেগে; এমনিতেই, পূর্বপুরুষদের তাকে এবার নিজেদের কাছে ডাকবার সময় এসেছে।

সকালবেলায় উঠে বুড়ো বেরিয়ে আসত উঠানে, উটের চামড়ার বিছানাটা মেলে দিত বেড়ার ওপর আর দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবত আর ভাবত...

কাইপ ভাবত, কি করে উদ্ভব হল প্রথম মানুষের, যার থেকে এই দ্বীপে পরে জীবনের সৃষ্টি হল। প্রকৃতি তাকে কি দিয়ে তৈরী করেছিল ?

আগে কাইপের মনে হত যে ঘূর্ণিঝড়ের থেকে প্রথম মানুষের সৃষ্টি। পাহাড়ে যে গুহাটা আছে সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ঘূর্ণিঝড়টা নতুন আনন্দে বালি উড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। এগিয়ে চলল ছোট ছোট পাহাড়গুলোর গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে, চিলগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়ে যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে থামল এসে একেবারে জলের কাছে। আর তখনই তো জল, বাতাস আর সূর্যের প্রচেষ্টায় ঘূর্ণিঝড় পরিণত হল এক মৃত্তিকা স্তম্ভে আর ঐ স্তম্ভটা, চিলেদের বিস্মিত করে দিয়ে, সমুদ্র থেকে উঠে এল মানুষ হয়ে।

কবে যেন এরমালাইয়ের সঙ্গে মাঠে বসে থাকার সময় কাইপ বন্ধুকে নিজের এই আবিষ্কারের কথা বলেছিল পাহাড় থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় দেখিয়ে।

ধূলি-স্তম্ভটা লক্ষ্য করতে করতে কাইপ বার্ধক্যসুলভ ধীর উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'দেখ্, মানুষ।'

অপেক্ষা করতে লাগল সে যে ঘূর্ণিঝড়টা এগিয়ে আসবে আর এরমালাই দেখতে পাবে বালি দিয়ে এলোমেলোভাবে আঁকা একটা মানুষের বিষণ্ণ প্রতিচ্ছবি।

তাকিয়ে রইল এরমালাই কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না— দৌড় লাগাল বাড়ীর দিকে কারণ ঘূর্ণিঝড় তার বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে বাড়ীর ছাত, দরজা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আর কাইপকে ফেলে দিল ঘূর্ণিঝড়টা, তার দেহের আধখানা চাপা পড়ল বালির তলায়। বুড়ো প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল — তার পাড়া-প্রতিবেশীরা যাদের প্রতি বহুদিনই আর কোন আগ্রহ নেই তার, তারা তাকে ঠিক সময়ে খুঁড়ে বার করেছে এই রক্ষে।

আর একবার কাইপের চোখ খুলে দেয় একটা সাপ। উটের চামড়ার তলায় সাপটাকে দেখতে পেয়ে বুড়ো সেটাকে রোদে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সন্ধেবেলা দেখে সাপটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে কেবল চোখগুলো বাদে।

সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল কাইপ: রোদে জন্তুটার শরীরের সব রস শুকিয়ে গেছে, কেবল চোখগুলি আগের মতই জীবন্ত।

'এই দেখ,' কাইপ এরমালাইয়ের কাছে সাপটা নিয়ে এসে বলল, 'দেখছিস, সাপের চোখ কখনও মরে না, কারণ ওরা কোন কিছুতে দুঃখও পায় না, বিস্মিতও হয় না।' বলে এরমালাইকে নিজের চোখগুলি দেখাল যাতে সে সাপের চোখগুলির সঙ্গে তুলনা করতে পারে।

কাইপ জানত যে সাপ হল গাছের শিকড়। ওরা মাটিতে নেমে এসে বালির মধ্যে ডুবে গিয়েছে কারণ হাওয়ার থেকে বালির নীচে জীবন আছে বেশী, আর ঐ বালি থেকেই দ্বীপে প্রথম মানুষের সৃষ্টি।

এরমালাই কাইপের কথা শুনছিল আর এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন সে একমত বন্ধুর সঙ্গে, যদিও অন্য কারুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তার একটুও আগ্রহ নেই, আর সবার মত সেও জীবনধারণ করে কেবল নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে...

সমুদ্র তাদের থেকে ক্রমশই দূরে চলে যাচ্ছে। আর লোকেরা বলছে: মাছ চলে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে, যেমন তাদের পূর্বপুরুষরা বলত: আমাদের থেকে বন সরে গেছে, আরো আগে বলত: নদী সরে গেছে; তারা জানত যে প্রকৃতিতে যা কিছু দুর্বল সরে যাবে মরুভূমিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে...

রাতের বেলায় দ্বীপে সবাই যখন মাছের ঝাঁকের আসার অপেক্ষায় ছিল বুড়ো হঠাৎ চিলের স্বপ্ন দেখল। গুঙিয়ে জেগে উঠল কাইপ আর অনেকক্ষণ বসে রইল বিছানায়, বুঝল এবার তার মরার সময় এসেছে: চিল এরই লক্ষণ।

বুড়ো ইতিমধ্যে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত। সবকিছুই করে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয়: জলের থেকে লতাপাতা তুলে ছাতটা ঢেকেছে নতুন করে — বাড়ীতে এখন থাকবে ছেলে আর ছেলের বৌ; যার সঙ্গেই কোন মনকষাকষি ছিল, মিটিয়ে নিয়েছে; যার কাছে যা নিয়েছিল, সব ফেরত দিয়েছে; খাওয়াদাওয়ার সংযম করেছে, যাতে শরীরের রস ছোটখাট ব্যাপারে শুকিয়ে না যায়। আর ছেলেকেও শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়েছে আকচির কারখানা থেকে দ্বীপে বউয়ের কাছে ফিরে আসতে আর তার বদলে বাড়ীর আর সমুদ্রের কাজের ভার নিতে।

মৃত্যুর ব্যস্ততায় কাইপের ভয় হচ্ছিল। সে জানত যে অন্য দীর্ঘ ক্লান্তিকর জগতে তাকে চলে যেতে হবে। সেখানে ভাল, খারাপ, সবাইকেই চলে যেতে হয়, ঐ জগতটা খুবই কাছে, তার চারপাশের বালির মধ্যে...

তার ভয় হচ্ছিল যে বালিতে পরিণত হয়ে নতুন জীবনে অনেক দিন ধরে ভেসে বেড়াবে, বেঁচে থাকা লোকদের ঝামেলা বাড়িয়ে।

হাওয়া তাকে এলোমেলো করে দিয়ে দ্বীপময় ছড়িয়ে দেবে, সমুদ্রের মধ্যে নেমে যাবে সে আর মাছ তাকে গিলে ফেলবে, পেটের মধ্যে করে বালি বয়ে নিয়ে বেড়াবে। সেখান থেকে গিয়ে পড়বে অজানা শহরে, মরুদ্যানে; এইভাবেই ঘুরে চলবে অনন্তকাল ধরে শান্তি পাবার প্রচেষ্টায়, আর শেষ পর্যন্ত শান্তি পাবেও না সারা পৃথিবীতে।

কাইপ জানত যে এইসব প্রস্তুতিতে কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেছে। তার মানে আর একটুও দেরী না করে আজই রওনা দিতে হবে সবুজদ্বীপের উদ্দেশে — সেখানেই কাইপের জন্ম, সেখান থেকেই কবে যেন সে চলে গিয়েছিল আয়েষাকে শাস্তি দেবার জন্য... কবেকার ঘটনা সে সব ? শুকনো ঠোঁটগুলো চেটে নিল বুড়ো... যখনই বুড়ো আয়েষার কথা ভাবে তখনই খুবানির গন্ধ তাকে তাড়া করে ফেরে। কেন এমন হয় ?

কিছুদিন আগে সমুদ্রে তার সবুজদ্বীপের এক জেলের সঙ্গে দেখা হয়, তার মুখে শোনে যে আয়েষা বেঁচে আছে, একা থাকে। আগের মতই

জলের থেকে লতাপাতা তোলে, মাছ ধরে গরম বালিতে পুঁতে দেয় আর তারপর সেগুলিকে দ্বীপে বেড়াতে আসা লোকদের কাছে বিক্রী করে।

যেখান থেকে কাইপ চলে গিয়েছিল সেখানেই তার বাবা আর বংশের সবাইকে কবর দেওয়া হয়েছে।

আর আজ ওরা তাকে কাছে ডেকেছে। যেতে হবে। যদিও সবুজদ্বীপ এখান থেকে আবছা দেখা যায় — কাছেই সবুজদ্বীপ, তবুও সেখানে গিয়ে পেঁৗছান খুব সহজ নয়।

নৌকা দরকার। কাইপের নিজের নৌকা নেই। নেই এরমালাইয়েরও বা অন্যদেরও — সমস্ত নৌকা নিয়ে নিয়েছে জেলের দল: প্রতি মুহূর্তে মাছের ঝাঁক এসে পড়ার অপেক্ষায় আছে। সভাপতি আরালভ বিশেষ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যাত্রা এবং ব্যাক্তিগত নৌকাচালনা স্থগিত রাখার আদেশ দিয়েছেন।

গ্রামটা ফাঁকা। দু'রাত হল সবাই সমুদ্রতীরে পাহারায়। কেবলমাত্র ভেড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাড়ীগুলির ভিতর উঁকি মেরে দেখে দেখে আর দোরগোড়া শুঁকে শুঁকে।

বুখারা থেকে আসা মুচীরা বালির ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজেদের চারদিকে দড়ি বিছিয়ে দিয়েছে যাতে বিছে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে না পারে।

এক সপ্তাহ আগে দ্বীপে এসে আটকে গেছে তারা মাছের ঝাঁক আসার কারণে। যাতে শুধু শুধু সময় নষ্ট না হয় সেই জন্যে বৈষয়িকবুদ্ধি সম্পন্ন বুখারাবাসীরা সারাদিন ধরে দ্বীপের লোকেদের চুল কেটে দিয়েছে, গোঁফ-দাড়ি ছেঁটে দিয়েছে।

ঘুমন্ত লোকগুলির পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মদের কলস হাতে অসেতিনজাতির লোক ভন্নাদিমির। মুচীরা দিনের বেলায় তার মাটির নীচের কুঠুরীতে বসে মদ খেয়েছে, তাই ভন্নাদিমির ভাবল হয়ত রাতেও কারুর ইচ্ছে হবে খেতে।

কাইপকে সালাম জানিয়ে ভন্নাদিমির বিষন্নভাবে পা দুটো টানতে টানতে এগিয়ে চলল আলোকস্তম্ভের দিকে, তার পাহারাদার বন্ধুর সঙ্গে মদ খেতে।

একটু আগে হাওয়ায় উড়িয়ে এনে গাদা করা বালির ঢিপির কাছে জামাকাপড় ছাড়তে লাগল কাইপ।

জামাকাপড় পুরোপুরি ছেড়ে ফেলে বসল, পাদুটো বালির মধ্যে

গুঁজে দিল আর গাটা রগড়াতে লাগল যাতে যাত্রার আগে শরীরের রক্ত চলাচল ভাল হয়।

তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে সে অগভীর জলে হেঁটে বেড়াল আর গভীর জলের জায়গা খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তীরের কাছেই শুয়ে পড়ল।

পরিষ্কার জামাকাপড়ের পোঁটলাটা বুড়ো তীরে রেখে দিয়েছে। পোঁটলাটার কাছে বসে কাইপের দিকে তাকিয়ে আছে এরমালাইয়ের ছেলে প্রোশকা, বছর চোদ্দ বয়স, বয়স্কলোকদের মত ক্লান্ত মুখচোখ।

ওর বাবা ওকে পাঠিয়েছে বুড়োকে দেখে আসতে আর যদি বুড়োর অসুখ হয়ে থাকে তাহলে মাছের তেল দিয়ে আসতে।

বুড়োর কিন্তু কোন অসুখ বিসুখ নেই। একা বসে বসে বিরক্তি ধরে গেল প্রোশকার, সেও কাইপের কাছাকাছি সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

এবারে কিন্তু কাইপ তার দিকে তাকাল চোখে বিরক্তি নিয়ে — বুড়োর একা থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

‘তুই কি আমার পিছু নিয়েছিস?’ জল থেকে উঠে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করল কাইপ।

‘বাবা বলেছে আপনাকে মাছের তেল খেতে দিতে।’

‘কি হবে আমার ওতে? ফেরত নিয়ে যা... না, দাঁড়া, তুই কি জেটি থেকে আসছিস?’

‘হ্যাঁ। দলনেতা এসেছিল। সবাইকে বকাঝকা করে চলে গেল।’

‘নৌকাগুলো সব বাঁধা আছে?’

‘সবকটা। বাবা বসে পাহারা দিচ্ছে... মাছ ধরতে যাবেন?’ বাঁকা হাসি হাসল প্রোশকা।

‘তাতে কি? ধরে তো সবাই...’

প্রোশকা বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, তখনও বুঝে উঠতে পারছে না কাইপ ঠাট্টা করছে নাকি সত্যি সত্যি চুরি করবার ঠিক করেছে — এমন অন্যায় কাজ বুড়ো কোনদিনও করে নি, এমনকি খুব কষ্টের দিনেও না।

‘যা পালা।’ গোপনতার সুরে বলল কাইপ, তার বলার সুরে প্রোশকা বুঝল বুড়ো সত্যি সত্যি রাতে লুকিয়ে মাছ ধরতে যাবার ঠিক করেছে আর তাকে এ ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলছে।

প্রোশকা চলে গেলে কাইপ জামাকাপড় পরে নিয়ে হাঁটা দিল জেটির দিকে, ভাবল আর কেউ তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না, বিরক্ত করবে না।

এই দ্বীপের বাসিন্দা কুড়িটা পরিবারের সবাই এত রাতে বাঁধের ওপর আছে। এরা হল কাজাখদের পরিবার আর তাদের আত্মীয় কারাকালপাক, তাজিক, উজবেক আর একশ' বছর আগে এখানে বসতিস্থাপন করতে আসা উরাল অঞ্চলের কসাকদের পরিবারগুলি।

চৌকিদারের নির্দেশ ছিল কেউ যদি সমুদ্রে লঞ্চ বা আকাশে রকেট জ্বলে ওঠা দেখতে পায় তবে যেন সবাইকে জাগিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করতে হবে।

জেলেদের নিজের নিজের নৌকা নিয়ে যেতে হবে নদীর মোহনার কাছে, উত্তরের দ্বীপের দিকে, যেখানে পাহারায় আছে সভাপতি আরালভ, যোগ দিতে হবে আশপাশের অন্যান্য দ্বীপগুলির জেলেদের সঙ্গে।

কারুরই নিজের ইচ্ছেমত কোন কিছু করার অথবা এই দিনগুলিতে কোন অজুহাতে দ্বীপ থেকে চলে যাবার অধিকার ছিল না, এর জন্য কঠিন শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছিল।

একটা বিরাট মাছের ঝাঁক দ্বীপটা পেরিয়ে নদীর মোহনার দিকে যাবে ডিম ছাড়তে, তারই অপেক্ষা করছিল সবাই। এখানেই ওঁৎ পেতে ঐ ঝাঁকটাকে ঘিরে ফেলে ধরতে হবে।

একবার ইতিমধ্যে জেলেদেরকে সংকেত জানিয়ে কাজে নামানো হয়েছিল কিন্তু যখন তারা নদীর মোহনা পর্যন্ত গেল দেখা গেল যে তাদের ফিরে যাওয়া দরকার — মাছের ঝাঁক অন্যদিকে চলে গেছে, যেদিকটার কথা কেউ ভাবে নি, নাকি যারা লক্ষ্য করার কাজে ছিল ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাদের চোখের ভুল হয়েছে।

বাঁধের ওপর ওই সরু জায়গাটায় এখন রান্না, খাওয়া, ঘুম ভালবাসা সবই চলছে। বুড়ো কালিখান কাল এইখানেই চোখ বুঁজল।

নলখাগড়ার মধ্যে লুকিয়ে কাইপ লক্ষ্য করতে লাগল ঘুমন্ত লোকগুলোকে, দেখল বদরাগী বুড়ো চৌকিদার মসুলমানবেক হাতে ধিক ধিক করে জ্বলা মশাল ধরে ঝিমোচ্ছে।

আবছা অন্ধকারে আর সবাইকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কেবল তাদের বসে থাকার ভঙ্গী দেখে কাইপ তাদের চিনল আর তাদের নাম, ডাকনামও মনে করতে পারল — কাশ্চা, পালোয়ান, মাকুন্দ ভানকা...

কেন কি জানি কাইপের মনে পড়ল দলনেতা একবার তদারক করতে এসে ঠিক এইভাবেই নলখাগড়ার মধ্যে লুকিয়ে ঘুমন্ত লোকগুলিকে নিয়ে মজা করার জন্য সমস্ত শক্তিতে চীৎকার করে উঠেছিল, 'এই কাশ্চা!' আর

বুড়ো যে হাড়টা হাতে নিয়ে চিবোতে চিবোতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেটা হঠাৎ খসে পড়েছিল হাত থেকে। সবাই জেগে উঠে হাসতে আরম্ভ করেছিল আর চীৎকার করছিল, 'কাশ্চা, কাশ্চা!' ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল বুড়োকে বালিতে আর বুড়ো লজ্জায় অন্ধকারে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছিল।

নৌকাগুলো গায়ে গায়ে ঘষা লাগছে, হাওয়ায় তাদের আগাগুলো ধাক্কা খেয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না নৌকাগুলোকে, ছোট খাঁড়িটায় নলখাগড়ার মধ্যে লুকান, সেখানে পাহারায় আছে এরমালাই। কাইপ জল থেকে উঠে, নিঃশব্দে চুপি চুপি এরমালাইয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বসল। সজাগ এরমালাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল আর বুড়োর মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন দেখে তাকিয়ে রইল কাইপের দিকে।

নুনে জ্বলে যাওয়া মুখের গভীর ভাঁজগুলো মিলিয়ে গেছে, গালের যে জায়গায় আগে দাড়ি গজাত না সেখানেও কালো দাড়ি দেখা দিয়েছে, আর প্রহরারত বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকা মিনতিভরা চোখ থেকে রুগ্ণ হলুদ আভা উধাও হয়ে গিয়েছে আর চোখের থেকে অনবরত জল পড়ছে না আগের মত।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এরমালাই।

কাইপ বুঝতে পারল না, কি দিয়ে আরম্ভ করবে।

'মনে হচ্ছে তোমার শরীর খারাপ!' বিস্মিতভাবে বলল এরমালাই।

'আমার একটা নৌকা দরকার। ভোরের দিকে ফিরে আসব।' বলল কাইপ।

বলে নিজেই অবাক হয়ে গেল, এই কারণে নয় যে সহজেই মিথ্যা বলে দিল যদিও মিথ্যাকথা বলার কোন অধিকারই তার নেই। অবাক হল এই কারণে যে এরমালাই কিছু না জিজ্ঞাসা করেই সম্মতি জানাল। বুড়ো জানত না যে প্রোশকা তার সঙ্গে কথা বলার পরে বাবার কাছে ছুটে এসেছিল, 'দেখছ বাবা, এখন কাইপচাচাও মাছচুরির চেষ্টা করছে, আর তুমি বলতে, মহান লোক...' — 'থাম, তুই সবকিছু বুঝিস না এখনো।' ভাগিয়ে দিয়েছিল প্রোশকাকে সে আর যতক্ষণে কাইপ জেটির কাছে এসে পেঁাছেছিল ততক্ষণে সে অনেককিছু আবার নতুন করে চিন্তা করেছিল, বুড়োর কোন দোষই খুঁজে পায় নি, বিষাদে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল তার।

বোধহয় কাইপের আজ মাছ ধরতে ইচ্ছে হয়েছে। প্রতিরাতেই চৌকিদারদের এমন অনেক অনুরোধ শুনতে হয় আর তারা যখন নিশ্চিত জানে যে আজ মাছের ঝাঁক ধরার জন্য নৌকা কোন কাজে লাগবে না তখন

নিজের ওপর দায়িত্ব নিয়ে রাজী হয়। এই চুরির হিস্যা হিসেবে পরে তারা ধরা মাছের কিছু অংশ নিজের জন্য নেয়।

'তুমি ভোরের আগে ফিরে আসতে পারবে না।' ঠাণ্ডামাথায় চিন্তা করে বলল এরমালাই।

'পারব, পারব,' আশ্বাস দিল কাইপ, 'চিন্তা কোরো না।'

'দেখো!' আরো বেশী জোর দিয়ে বলল এরমালাই, মনে মনে তার একটু রাগ হল যে কাইপ তার এই রাতের অভিযানের খুঁটিনাটি কিছুই তাকে বলছে না।

অতিকষ্টে তারা এগিয়ে গেল খাঁড়ির দিকে, জলে জন্মান লতাপাতায় পা জড়িয়ে যায়, গোটা সমুদ্রতীরটা এই লতায় ভরা। নলখাগড়ার মধ্যে জমে থাকা ভাপের কারণেও কষ্ট হচ্ছিল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যেইমাত্র নলখাগড়াকে নোয়ানো হচ্ছিল অমনি ভাপে তাদের আপাদমস্তক ঢেকে যাচ্ছিল, আঠাল হলুদ রসে তাদের সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল।

একবার ওদের সামনে কিছু লোক দেখা দিল। তারা নলখাগড়ার মধ্যে থেকে তীরে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণে দাঁড় বাইছিল, চেঁচামেচি, গালিগালাজ করছিল, যত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল পথ হারিয়ে তত বেশী করেই লতাপাতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছিল।

কাইপ গা ঢাকা দিল আর এরমালাই নৌকাগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে লাগল।

বোঝা গেল এরা হল পাশের দ্বীপের জেলেরা, ভুল সংকেত পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বালিদ্বীপের লোকেদের মতই তারাও মাছের ঝাঁকের অপেক্ষা করছে — মাঝরাতে তারা আদেশ পায় বালিদ্বীপের দিকে যেতে সেখান থেকে যেন মাছের ঝাঁকটার আসার কথা।

এরমালাই তাদের সবকিছু বুঝিয়ে বলল, তারা আশ্বস্ত হয়ে খুশী মনে নৌকা ফেরাল।

সমুদ্রে অনেকক্ষণ ধরে শোনা যাচ্ছিল তাদের গলা, তারপর নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ, তারপর যখন তারা অনেকদূরে চলে গেল, তাদের মধ্যে একজন গান গেয়ে উঠল।

তার গলাটা সমুদ্রে চাপা আর বিকৃত হয়ে গিয়ে শোনাচ্ছে যেন পথহারান পাখীর চীৎকারের মত, তারপর সবকিছু আবার শান্ত হয়ে গেল।

যখন তারা খাঁড়িতে নৌকাগুলির কাছে এসে পেঁছাল এরমালাইয়ের ইচ্ছা হল বন্ধুর সঙ্গে একটু বসে থাকতে, বিড়ি টানতে, কিন্তু কাইপ খুব তাড়াহুড়ো করছিল। আর আকাশের দিকে দেখাচ্ছিল, যেখান থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল উৎকণ্ঠাভরা তার নতুন দিনের ভোর।

তারা একটা বড় মজবুত নৌকা বেছে নিয়ে সেটাকে শিকলটা থেকে খুলল। ভেজা মাটিতে পা হড়কে গিয়ে পড়ে গেল কাইপ। থুতনিটা কেটে গেল, কিন্তু কোন ব্যথা অনুভব করল না সে।

সমুদ্রের মধ্যে অনেকটা চলে গিয়ে কাইপ নৌকায় চড়ে বসল শেষ পর্যন্ত।

এরমালাই ফিরে যায় নি। কাইপের নৌকার পেছন পেছন সে সাঁতার কেটে চলছিল আর নৌকাটাকে ঠেলছিল।

আর দ্বীপে, যেখান থেকে কাইপ চিরবিদায় নিল, সেইখান থেকে মশালের আগুন যেন তাকে শেষ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

তারপর জ্বলে উঠল আর একটা মশাল, আর একটা, তারপরে গোটা তীরটাই ছেয়ে গেল মশালের আগুনে যেন সেগুলো টিলার ওপরে উঁচু আলোকস্তম্ভের আলোটার সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক লাগিয়ে দিয়েছে।

যখন কাইপের চেতনা হল, তখন এরমালাই আর নেই নৌকার কাছে। কেবল দূরে জলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শুনে বুড়ো আন্দাজ করল যে বন্ধু দ্বীপে ঠিকই ফিরে গেছে।

৩

কাইপের এখন আফসোস করার বা স্মৃতিভাণ্ডার ঘাঁটার সময় নেই। ভবিষ্যৎ ভাবারও দরকার নেই — এরপর কি হবে সবই তার আজানা।

এগিয়ে চলল তার নৌকা। সমুদ্রের প্রতিটি পাহাড়, ডোবা পাহাড়, স্রোত সে জানে।

একটু পরেই নৌকাটা পেঁছে যাবে সেই জায়গায় যেখানে দ্বীপের কাছে সমুদ্র এসে পড়েছে, তারপর পিছনে পড়ে থাকবে দু ভাগ হয়ে যাওয়া পাহাড়টা যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে কানা আলোকস্তম্ভটা, তারপর আরো এগিয়ে যাবে নদীর স্রোতে ভেসে।

চিরমন্থর এই নদীটা সমুদ্রে পড়ে প্রচণ্ড দ্রুতগতি নিয়ে, সব বাধা ডিঙিয়ে ছুটে চলে; নৌকাটাকে নিয়ে যায় দারুণ টানে আর একসঙ্গে

ঘুরপাক খেতে থাকে। যদি একবারও হাত কাঁপে বা জেলে আলস্য করে, তাহলেই তিনবার বা পাঁচবার পাক খাবার সময়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারে সমুদ্রে। নৌকা উল্টে যায়, আর জেলের ওপর গাছের গুঁড়ি, পচা বাক্স সবকিছু এসে পড়ে। নৌকাকে বাঁচানর জন্য যথেষ্ট সাহস আর দক্ষতা চাই।

কিন্তু তারপর অন্য একটা ধীর স্রোত নৌকাটাকে নিয়ে যাবে একেবারে সবুজদ্বীপ পর্যন্ত — শান্তি, আরাম।

কিন্তু এখানেও বিশ্রাম বেশীক্ষণের জন্য নয়। সবুজদ্বীপের কাছের জলে নৌকা নিয়ে আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

কাইপ শুনেছে কখনও কখনও জোয়ারের সময়ে নৌকা কিছুতেই তীরে লাগান যায় না। সমানভাবে দ্রুতগতিতে যেতে যেতে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করে নৌকাটা দ্বীপটাকে বেড় দিয়ে। দ্বীপের থেকে কি যেন একটা নৌকাটাকে টেনে নিজের কাছে ধরে রাখে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না জোয়ার থেমে ভাটা আসে।

তীর থেকে অবশ্যই নৌকাটাকে দেখতে পাওয়া যায় আর দড়ি ছুঁড়ে টেনে আনা যায় তীরে। কিন্তু তীরে হাসপাতালের কাছে বেশীর ভাগ সময়েই রোগীরা বসে থাকে। তারা কেবল একটাই কাজ করতে পারে, রোগী নয় এমন কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকতে, যদি তেমন কেউ ঘুরে বেড়ায় ধারেকাছে।

কেউ বলতে পারে না কি হয় স্রোতের ঐ সব দিনগুলিতে, কিন্তু সুখের কথা এমন দিন খুব বেশী আসে না। বেশীর ভাগ সময়ই সবুজদ্বীপের চারপাশের জল শান্ত, এমনকি মৃত, আর তীরের দিকে এগিয়ে যাওয়া নৌকাগুলোর কোন ভয় থাকে না।

দুবার দারুণ ভয়ঙ্কর দুটি পাক খেয়ে কাইপের নৌকা বিপদমুক্ত এলাকায় গিয়ে পড়ল। জল থেকে দাঁড়টা তুলে নিয়ে বুড়ো হাঁফাতে হাঁফাতে শুয়ে পড়ল নৌকার মধ্যে — জ্বরভাব লাগছিল তার। সে এমনকি ভাবল যে স্রোতের সঙ্গে এই লড়াইয়ে সব শক্তি হারিয়ে সে আর বোধহয় উঠতেই পারবে না। কিন্তু বুড়োর যে ইচ্ছে হচ্ছিল অনেক কিছু দরকারী কথা বলতে নিজের সঙ্গেই, এই সমুদ্র, যেখানে তার জীবন কেটেছে তার সঙ্গে, মাছেদের সঙ্গে, শঙ্খচিলেদের সঙ্গে।

বাবা ইসখাকের কথা ভাবল কাইপ: 'আমার জন্ম দিয়েছে, জগৎ দেখে বেড়াতে ছেড়ে দিয়েছে, এবার বলেছে: যথেষ্ট হয়েছে, ফিরে আয়। আমিও এইভাবে আমার ছেলেকে ডাকব। আমাদের বংশে আমরা কেউ পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারি না; আমরা সবাই মাছ হয়ে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াব।'

আর সঙ্গে সঙ্গে চেতনার গভীর থেকে ভেসে উঠল তার ছেলেবেলার কথা, যা সে সব থেকে ভাল আর পরিষ্কার মনে করে রেখেছিল।

'সে বছর মোটে মাছ ধরতে পারি নি আমরা — ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে...' মনে পড়ছিল বুড়োর। 'এখন তো সমুদ্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর যখন রেগে যায় তীরে গিয়ে ওঠে, তারপর আবার শান্ত হয়, ফিরে যায় পাথর, ঝিনুক নিয়ে ...সমুদ্র ভাল হয়ে গেছে এখন। আর সেই বছরে তার প্রয়োজন হয়েছিল মানুষের দেহের...

'বাবা মাটির কলসী তৈরী করত, পোড়াত। তারপর সমুদ্রে ডুবিয়ে দিত সেগুলো, কিনবে কে! 'আমাদের পয়গম্বর শাহ্ সুলেমান জিনগুলোকে ধরে ধরে আমার কলসীগুলোতে বন্ধ করবে।' বিষণ্ণভাবে ঠাট্টা করত বাবা...

'বাবা নিজের জন্য নতুন ঘর তৈরী করল, আমাকে আর মাকে পুরনো ঘরটাতেই রেখে দিল। মা পাগল হয়ে যাচ্ছিল, একটু আদর পেতে ইচ্ছে হত মা'র, কিন্তু বাবা মাকে তাড়িয়ে দিত। আশ্চর্য, বুড়ীদের কামনাবাসনা বুড়োদের থেকে বেশীদিন ধরে থাকে আর সত্তর বছরের কাছাকাছি পেঁাছে তাদের আবার কুমারী বয়সের পাগলামি আরম্ভ হয়।

'যেদিন বাবা চিলের স্বপ্ন দেখে, সেইদিন সকালে মা আর আমি উঠানে কাজ করছিলাম। মা ভাবল যে বাবা কাঠকুটো কুড়োতে যাচ্ছে তাই আমাকে বলল একটা দড়ি দিয়ে আসতে বাবাকে। বুড়ীরা কখনও বুঝতে পারে না তাদের স্বামীরা কখন চলে যাবে। আসলে বুড়োরাও জানে না। আমিও তো আমার বুড়ীর কথা জানতাম না। অতি সাধারণভাবে মরে আমার বুড়ী, যেমন সাধারণভাবে সে বেঁচেছিল ঠিক তেমনিভাবেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মরে গেল — বিদায়ও নিল না। বুড়ীদের বোধহয় কেউ ডাকে না। পুরুষমানুষরা তাদের নিষ্ফলা, দেহহীন দ্বিতীয় জীবনে নিজেরা নিজেরাই থাকতে চায়...

'নদীটা শুকিয়ে গিয়েছিল। পায়ের তলায় নুনের ডেলাগুলি মড়মড় করছে। আশ্চর্য, বাবা যাচ্ছিল নদীর তলে চোখ রেখে, ভয় পাচ্ছিল কোন পোকামাকড়কে মাড়িয়ে দেবে। আর ঐ পোকামাকড়গুলো সাহস পেয়ে বাবার প্যান্টে বসছিল, পা আঁচড়ে দিচ্ছিল...

'একটুপরেই বাবা সাধারণত যে জায়গাটায় ফাঁদ পেতে রাখত সেখানে এসে পেঁাছাল। হাঁটু গেড়ে বসে বাবা আধমরা খরগোসটিকে মুক্ত করে দিল। মনে হয়েছিল যেন বাবা বরাবরের মত খরগোসটার ঘাড় মটকে,

শিকার পাওয়ায় খুশী মনে সেটাকে লুকিয়ে ফেলবে জামার মধ্যে। কিন্তু বাবা নিজের জামাটা ছিঁড়ে ফেলে তা দিয়ে খরগোসটির আহত পাগুলি সযতনে বেঁধে দিল। ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য সাকসাউল গাছের শিকড়ের প্রলেপ দিল। তারপর জন্তুটির গলার মধ্যে নিজের জিভ ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে নিজের শরীরের আর্দ্রতা দিল... খরগোসটি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল, এদিক ওদিক তাকিয়ে চলে গেল মরুভূমির দিকে...

'নিজের দীর্ঘ জীবনে বাবা অনেক অসহায় জন্তু মেরেছে, ঘাস, ঝোপ ছিঁড়েছে, জ্বালিয়েছে, মরুভূমি খুঁড়েছে, সমুদ্রের জীবন্ত প্রাণীগুলোকে ধরেছে — পরিবারের খাবার জোগাবার জন্য সমস্ত রাখাল, শিকারী, জেলে তাই করে। আর এখন যখন প্রকৃতি তাকে ডাক দিয়েছে নিজের কাছে, তখন বাবার ইচ্ছা হল যতটুকু পারা যায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার, প্রকৃতিতে কিছুটা ক্ষতিপূরণ করে দেওয়ার।'

'আমার ভয় হচ্ছিল,' মনে পড়তে লাগল কাইপের, 'আমি বাবার কাছে ছুটে গেলাম কিন্তু বাবা খরগোসটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। বাবা তখনই আধমরা হয়ে পড়েছিল। যেটুকু তার মধ্যে বেঁচে ছিল, সেটাই বাবাকে উঠতে সাহায্য করল। যেন বাবার আরো আশা হচ্ছিল। যেন জানত না যে জীবন্ত লোকই আসল ভাল কাজ করতে পারে আর অর্ধমৃত লোক সবকিছু গুলিয়ে আরো জটিল করে ফেলে।

বাবা চলতে থাকল ঝোপঝাড়গুলো ঠিক করে দিতে দিতে আর বিভিন্ন জীবজন্তুকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে করতে, ইতিমধ্যে হাওয়া তার শরীরের সমস্ত তাপটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে মরুভূমিতে তাতে গরম আরো বেড়ে উঠেছে...

'আমি কেঁদে ফেললাম, গ্রামে ছুটে গেলাম লোক ডাকতে। যখন আমরা ফিরে এলাম, দেখি বাবা বালির ওপর শুয়ে আছে আর তাকে ঘিরে চিল ওড়াউড়ি করছে। বাবা খুশী হবারও সময় পায় নি। চিলেরা তো উড়ে এসেছে তার মরা দেহটা খেয়ে প্রকৃতিতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে...'

উৎকণ্ঠিত হয়ে কাইপ কষ্টে উঠে বসে নৌকার পাশটা ধরল।

চোখ কুঁচকাল আর হঠাৎ পরিষ্কার দেখতে পেল কুয়াশার মধ্যে সবুজদ্বীপের বিরাট কালো পাহাড়টাকে।

দেশ ! জন্মভূমি !

পাথর আর সবুজ টিলাগুলির মাঝে গাছে ঘেরা একটা ঝরণা। যারা সমুদ্রের বিষণ্ণ একঘেয়েমিতে অভ্যস্ত তাদের কাছে সবুজদ্বীপ এক বিস্ময়,

তারা মনে করে দীর্ঘ পথ আসার পরিশ্রমের দাম তারা পেয়ে গেছে। শুধু শুধুই কি আর এই সবুজদ্বীপে সমুদ্র থেকে যত রুগী এনে জড় করা হয়েছে একটা বড় হাসপাতালে।

শোনা যাচ্ছে মানুষের গলা, তীর থেকে নাকি দ্বীপের আরো গভীর থেকে, আর কি একটা যেন বড় ধাতুর জিনিস কাজ করছে দাঁতওয়ালা চাকা দিয়ে, যাঁতার আওয়াজ। কেবল আওয়াজ...

তীরের কাছে কি অবস্থা? জন্মভূমি তাকে গ্রহণ করবে নাকি তার নৌকাটাকে ছুঁড়ে দেবে দ্বীপকে ঘিরে দ্রুতবেগে ঘুরে বেড়ানর জন্য? জন্মভূমির প্রবেশপথে এসে মরা — এর থেকে লজ্জাজনক মৃত্যু আর কি কল্পনা করতে পারে মানুষ?

কাইপ দাঁড় নামিয়ে নৌকাটাকে এগোতে সাহায্য করতে লাগল। কিন্তু তার ফলে নৌকাটা একপাশে সরে গেল — নৌকাটা অজানার দিকে নিজের মনেই এগিয়ে যেতে চায়। মানুষের সাহায্য এখানে তার কাজে লাগে না।

শুয়ে পড়ল কাইপ, ক্লান্তি বোধ করল আবার। যা হবার তা হবেই, ভাবল বুড়ো, এর থেকে বেশী কিছু আশা করার আর মানে হয় না।

এইভাবে ও চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল, আর তার মুখেচোখে যে জলের ছিটা লাগছিল তাতে কাইপ বুঝল যে স্রোতের দিক বদল আরম্ভ হয়েছে...

'ওকে দেখতে পেলে হয় এখন,' ভাবল কাইপ। 'তীরে নামব... ও নিশ্চয়ই খুব বুড়িয়ে গেছে। ঐ জেলেটা বলছিল যে ও হাসপাতালের কাছে ঘুরে ঘুরে শুকানো মাছ বিক্রী করে। ওখানেই ওকে খুঁজে নেব আমি... ভাল কথা যে ছেলেকে খবর দিয়ে দ্বীপে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি ওর বৌয়ের কাছে। বুড়ো হয়ে দেখছি আমার মনটা ভাল হয়ে গেছে। আমাদের মনটা ভাল হয়ে যায় তখনই যখন আমরা ব্যস্ততা, তাড়াহুড়োতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অনেক দেরীতে ভাল হয়ে যায় আমাদের মন... আচ্ছা, যারা কখনও হীনতা বা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে, তারা সবাই কি অনুতাপ করে? নাকি এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে বিবেক বহুদিনই মরে গেছে? তারা কবরে যায় শূন্য, নির্দয় অবস্থাতেই। যেন তাদের কেউ কোনদিনই আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না...'

হঠাৎ বুড়ো কেমন এক অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেল — নৌকাটা ভীষণ দুলে উঠে একদিকে সরে গেল। কার যেন স্পষ্ট গলার স্বর শোনা গেল: 'দাঁড়া, নাহলে গুলি চালাব!' — নৌকার পাশে পাহাড়ের মত বড় কালো কি একটা বস্তু।

কাইপ উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। নৌকাটা আবার একটা জোর ধাক্কা খেল আর বুড়ো পড়ে গিয়ে নৌকার তলায় মাথাটা ঠুকে গেল তার। নৌকায় একটা দড়ি এসে পড়ল আর হুকুম শোনা গেল:

'বাঁধ !'

কাইপ আদেশ পালন করার জন্য দড়িটা হাতে নিল, কিন্তু এ সমস্ত কিছু এমন অপ্রত্যাশিত যে বুঝতে পারল না কোথায় বাঁধবে, কি বাঁধবে। ওকে যদি দেখিয়ে দিত তো ভাল হত।

ওরা বোধহয় তা বুঝল তাই আরম্ভ হল ধমকানি:

'গড়িমসি করছিস কেন? তাড়াতাড়ি! হ্যাঁ, ঠিক... গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যা। দড়িটা ছেড়ে দিস না যেন, শুনতে পাচ্ছিস? বাঁধ এবার! ওরকম না! গেরো দে...'

নৌকার আগায় বাঁধা দড়িটায় টান পড়ল। ওপাশ থেকে আবার গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা গেল আর কাইপের নৌকাটা চলতে থাকল কোনদিক যেন।

'ও বাঁচলাম,' খুশী মনে ভাবল বুড়ো, 'বাঁচলাম!' ভাবল ওকে নিশ্চয়ই সুজদ্বীপ থেকে দেখতে পেয়ে সাহায্য করতে এসেছে। এই ওদের কাজ বোধহয়, নৌকাগুলোকে বিপদের জায়গাটা পার করে দেওয়া।

কাইপের লজ্জা হল — যে সে শুয়ে আছে আর ওরা তার জন্য খাটছে। ভাবল উঠে যতটুকু পারে সাহায্য করবে। কিন্তু বুড়ো যতই ওঠার চেষ্টা করে ততবারই মুখে ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে আর ধাক্কা খেয়ে বুড়ো পড়ে যায়।

কাইপ দেখতে পেল যে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা লঞ্চ।

যখন লঞ্চ থেকে হুকুম শোনা যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন জনদশেক লোক হুকুম দিচ্ছে। কিন্তু এখন কেন কি জানি লঞ্চ ফাঁকা।

কোথায় গেল লোকগুলো? হয়ত নৌকাটা লঞ্চের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নৌকার পিছন পিছন সাঁতার কেটে যাবার জন্য যদি কিছু হয়। এমন তো হতে পারে যে দ্রুতগতিতে যাবার কারণে কাইপ জলে পড়ে যেতে পারে নৌকা থেকে, কাছে আছে ওরা, ডুবে যেতে দেবে না তাকে।

কেবল বড় বেশীক্ষণ ধরে যাচ্ছে তারা। কাইপের মাথাটা অনেকবার ঠুকে গেল নৌকায়। প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। কেবলমাত্র তখনও তার একটু আশা ছিল বলেই সে ভেঙে পড়ছিল না।

সুজদ্বীপে তো এতক্ষণে পেঁছে যাওয়া উচিত ছিল।

কি হয়েছে তাহলে? হয়ত বড় লঞ্চও জোয়ারের সময় তীরে লাগতে পারে না! হয়ত লোকেরা ইচ্ছে করেই লঞ্চ ছেড়ে গেছে যাতে ক্যাপটেন নিজেই এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে?

কাইপ চাইল কিছু করতে, কোন রকম সাহায্য করতে ক্যাপটেনকে যাতে হাল ছেড়ে না দিতে হয়, মরতে সে রাজী তখনই, যখন লড়াই করা অর্থহীন হয়ে পড়বে...

৪

লঞ্চটা ইতিমধ্যে ঠিকঠাকভাবেই এসে পেঁছাল নামহীন এক ছোট্ট দ্বীপে, কাগজে পত্রে যার উল্লেখ K 34 এই নম্বরে। খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে এসে থামল লঞ্চ। তার পেছনে কাইপের নৌকাও দুলে উঠে থেমে গেল।

'নাম!' হুকুম শোনা গেল।

হুকুম মানল কাইপ। তখনও তার মাথা ঘুরছে।

যে লোকটা হুকুম দিচ্ছিল মাথায় কাইপের দ্বিগুণ লম্বা, ইতিমধ্যে জলে নেমে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। যদি কাইপ মনে করে থাকে পালাবে তাহলে সে সতর্ক করে দেবার জন্য গুলি ছুঁড়বে।

'পাড়ে নাম। চালাকি করার চেষ্টা করিস না। কিছু ফল হবে না।'

ভোরের আলো ফুটে উঠল।

চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দ্বীপটাকে দেখল কাইপ, বোঝার চেষ্টা করল কোথায় ওকে নিয়ে এসেছে। ছোট্ট ন্যাড়া একটা দ্বীপ, লম্বায় গোটা পঞ্চাশ পা হবে। আলোকস্তম্ভ আর টিলার কাছে একটাই মাত্র ছোট্ট সাদা বাড়ী—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বুড়োর।

লোকটা—কাইপ ওকে আগে কখনও দেখে নি—ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকায়। দাঁড়গুলো নৌকার পেছন দিকে ফেলে কি যেন খুঁজতে লাগল।

'জলে সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিস তাহলে।' বলল সে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে।

লোকটি কি চায় বুড়ো তা বুঝবার চেষ্টাও করল না। সবকিছুর প্রতিই সে উদাসীন।

'এই যে!' খুশী হয়ে উঠল আলিবাবা (অপরিচিত লোকটি)। 'একটামাত্র, কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। এই যে!' পেয়েছে একটা কড়েআঙুলের মত ছোট্ট, মরা মাছ, বোধহয় ঢেউতে এনে ফেলেছে। দেখাল

বুড়োকে যাতে তার বিশ্বাস হয়। তারপর যেন সমুদ্রের তলায় খুঁজে পেয়েছে মোহর একটা এমনিভাবে সেটাকে সাবধানে রুমালে মুড়ে রেখে দিল।

'দেখলি, কেমন ছোট্ট?' বলে চলল আলিবাবা। 'কিন্তু তোকে পাক্কা দু'বছরের জন্য গারদে পোরার পক্ষে যথেষ্ট!'

এই অপরিচিত অদ্ভুত লোকটির কথা শুনে কাইপ প্রথম এগিয়ে গেল পাড়ের দিকে — জলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে।

'কোথায় চললি?' আলিবাবা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কাছে। 'নিজের ইচ্ছা ফলাচ্ছিস? দাঁড়া! আমি যখন বলব তখন যাবি!'

যতক্ষণ সে রাগ দেখাচ্ছিল, কাইপ ততক্ষণে পাড়ে পা রেখেছে। আলিবাবা ভাবল ওকে জলে ফিরিয়ে আনার কোন মানে হয় না।

দ্বীপে আলিবাবা আবার আগে আগে চলল আর কাইপকে হুকুম দিল:

'চল আমার পেছনে! এখান থেকে তুই আর কোথাও পালিয়ে যেতে পারবি না। আর যদি যাস তো সমুদ্রে ডুবে মরবি। কোনটা তোর বেশী পছন্দ — মরা না দু'বছর জেল?'

কাইপ স্থির করল সে আর কোন উত্তর দেবার চেষ্টা করবে না, কারণ এতক্ষণে সে বুঝতে পারল যে ঐ লোকটি ইনস্পেকটর — সমুদ্রের প্রহরী।

'চুপ কেন?' বিরক্ত হল আলিবাবা। 'ঠিক আছে, যেখানে বলা দরকার সেখানে বলবি।'

একবার ঐ লোকটির প্রতি কাইপের একটু আগ্রহ জাগল, কিন্তু লোকটি বোকা আর দাম্ভিক বুঝতে পেরে সে আবার উদাস হয়ে গেল।

সাদা বাড়ীটাতে ঢোকবার মুখে একটা আঁকশিতে আটকান একটা মরা বাজপাখীর খড়কুটো গোঁজা দেহ। যেই বাড়ীটির মালিক দরজা খুলল বাজপাখীটি নড়ে উঠল আর তার একটা পালক পড়ে গেল।

বাড়ীটার ভেতরে তার একমাত্র ঘরটিতে আছে একটি টেবিল, তার ওপরে একটি ওয়্যারলেস সেট। চারটি জানলার প্রত্যেকটিতেই যন্ত্রপাতি বসান ঝড়ের সময়ে বা ইনস্পেকটরের সমুদ্রে বেরোতে ইচ্ছে না হলে যাতে সমুদ্র দেখা যায়।

'এই আমার দুর্গ।' চেয়ারে বসতে বসতে বলল আলিবাবা। একথা সে বলল আন্তরিকতার সুরে, বুড়ো তার একাকীত্বের ভাগ নিচ্ছে বলে সে খুশী।

কাইপ উত্তরে ঘাড় নাড়ল যেন তার ঘরসংসারের প্রশংসা করল।

'তাহলে,' মাছমোড়া রুমালটা বার করে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল

আলিবাবা, 'বল কে তুমি, কোথা থেকে আসছ?' বুড়োকে ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে মনে করার চেষ্টা করল এই জেলেটিকে সে আগে আর কখনও ধরেছে কি না। 'চুপ কেন?' সত্যি সে কখনই দেখে নি এই জেলেটাকে, তাতে আরো বেশী মন খারাপ হয়ে গেল তার এই ভেবে যে যদি সে আগে কখনও এই জেলেটাকে না ধরে থাকে তার মানে ও এ পর্যন্ত মাছ চুরি করে এসেছে বিনা বাধায়। সেইজন্যই ও অমন নির্বিকারভাব দেখাচ্ছে — নিজেকে খুব কিছু ভাবছে।

ঠিক আছে। আলিবাবা ভাবল এতদিন ধরে ও যে এত চুরি করেছে যা সে জানে না, সে সবকিছুর প্রতিশোধ নেবে।

'তোর মত এমনি জেলেতে ভরে গেছে সমুদ্রটা!' বলল আলিবাবা। 'কোথায় আমাদের বিখ্যাত ব্রীম মাছ? সাজান? বারবেল? বল।'

কাইপ দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা কেবল সে শুনতে পাচ্ছিল। চিন্তাগুলোকে কিছুতেই ঠিক গুছিয়ে নিতে পারছিল না। একবার কেবল কি যেন একটা ভাবল, ভাবল এই অপরিচিত লোকটি তাকে কি ভাবল তাতে তার কিছুই এসে যায় না। বিবেকের কাছে কাইপ কোন অন্যায় করে নি, তাই আলিবাবা এখানে যা বলছে তার সঙ্গে কাইপের কোন সম্পর্কই নেই।

'কোন দ্বীপের লোক তুই?' জিজ্ঞাসা করল আলিবাবা।

যখন কাইপ দ্বীপের নাম বলল আলিবাবা তক্ষুণি রেডিওতে বালিদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

দলনেতাকে বলল:

'শোন তোমার একজন লোক এখানে বসে আছে। এজাহারটা লিখে নিয়ে ওকে আর্কাচিতে পেঁৗছে দেব। আর তুমি ওখানে অন্যদের ভাল করে বোঝাও, বুঝলে?'

আলিবাবার কথা শুনে দলনেতা নেপেস প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে উঠল, কান খাড়া রেখেও কাইপ বুঝতে পারল না এই গাল কার উদ্দেশ্যে, কারণ এই গলা ভেসে আসছে বালিদ্বীপ থেকে।

'ঠিক আছে,' বলল নেপেস, 'এখুনি আমার লোকেদের ডেকে কথা বলছি... কিন্তু শোন আলিবাবা, জান তো, আজ আমরা মাছের ঝাঁকের অপেক্ষায়...'

'শুনতে চাই না,' ওকে বাধা দিল আলিবাবা! 'কিছুতেই ছাড়ব না! যথেষ্ট হয়েছে! বারবার তো আমি আইন ভাঙতে পারি না...'

'আমি কথা দিচ্ছি,' রেডিওর মধ্যে উত্তর শোনা গেল। 'যেই এই মাছের পালাটা চুকে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে তদন্ত আরম্ভ করব। আমার অনুরোধ ওকে কাগজে সই করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দাও। প্রতিটি জেলে, প্রতিটি নৌকা দরকার এখন।'

'না এবারে সবকিছু আইনমাফিক হবে! লোকগুলোকে বড় ঢিলে দিয়েছ...' সত্যিকারের বিরক্তিবশেই নাকি নিজের ক্ষমতা বুঝিয়ে দেবার জন্য কে জানে, আলিবাবা হঠাৎ দুম করে রেডিওটা বন্ধ করে যোগাযোগ ছিন্ন করে দিল।

তারপর কাইপের দিকে ফিরে বলল:

'শুনছিস, তোর বিচার করব আমরা। এজাহারটা লিখে নিয়ে তোকে আর্কাচিতে দিয়ে আসব।' কথার শেষের অংশটা খুব আস্তে করে বলল যেন কিছু একটা ভাবছে।

আলিবাবা ভাবছিল বুড়োকে আর্কাচিতে নিয়ে যাবার সত্যি সত্যি কি কোন প্রয়োজন আছে। কথা বলতে অনিচ্ছুক বুড়োর মুখের থেকে একটার পর একটা কথা টেনে বার করে এজাহারটা লিখতে হবে। তারপর ওকে লঞ্চে বসাতে হবে... পথেই চলে যাবে দু'ঘণ্টার বেশী সময়, কেবলমাত্র দুপুরবেলায় কাইপকে সে মিলিশিয়ার হাতে তুলে দিতে পারবে। আইন অনুযায়ী মাছধরার ইন্সপেকটর নিজেই তীরের মিলিশিয়াকে ডেকে পাঠাতে পারে দ্বীপে, কিন্তু সাধারণতঃ এমন সব সামান্য ব্যাপারে মিলিশিয়া তিন চার দিনে একবারমাত্র আসে। মাছ চুরি করা জেলে তো আর খুনী নয়! তাড়ার কিছু নেই।

আলিবাবা বুড়োকে আর্কাচিতে যদি নিয়েই যায় কে বলতে পারে যে মিলিশিয়াও বালিদ্বীপের দলনেতার বলা কথারই পুনরাবৃত্তি করবে না— যে মাছের ঝাঁকের পালা চুকে গেলে তদন্ত করা হবে, আর এখন কাগজে সই করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক বুড়োকে, কাজ করুক আবার।

এই ক'দিন সবার মাথায় কেবল একটাই চিন্তা—মাছের ঝাঁক আসা, এসময় আইন কানুনেও অদলবদল করা যায়। খালি যেন ভালভাবে মাছ ধরায় কোন বাধা না পড়ে। আর্কাচির কারখানাগুলো মাছের অপেক্ষায় আছে...

এ সবকিছু চিন্তা করে আলিবাবা আবার রেডিওতে বালিদ্বীপকে ডাকল।

'শোন, মাছের কি খবর? কখন মুখপোড়ারা আসবে আমাদের দিকে?'

'পাইলটরা বলছে শীগ্গিরই,' উত্তর দিল নেপেস, 'যে কোন মুহূর্তে...'

'কি মাছ আছে ঝাঁকে? ব্রীম?'

'কি জানি? যদি কেবল ব্রীমই হয় তাহলে আমরা ঐ দামী মাছ দিয়ে সব পরিকল্পনা ছাড়িয়ে যাব।'

'ব্রীম নিশ্চয়ই থাকবে, নিশ্চয়ই।' নিশ্চিতভাবে বলল আলিবাবা।

'তাই যেন হয়। প্রথম ধরা মাছের থেকেই তোমায় পাঠাব চেখে দেখার জন্য।' প্রতিশ্রুতি দিল নেপেস আর জিজ্ঞাসা করল, 'যাকে তুমি ধরেছ, ওর নাম কি?'

নাম বলল কাইপ।

'বলছে, কাইপ। এমন কেউ আছে তোমার?'

দলনেতা আবার গাল পাড়ল। বুড়োকে বলল:

'আপনার কি হয়েছে, চাচা? আপনি তো কখনও এমন...' দিশাহারাভাবে জিজ্ঞাসা করল নেপেস। 'আমরা উদাহরণ দিতাম, আপনার সততার মহত্ত্বের... এখন আপনার বিচার করবে...'

'ছাড় তুই ওর সঙ্গে অমনি করে কথা বলা!' নেপেসের মনগলান কথাবার্তা থামিয়ে দিল আলিবাবা। 'ভাল জেলের কাছে পাবার আশাও থাকে খুব বেশী। অন্যায়ের পথে ও গেল কেন?'

কাইপ নেপেসের কথার উত্তর দিতে চাইল কিন্তু তারপর মত বদলাল এই ভেবে যে সে নির্দোষ তার পক্ষে কৈফিয়ৎ দেওয়া অপমানজনক।

'ঠিক বলেছ আলিবাবা, ওর বিচার করাই উচিত,' ব্যাপারটা আরো জটিল করে না তোলার জন্য সম্মতি জানায় নেপেস। 'কিন্তু ও চুপ করে আছে কেন? ওকে দিয়ে কিছু বলাও। বেঁচেবর্তে আছে তো ও?' উদ্বিগ্ন হল নেপেস।

নেপেস অন্তর থেকেই একথা বলছে জেনে কাইপ নিজের জায়গা থেকেই আস্তে করে বলল:

'বেঁচে আছি, নেপেস..'

'শুনলে?' রেডিওতে বলল আলিবাবা।

'দ্বীপে একবার ফিরে আসুক ও।' হুমকি দিল নেপেস। রেডিওটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, বিরক্ত ধরে গেছে তার এসবে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! ও ফিরে যাবে কেমন করে তা তুমি ভেবেছ?'

'নিজের নৌকাতেই ফিরে আসুক,' বালিদ্বীপ থেকে শোনা গেল।

'যদি পালিয়ে যায়, তোমায় জবাব দিতে হবে।'

'ফিরে আসবে। ওর বিবেক আছে, এই ঘটনার জন্য নিজেকেই ও তিরস্কার করবে।'

'তিরস্কার করুক। আমরাও তাতে আরো যোগ দেব।'

'সে তো নিশ্চয়ই ঠিক আছে।'

...দিন গড়িয়ে প্রায় দুপুর হল, আর কাইপ তখনও আলিবাবার অতিথি, বলতে গেলে — বন্দী। প্রত্যেকবারই মাছচোরকে আর্কাচিতে পেঁৗছে দিয়ে আসার আগে আলিবাবা দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখাত, যার অবস্থান ও সীমারেখা মালিকের বিশেষ গর্বের কারণ।

'যদি তুই পালিয়ে যাবার কথা ভাবতিস বুড়ো তো সমুদ্রে ডুবে মরতিস,' দ্বীপের দক্ষিণতীরে, যেখানে তীরটা হঠাৎ উঁচু থেকে খাড়া নেমে গেছে সমুদ্রে সেখানে কাইপকে এনে আলিবাবা বলল, 'দেখছিস, কি উঁচু। ধর্, তুই যদি লাফ দিতিস — পাটা ভাঙতিস। ঐ দ্যাখ নীচে জলের থেকে বেরিয়ে আছে ধারাল পাথরের টুকরোগুলো,' বলছিল আলিবাবা, 'তার মানে এ তীর কোন কাজে লাগবে না। চল ওদিকে।'

অন্য যে তীরে তারা গেল সেখানে আলিবাবা দেখাল একটা বালির পাহাড়। পাহাড়টা চোখধাঁধান সাদা, চোখ কেটে বসছে একেবারে।

'চূড়ায় নুন জমে আছে,' বুঝিয়ে দিল আলিবাবা, 'ধরলাম তুই আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেলি আর এই পাহাড়টা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলি। এই নুন তখন তোর হাত কেটে দিত। পাহাড়ের গায়ে দাগ দেখছিস? ও হল রক্ত। ঐ বাজপাখীটার, যেটাকে তুই আমার বাড়ীর কাছে দেখেছিস। সমুদ্রের বাষ্পে মাথা ঘুরে ঐ পাখীটা চূড়ো থেকে পড়ে মারা যায়...'

ক্লান্তিতে কাইপ বালির ওপর বসে পড়ল, এসব কিছুই সে বহুদিন আগেই জানত। আলিবাবা সানন্দে তাকে দেখাচ্ছে সমুদ্রের সৃষ্টি এই দ্বীপ-ফাঁদটা।

'একটাই মাত্র জায়গা, যেখান থেকে তুই পালাতে পারতিস,' কাইপের পাশে বসতে বসতে আলিবাবা বলল, 'সে হল জেটি, যেখানে আমার মোটর-বোটটা দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে কোন বাধা নেই, সমুদ্র কাছেই, গভীর। লোভনীয়, তাই না?.. এ কিন্তু কেবল চোখের ভুল। তীর থেকে গোটাপঞ্চাশ মিটার দূরে চোরা স্রোত আছে, প্রথমে সবকিছু তোর খুব চমৎকার মনে

হবে, নৌকা আপনিই চলেছে, কষ্ট করে দাঁড় বাইতে হবে না — আরাম কর! এমন চলবে অনেক অনেকক্ষণ ধরে। আর তারপর তোর সতর্কতায় যখন একটু ঢিলে পড়েছে, মিষ্টি তন্দ্রা এসে গেছে হয়ত, স্রোত তখনই হঠাৎ নৌকাটা নিয়ে দেবে এক পাক, দু'পাক, ওঃ কি ভয়ংকর, তোমার কবর তৈরী...'

৫

কাইপের নৌকা এগিয়ে চলল সবুজদ্বীপের দিকে। বুড়োর মনে হচ্ছিল যে এখন আর আকস্মিক অর্থহীন কোন কিছু তাকে পথ থেকে ফেরাতে পারবে না। সে নিশ্চিত ছিল একবার আলিবাবার হাতে ধরা পড়ার পর, দ্বিতীয়বার আর তার মুখোমুখি হবে না।

অন্য কোন বাধা, প্রাকৃতিক বাধা আসতে পারে, যেমন স্রোত, জলের তলের লুকানো পাথর বা চড়া কিন্তু এখন আর মানুষের ভয় পাবার কিছু নেই। এক যদি নেপেস বুড়ো এতক্ষণ না আসায় চিন্তিত হয়ে তাকে খুঁজতে নৌকা পাঠায়। না পাঠাতেও পারে। মাছ ধরতে যাবার তাড়াহুড়োয় ভুলে যেতেও পারে।

আলিবাবার দ্বীপ থেকে বেরিয়েছে কাইপ দুপুর বেলায় তখন সমুদ্রের রং ছিল ধূসর, তার মাঝে কালো কালো ঢেউয়ের ফোঁটা। মাঝে মধ্যে হাওয়া পড়ে যাচ্ছিল, সমুদ্রও শান্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল সেটা যেন একটা জেলি টুকরো টুকরো করে কাটা — ছোট ছোট স্রোতের কারণে ঐ টুকরোগুলোর সৃষ্টি। আর যেহেতু সমুদ্রের জল ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল ছোট স্রোতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছিল।

কাইপ এখন আর বিশ্রাম করছে না, কেবল মাঝে মাঝে নীচু হয়ে জল তুলে নিয়ে মুখটা রগড়ে নিচ্ছিল — মাথা ঘুরছে। খিদে পেয়েছে ভীষণ। কে জানত যে এতক্ষণ ধরে তার পথে কাটবে? তাহলে সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে নিত।

বহুক্ষণ ধরে সমুদ্রে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না — এমনকি শঙ্খচিলও উড়ছে না। এই ধূধূ সমুদ্র দুঃখ আর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে — এই স্মৃতির থেকে কাইপ পালিয়ে যেতে পারে না যেমন পারে না নিজের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যেতে।

'সে বিপ্লবের আগের কথা, জমিদারদের আমলে, চোদ্দসাল হবে, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও, অনেক রুশী রাশিয়াতে চলে গিয়েছিল যুদ্ধে যোগ

দেওয়ার জন্য। আমাদের লোকদেরও নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে নেয় নি, মাকে খাওয়াবার আর কেউ ছিল না বলে। কত বয়স আমার তখন? কুড়ি, তার মানে আয়েষার আঠার... করিমবাই বেঁচে থাকলে এখন আমার মতনই বয়স হত...

'যখন আর্কচি থেকে কারখানার মালিকের ছেলে আমাদের দ্বীপে আসত, আমার সবসময়ই যেন কিসের ভয় হত আর দুশ্চিন্তায় কেমন যেন উগ্র হয়ে উঠতাম, আয়েষাকে আজেবাজে কথা বলতাম, এমনকি মাকে বলেছিলাম ওকে চালাঘরে বন্ধ করে রাখতে। ওকে, আমার ভাবীবধূকে, মেরে ফেলারও অধিকার ছিল আমার। আর তার ভবিষ্যতের সব কষ্টের মূল্য হিসেবে আমি প্রতিমাসে আয়েষার বাবাকে আধনৌকা করে মাছ দিতাম...

'করিমবাই আমাদের ওখানে আসত মাছ ধরতে, শিকার করতে। আসলে আমি ভয় পেতাম যতটা না ওকে তার থেকে বেশী ওর দুই বন্ধুকে, বিশাল চেহারা, মৌন, দামী পোশাক পরা, কোমরে বুখারার বাঁকা ছোরা গোঁজা...

'কারখানার মালিকের ছেলে করিমবাই ছিল দয়ালু আর তার আচার-ব্যবহারও ভাল ছিল। প্রত্যেকবারই সে নৌকাভর্তি করে নিয়ে আসত উপহার, নানান ধরণের জিনিস, যা আমাদের দ্বীপে কেউ কখনও দেখে নি: বুড়োদের জন্য ভোদ্‌কা, বাচ্চাদের জন্য ফল, লজেন্স; পুঁথির মালা, কাপড় মেয়েদের জন্য, আর্কচিতে তার বাবার দোকানে যা কিছু বিক্রী হয় সবকিছু। মাঠে লোক জড় করে করিমবাই উপহার বিলোত। আর লোকেরা তার দয়া আর উদারতায় অবাক হয়ে নিজের নিজের অংশ নিয়ে চলে যেত...

'আমাকে একবার ও ঘড়ি উপহার দিয়েছিল আর বুঝিয়ে দিয়েছিল কেমন করে ব্যবহার করতে হয়। সেই ঘড়িটা এখন সবুজদ্বীপ আর বালিদ্বীপের মাঝখানে কোথাও সমুদ্রতলে বিশ্রাম করছে...

'সবকিছু থেকে মনে হত করিমবাই তার বাবাকে ভালবাসত না। একবার ও লোকেদের বলেছিল যে যখন ওর বাবা মারা যাবে, ও কারখানার মালিক হবে, তখন রুশীদের কাছে একটা মজবুত দ্রুতগামী জাহাজ কিনবে আমাদের জন্য, আমাদের মাছের দারুণ দাম দেবে দ্বিগুণ বেশী, তখন সবুজদ্বীপের সবাই বড়লোক হয়ে যাবে, ক্ষুধার্ত, অসুস্থ আর কেউ থাকবে না...

'সেই শেষবার সে যখন এসেছিল তখন আয়েষাকে উপহার দেয় বুখারার ঝোলা কানের দুল। আমার মনে হল যেন আয়েষার প্রতি ও বড় বেশী মন দিয়েছে, আর ওর ওই বন্ধুগুলো কানাকানি, হি-হি করতে লাগল, কেমন যেন অস্থির, ছটফট করতে লাগল...

‘যখন ওরা দ্বীপের আরো ভেতরে চলে গেল শিকার করতে, আমি আয়েষাকে ডেকে নিয়ে গেলাম ঝর্ণার কাছে সাকসাউল ঝোপের মধ্যে। এখন আর মনে নেই, কি বলেছিলাম তখন ওকে, কি চেয়েছিলাম ওর কাছে। বোধহয় বলেছিলাম দুলগুলো ফেলে দিতে, মনে নেই। আসলে আমার দরকার ছিল ওকে একটু বকাবকি করার, কি কারণে সেটা বড় কথা নয়। বরাবরের মতই আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম...

‘প্রায়ই আমাদের ঝগড়া হত, বিশেষ করে যখন কারখানার মালিকের ছেলে আসতে আরম্ভ করল আমাদের দ্বীপে, সবকিছুর মূলে ছিল আমার অস্থির, বদরাগী স্বভাব। আমি আয়েষাকে যে সব নিষ্ঠুর ও অন্যায় খোঁটা দিতাম তা সে নিরীহভাবে শুনতে। লোকসমাজ থেকে দূরে চলে গিয়ে কোন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে চুপিচুপি কাঁদত...

‘সেই সর্বনাশা দিনে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল চোখে বিষাদ আর মিনতি নিয়ে, যেন অনুরোধ করছিল অমন অন্যায় আমি যেন না করি। ও বোধহয় টের পেয়েছিল কি ঘটতে যাচ্ছে...

‘আমার থেকে ওর স্বভাবটা আরো অনেক বেশী সূক্ষ্ম ছিল। এমন অনেক কিছুই ও আগে থেকে বুঝতে পারত যা আমি একেবারেই টের পেতাম না। ও অনুভব করত চন্দ্রগ্রহণ এগিয়ে আসছে, প্রকৃতির মধ্যে, ঈশ্বরের কাছাকাছি ছিল সে...

‘আয়েষাকে মনে কষ্ট দেওয়া অনেক কথা বললাম। তারপর ঘনঝোপের মধ্যে ওকে রেখে চলে গেলাম খোলা মাঠে, বালির ওপর শুয়ে পড়লাম, ভাবলাম, বরাবরের মত এবারও আয়েষা ক্ষমা চাইতে আসবে...

‘দিনটা ছিল গুমোট। সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে এসে বালির ওপর নীচুতে ভাসছিল। আমার চারপাশে ব্যাঙ লাফাচ্ছিল যেগুলোকে বাষ্প তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে জলের থেকে। তাদের কান্নাকাটি শুনে ঝোপের থেকে একটা চিল বেরিয়ে এসে আমার ওপরে উড়তে লাগল...

‘রোদ্দুর আর ভাপ আমাকে দুর্বল করে দিল, ব্যাঙগুলো আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল, তন্দ্রা এসে গেল আমার। আমি ঘুমোচ্ছিলাম না, জেগেও ছিলাম না, সাধারণতঃ এমনি অবস্থায় আমি অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস দেখতে পেতাম — কাদের সব যেন বিকৃত মুখ, একটা খোঁড়া ঘোড়া উদ্বিগ্নভাবে মুখটা তুলে জলে নেমে জল পেরিয়ে চলে গেল। আমি কেঁপে কেঁপে জেগে উঠছিলাম আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম...

‘ঐভাবে আমি শুয়েছিলাম ঘণ্টাখানেকের বেশী নয়। হঠাৎ উদ্বিগ্ন

হয়ে উঠে বসলাম, চারদিক তাকালাম — চারপাশে এমন নিস্তব্ধতা যাতে নিজের ভয়টার আওয়াজই যেন দুপ দুপ করে বাজে কানে...

'আয়েষাকে ডাকব ভাবলাম কিন্তু ঘুমোবার সময়ে ঠোঁট গলা শুকিয়ে গেছে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, চীৎকারের বদলে বেরোল কেবল একটা গোঙানির আওয়াজ...

'সেই ঝোপটার কাছে গেলাম যেখানে আয়েষাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল। ভাপের মধ্যে শুয়ে থাকার ফলে একটু নড়লেই মাথাটা ঘুরছিল। নিজের ওপর রাগ হচ্ছিলাম দুর্বল হয়ে পড়ে বালির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে...

'আমার চারদিকে ন্যাড়া, ধূসর সাকসাউলের .ঝোপ। ঝোপগুলি বহুদিনই শুকিয়ে আরও বেশী শক্ত হয়ে গেছে আর হাওয়া তাদের পাশ কাটিয়ে বইছে। বুঝলাম যে পথ হারিয়েছি: এতক্ষণ ধরে হাঁটছি কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলাম না সেই জায়গাটা যেখানে আয়েষা আর আমি বসেছিলাম...

'যেখানে আমি গিয়ে পেঁছিলাম সেখানে ঝোপ এত ঘন যে দু'পা দূরেও কিছু দেখা যায় না। দু'পা এগিয়ে দেখি আবার সামনে ঘন ঝোপের আড়াল। এমন সময় ঝোপের থেকে বেরিয়ে এসে আমার মুখোমুখি পড়ল করিমবাই আর তার বন্ধুরা...

'আমি আর করিমবাই দু'জনেই দিশাহারা হয়ে পড়লাম। আমাকে দেখে ওর বন্ধুদের মুখ কুঁচকে উঠল, কিছু বলল না, কিন্তু ওদের চোখের দৃষ্টিতে পড়লাম... মনে হল বিদ্রূপ আর ঘৃণা...

'ওদের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে একদিকে ছুট দেব ভাবলাম। কিন্তু আমি নড়বার আগেই করিমবাই ঝোপঝাড় ভেঙে এমন ছুটতে আরম্ভ করল যেন স্বয়ং শয়তানকে দেখেছে সামনে...

'আমি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বন্ধু দুটি মালিকের ছেলের পেছনে না দৌড়ে একভাবেই চুপ করে চোখে বিদ্রূপ নিয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে... বুঝলাম ওদের মাথায় একটা ভয়ংকর মতলব আছে... আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম তাদের সামনে, আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মিনতি করতে লাগলাম...

'ওরা ছেড়ে দিল আমাকে। একদিকে সরিয়ে দিল ধাক্কা মেরে, টেনে তুলে আমাকে দাঁড় করিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে ঝোপের মধ্যে। বালির ওপর মুখ দিয়ে পড়লাম আমি আর সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠলাম দৌড়

দেবার জন্য। চারদিকে সাকসাউলের সুরক্ষিত দেয়াল, চীৎকার, কথা কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। ভালয় ভালয় বাঁচলাম মার খাওয়ার হাত থেকে...'

...চিন্তিত হয়ে কাইপ জল থেকে দাঁড় তুলে নিল। আলিবাবার কাছ থেকে ছাড়া পেয়েছে এই আনন্দে সে ভাবেও নি ঠিক দিকে নৌকা চালাচ্ছে কি না।

মনে হয়েছিল স্রোতে ভেসে গেলেই ঐ স্রোতটাই নৌকাটাকে সবুজদ্বীপের কাছে নিয়ে যাবে। নৌকা একদিকে একটু হেলে যাচ্ছে তার মানে ঠিক যাচ্ছে...

কিন্তু যখন অনেকটা সময় পেরিয়ে যাবার পরে দিগন্তে একটা অজানা দ্বীপের রেখা দেখা দিল তখন বুঝল যে পথ হারিয়েছে।

কাইপ চিন্তা করতে লাগল, এবার কি করবে: অজানা দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাবে নাকি ফিরবে। আলিবাবার কাছে গিয়ে বলবে বালিদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। এরমালাই এসে নিয়ে যাক তাকে। কাইপ নিজে শেষ পর্যন্ত জল ছাড়া, খাবার ছাড়া নির্জীব হয়ে পড়তে পারে। এরমালাই আর ও একসঙ্গে বালিদ্বীপে ফিরে যাবে আর রাতের বেলায় কাইপ আবার নিজের দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

না, এটা বুদ্ধির কাজ হবে না। ইন্সপেকটর আলিবাবা আবার কি কারণে ওকে সন্দেহ করবে। আবার নিজের কাছে কতক্ষণ আটকে রাখবে কে জানে।

কাইপ এগিয়ে চলল দ্বীপের দিকে — যা হয় হবে। অপরিচিত জেলেদের তাকে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। তারা কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করবে না, সন্দেহও করবে না। কাইপ জেনে নেবে সবুজদ্বীপে পেঁছাতে গেলে কোন দিকে যেতে হবে। আর কিছু খাবার চাইবে।

সোজাসুজি তীরে গিয়ে উঠবে না বলে কাইপ তীরের কাছে জলে নৌকা ভিড়িয়ে শুয়ে পড়ে লক্ষ্য করতে লাগল দ্বীপটাকে, নৌকা আর বজরার লোকগুলোকে।

দ্বীপটা সাদা আর সমান, একটুকরো বরফের মত। এ দ্বীপটা শান্ত, জনহীন বালিদ্বীপের মত নয়, এখানে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে — দুটো তিনটে যন্ত্র নুনতোলার কাজ করছে আর নৌকা আর বজরা কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে সেই নুন।

যখন একটা নৌকা কাছে এগিয়ে এল কাইপ জিজ্ঞাসা করল কেউ জানে নাকি কোন দিকে সবুজদ্বীপ।

নৌকার লোকগুলি তর্ক জুড়ে দিল: কেউ দেখাল ডানদিকে অন্যজন বাঁদিকে, মনে করতে লাগল কেমন করে সেখানে নুন আর অন্য কি সব পেঁৗছে দিত, আরও অনেকক্ষণ ধরে তর্ক চলল প্রায় মারপিট বাধিয়ে দিল নিজেদের মধ্যে — এমন সাহায্য করতে চাইছিল কাইপকে।

তাদের কথা শুনতে শুনতে কাইপ বুঝতে পারল যে তাদের কেউই কখনও এমন দ্বীপের কথা শোনেই নি, তাহলে হয়ত মহাশয়রা তাকে বালিদ্বীপের পথ বলে দেবেন ?

বালিদ্বীপ ? নিশ্চয়ই ! আবার বিভিন্ন দিক দেখিয়ে তর্ক আরম্ভ হল: একজন দেখায় আর্কাচির দিক, অন্যজন দেখায় উত্তর দিক, কাজাখস্তানের স্তেপভূমির দিকে।

তর্কটা শেষ হল তখনই যখন তাদের প্রত্যেকেই কাইপকে একটুকরো করে রুটি আর ভাজা মাছ খেতে দিল, কলসীভর্তি জল দিল। তারা বুড়োকে রাতটা দ্বীপে কাটিয়ে যেতে বলল। কাল নতুন শক্তি নিয়ে খোঁজ আরম্ভ করা যাবে।

কাইপ ওদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবার রওনা দিল।

এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম খেল কাইপ — যখন রুটি ছিঁড়ছিল হাত কাঁপছিল তার, চিবোচ্ছিল না গিলছিল।

সৌভাগ্যই কেবলমাত্র এখন তার নৌকাকে পেঁৗছে দিতে পারে সবুজদ্বীপে বা বালিদ্বীপে।

তীর থেকে দূরে চলে গিয়ে, কাইপ পিছন দিকে তাকাল আর হঠাৎ মনে পড়ল একবার সে এই নোনাদ্বীপের পাশ দিয়ে গিয়েছিল।

সে অনেকদিন আগের কথা ছেলেবেলায় যখন বাবা মৃত্যুর কিছুদিন আগে ছেলেকে নিয়ে সব দ্বীপগুলো দেখে বেড়াবার ঠিক করেছিল জন্মভূমিকে দেখে তার কাছে বিদায় নেবার জন্য।

সেই প্রথমবারের যাত্রায় কাইপ নোনাদ্বীপে কোন লোক দেখে নি — এখন মানুষের বসতি হয়েছে সেখানেও, নতুন শিল্প শুরু হয়েছে।

এখানে সমুদ্রভরা জীবন — কাইপের নৌকার ওপর শঙ্খচিলেরা উড়ছে মৌনভাবে। মাছের ঝাঁক যেতে দেখতে পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে আর মানুষের কাছে নিজের গোপন কথাটা ফাঁস না করে দেবার জন্য চেঁচামেচি করে তাকে উত্যক্ত করতে চায় না।

একটু পরে কাইপ আর একটা দ্বীপ দেখতে পেল যেখানে মানুষের বসতি আছে। তীরে দু'জন বৃদ্ধ জলে পা ডুবিয়ে বসে ছিল, দেখে মনে

হয় পথিক। দীর্ঘপথ আসার ক্লান্তিতে ঢুলছে। তারপর আর একজন লোক এসে নৌকা থেকে একটা বস্তা টেনে তুলতে লাগল তীরে। অনেকক্ষণ ধরে খুলতে লাগল বস্তাটা, তারপর খুলে একটা শুকনো রুটি বের করল। সেটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে বন্ধুদের ঘুম ভাঙাতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যাওয়া দু'জনে তৃতীয়জনের ওপর রাগারাগি করতে লাগল, কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে রুটি খেতে লাগল।

তারপর সেই তিনজনও চোখের আড়ালে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত কাইপ বড়ছোট গোটা দশেক দ্বীপ পেরিয়ে গেল। তার অনেকগুলোই জানা ছিল বুড়োর, প্রথম বারের যাত্রার থেকেই, কিন্তু তাদের মধ্যে ন্যাড়া, জনহীন সম্প্রতি দেখা দেওয়া দ্বীপও ছিল।

এগুলো হল ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ, আগে যেগুলো ছিল ডোবা পাহাড়, সেগুলো জলজ লতাপাতা, মাছসমেত ওপরে উঠে এসেছে; হাওয়া সেগুলোকে উড়িয়ে সমুদ্রে নামিয়ে দিতে পারে নি এখনো। বুড়োর মনে হল যেন দাঁড়ের আওয়াজ শুনে লতাপাতাগুলো উঠে আসছে — কে তাদের বিরক্ত করতে এসেছে দেখবার জন্য।

কাইপ এই সব দ্বীপগুলির চারপাশ ঘুরে দেখছিল, যে সব জায়গাগুলি এই সেদিনও সমুদ্রের তলদেশে ছিল সেগুলোকে দেখতে তার আগ্রহ হচ্ছিল: সমুদ্রের তলদেশ তো নৌকা আর মানুষের সমাধিস্থান।

কাইপ লক্ষ্য করল পঞ্চাশ বছরের মাছধরার ব্যাবসায় বড় বড় দ্বীপগুলোর জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যেখানে কোন একসময়ে কেবল বালি উড়ত সেখানে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন বসতি অঞ্চল, কারখানা। জেটির কাছে দাঁড়িয়ে আছে বজরা আরও বড় বড় জাহাজ, নুন, টিল, গ্রানাইট পাথর বোঝাই করা। যেখানে সমুদ্রের জাদুর অপেক্ষা না করে মানুষ নতুন শিল্পের কাজ আরম্ভ করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে নতুন প্রাণের ছোঁয়া আর প্রাচুর্য।

নদীর মোহনার কাছে দ্বীপগুলিতে যে ভয়ঙ্কর জলাভূমিগুলি ছিল, যেগুলির বাষ্প আগেকার দিনে এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে মহামারী বয়ে নিয়ে যেত সেগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে। জলাভূমিগুলি শুকিয়ে ধানের চাষ করা হচ্ছে।

এইভাবে কাইপ একদ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে এগিয়ে চলল সব জায়গাতেই পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগল।

আর যারা তীর থেকে দেখতে পাচ্ছিল সঙ্গীহীন নৌকাটিকে আর তার

মধ্যে লম্বাদাড়ি, রোগাচেহারা সাদা পোষাক পরা বৃদ্ধটিকে, তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিচ্ছিল আন্দাজ করার চেষ্টায়। কেউ কেউ বলছিল ও হল অতি সাধারণ মাছচোর, আর তার সাহস দেখে অবাক হচ্ছিল তারা — দিনের বেলায় মাছ ধরা, ক্ষেপে ওঠা সমুদ্রে সাঁতার কাটার মতই ঝুঁকিপূর্ণ।

অন্যেরা ভাবল যে একসপ্তাহ আগে মাছ ধরতে বেরিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া তিনজন জেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছে সে নিজের দায়িত্বে।

অনেকেই আন্দাজ করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছিল, বুঝতে পারছিল না কি ভাববে, তারা কাইপের নৌকার উদ্দেশ্যে চীৎকার করছিল।

কাইপ কিন্তু শুনতে পাচ্ছিল না সে চীৎকার। সে আবার নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সত্য খুঁজছে — সান্ত্বনা নয়।

'আমি ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে চললাম। আর বাড়ী পেঁছেই কেবল লক্ষ্য করলাম মুখ হাত কি ভীষণ ফুলে গেছে — মা যখন আমার ক্ষতস্থানগুলিতে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছিল তখন আমার শরীর থেকে অনেক সাকসাউলের কাঁটা টেনে বার করেছিল...

'অনেকক্ষণ দৌড়েছিলাম, শক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় থেমে পড়েছিলাম। ভয় কেটে গিয়েছিল। এখন শান্তমনে ভাবা যায় ঝোপে আমি কি দেখেছি। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না করিমবাইয়ের কি হল, ও হঠাৎ কেন ভয় পেয়ে গেল। আর ওর বন্ধুগুলো বিশ্বস্ত দেহরক্ষীগুলোই বা অমন অদ্ভুত ব্যবহার করল কেন, হয়ত আমাকে মারতে চেয়েছিল আমি ওদের মালিকের দুর্বলতা দেখে ফেলেছি বলে ? যাতে কাউকে কিছু না বলে ফেলি...

'এত বেশী দুশ্চিন্তা হচ্ছিল যে আমি আয়েষার কথা মোটেই চিন্তা করছিলাম না, ওকে তো এখানেই ঝোপের মধ্যে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। নিজের দুঃখ নিয়েই মত্ত ছিলাম...

'এইভাবেই বসেছিলাম যতক্ষণ না কানে এল নীচুস্বরে গোঙানির আওয়াজ। হ্যাঁ, কে যেন গোঙাচ্ছে। মানুষের গোঙানি... উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না, গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলাম একবার এপাশ দিয়ে, একবার ওপাশ দিয়ে। ঝোপগুলির মধ্যে মাথা গলিয়ে গলিয়ে দেখছিলাম তারপর আবার গুঁড়ি মেরে ফিরে আসছিলাম। যেখানে ঝোপের মধ্যে অন্ধকার, সেখানে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করছিলাম, বুঝতে না পেরে একটা কচ্ছপকে ধরলাম আঁকড়ে, চীৎকার করে উঠলাম, ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, যদিও আগে কখনও কচ্ছপকে ভয় পেতাম না...

'কাছেই মড়মড় কি একটা আওয়াজ হল। সেদিকে এগিয়ে গেলাম আর

ভয়ে পিছিয়ে এলাম — ঝোপের মধ্যে শুয়ে গোঙাচ্ছে একটি মেয়ে, অঙ্গের পোষাক ছেঁড়া...

আয়েষাকে চিনতে পারি নি সঙ্গে সঙ্গে। নিজেকে বোঝাতে লাগলাম যে ও আয়েষা নয়, এটা একটা দুঃস্বপ্ন। আমি ওকে ডাকলাম, আমার অন্য আয়েষাকে। ডাকছিলাম আর উত্তরে শুনছিলাম ওই ঝোপে শুয়ে থাকা মেয়েটির গোঙানি...

'হঠাৎ সব থেমে গেল। সব আওয়াজ, হাওয়া শান্ত হয়ে গেল। চারদিকে কেমন যেন এক গুমট শূন্যতা। সমস্ত কিছুর প্রতি অনাগ্রহ জাগল। কি যেন একটা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আর যা আমার হৃদয়কে উত্তাপ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল. তাকে বিদায় জানাচ্ছিলাম। নিজেকে ভীষণ শূন্য মনে হচ্ছিল...

'আয়েষা আমার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে না ছিল ভয়, না মিনতি, না আগের সেই অনুরাগ। ছিল কেবল ক্লান্তি...

'ভোর হওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম ওর কাছে...'

রাতের বেলায় দিগন্তে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল, কাইপ বুঝল — নৌকা তাকে নিয়ে এসেছে শহরের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে এটা জেলেদের রাজধানী — আকচি।

৬

দূর থেকেই বন্দরটা দেখে কাইপ ঠিক করল ফিরে যাবে। এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় — কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়াও এখন সোজা ব্যাপার নয়। নৌকার পাশ কাটিয়ে অনবরত চলে যাচ্ছিল মাছধরানৌকা — সাইনের বজরা, ভোঁ দিচ্ছিল বুড়োকে সাবধান করে দিয়ে, তার চোখে স্যার্চ লাইটের আলো ফেলে হর্ণ দিচ্ছিল।

একবার একটা ছোট যাত্রীবাহী স্টীমার প্রায় উঠে পড়েছিল কাইপের নৌকার ওপর, তারপর দেখা দিল পাহারাদারী লঞ্চ। সেখান থেকে মাইকে চীৎকার করে কি যেন বলল কাইপকে।

বুড়ো একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়, কিন্তু সর্বদিক থেকেই তাকে তাড়াচ্ছিল, সবাইকে সে বিরক্ত করছিল।

কাইপ একেবারে ভেঙে পড়ল, নিজের আনাড়ীপনার জন্য নিজেকে

গালি দিতে লাগল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত বালিদ্বীপের নৌকার থেকে তাকে চিনতে পেরে ডাকল কে যেন।

'কাইপচাচা!' শোনাল যেন পরিত্রাণের মত।

কাইপ চারদিকে তাকাল আর অনেকগুলো নৌকার মধ্যে দেখতে পেল বালিদ্বীপের বজরাটা যেটা থেকে প্রোশকা তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।

কাইপ নৌকাটাকে নিয়ে গেল বজরার কাছে। প্রোশকা নৌকায় নেমে এল বুড়োকে সাহায্য করতে — নৌকাটা বাঁধতে। বাবার মতই সদাধীর স্থির প্রোশকা এখন ভীষণ ব্যস্ত, তার ভালবাসাভরা চোখ দুটির দৃষ্টি সরাচ্ছে না বুড়োর থেকে।

'সাধারণতঃ বাবা এখানে আসে নুন নিয়ে যেতে,' একেবারে বড়মানুষের ধরণে বলল প্রোশকা, 'কিন্তু কাল বাবাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যখন জানাজানি হল যে ঐ রাতে বাবা নৌকাগুলির পাহারায় ছিল। বাবাকে পাঠিয়েছে আপনাকে খুঁজতে। নৌকার ব্যাপারে ভীষণ বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে।' ব্যস্তসমস্তভাবে নৌকাটার চারপাশ দেখে নিল প্রোশকা, গোটাগুটি অক্ষতই আছে সেটা নিশ্চিত হয়ে আবার বলতে লাগল, 'আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার ফিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল যদি আপনি সমুদ্রে হারিয়ে গিয়ে থাকেন, তো আপনাকে নিশ্চয়ই বন্দরে এনে লাগাবে। তাই রয়ে গেলাম। এখানে বন্দরের কাছে এত নৌকা যে মাথা ঠিক থাকে না! দিনের বেলায় মাছের ঝাঁকের অপেক্ষায় আছে সবাই আর রাতে এরা সমুদ্রেই ঘুমায়। আপনি জানেন না কাইপচাচা আরম্ভ হয়েছে কিনা? বাবা আর আমি না ফসকাই এ সুযোগ...'

প্রোশকা বুড়োকে বজরাতে উঠে আসতে সাহায্য করল...

আর তারপর এরমালাই সাধারণত যে সুরে কথা বলে সেইভাবে বলল:

'যাক গে! নৌকাটা যে আস্ত আছে সেই ভাল। যা ঘটে তা ভালর জন্যই ঘটে!'

পুরনো বজরাটা সমস্তশক্তিতে ভোঁ বাজিয়ে সরে গেল জেটি থেকে আর কাইপের নৌকাটাকে টেনে নিয়ে গেল পেছনে।

প্রোশকা বারে বারে নৌকার বাইরে ঝুঁকে পড়ে চীৎকার করছিল কাইপকে মজা দেবার জন্য:

'তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি? আরে হ্যাঁ, বন্ধু, তোমাকেই বলছি! আত্মহত্যা করবি নাকি বজরাটার তলায় পড়ে! ভগবানের ভয় রাখিস না!'

কাইপ আরাম করে কোণায় বসে প্রোশকার কথা শুনছিল।

তারপর তার মনটা খারাপ হয়ে গেল এরমালাইকে মিথ্যাকথা বলেছে এই ভেবে। কোথায় সমুদ্রে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন, টর্চ জেবলে জেবলে ভাল করে দেখছে যা কিছু তার ভেঙে যাওয়া নৌকা বলে মনে হচ্ছে — গাছের গুঁড়ি, ভাঙা বাক্স; পথে যেই পড়েছে তাদের সবাইকেই জিজ্ঞাসা করছে তারা কেউ দেখেছে নাকি এক পাগল, বোকা, বদমাস বুড়োকে যে মিথ্যাকথা বলতে বা চুরি করতেও পারে না মানুষের মত, নিজেও কষ্ট পাচ্ছে আর অন্যদেরও কষ্ট পেতে হচ্ছে তার জন্য: বলল ভোরবেলায় ফিরব, আর দেখ দুদিন হল শয়তান তাকে কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

বালিদ্বীপ সরগরম। সবার মুখে কেবল একটাই কথা। যারা নিজেরাই মাছ চুরি করত তারাও এখন অবাক হচ্ছে আর কাইপের নিন্দা করছে: ওর কি সাহস ? আর সময় পেল না — মাছের ঝাঁক আসার ব্যাপারে সবার যেন গায়ে জ্বর এসে গেছে, প্রত্যেকটা নৌকা গোণা, প্রতিটি মানুষ চোখের সামনে।

ছিঃ ছিঃ মহৎ, জ্ঞানী কাইপ একটা মাছিও যে কখনও মারে নি, বালিদ্বীপের সব চাইতে সেরা জেলে — দেখ, মাছচুরির শখ হয়েছে। তার মানে, ব্যাটা বেড়াল তপস্বী...

হ্যাঁ, ঠিক এ কথাই বলবে বালিদ্বীপের লোকেরা। মিথ্যাকথা সে বলত ঠিকই, ছোটখাটো ব্যাপারে, যেমন কাল বলল এরমালাইকে, কিন্তু এছাড়া লোকের মাঝে বাঁচা চলে না। ছোটখাটো ব্যাপার তো লক্ষ্যে পড়ে না, কিন্তু এবার একটা এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল...

প্রোশকা অনেকক্ষণ চুপ করে গেছে — তার মানে নৌকাটা খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে জনহীন সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

কাইপ ভাবল ঘুমিয়ে নেবে একটু। শুয়ে পড়ার আগে প্রোশকাকে জিজ্ঞাসা করল: অনেকক্ষণ লাগবে নাকি বালিদ্বীপ পর্যন্ত যেতে ?

‘ভোরের দিকেই গিয়ে পেঁছিব,’ বলল প্রোশকা, ‘আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, আমি চারদিকে লক্ষ্য রাখব। হয়ত বাবাকেও তুলে নেব। বাবা বোধহয় এতক্ষণে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।’

‘ও এতক্ষণে দ্বীপে ফিরে গেছে,’ প্রোশকাকে আশ্বস্ত করল কাইপ।

‘না,’ মানল না প্রোশকা, ‘বলেছে কাইপকে যতক্ষণ খুঁজে না পাব ততক্ষণ ফিরব না। আপনি তো জানেন, বাবা ভীষণ একগুঁয়ে... কেবল

এখানে আমার গোঁই বেশী দেখা গেল — আমি প্রথম আপনাকে খুঁজে পেলাম...'

'ভাল...' কাইপ প্রশংসা করল ওকে, তারপর একটা বস্তা পেতে শুয়ে পড়ল।

আর যেই সে চোখ বুঁজল, কানের মধ্যে ঝনঝন, ভোঁভোঁ করে উঠল, চোখের সামনে ঢেউ নাচানাচি করতে লাগল, জলে ঢেউ খেলে গেল আর পেরিয়ে গেল সাদা দ্বীপ... দ্বীপ... কাদের সব যেন মুখ তাকিয়ে আছে তার দিকে, হাসছে, মুখ ভেঙাচ্ছে, চোখ টিপে ইসারা করছে, যেন কাইপকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন খবর জানাতে চায়। এক কথায়, কাল আর আজ সে যা কিছু দেখেছে সমুদ্রে, তাই দেখল স্বপ্নে।

এমন এর আগে আর কখনও হয় নি তার — সমুদ্র তার চোখে সয়ে গেছে, বহুদিনই আর সে সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে না।

কাইপ যেই চোখ মেলল, ছবিটা মিলিয়ে গেল কিন্তু কানের মধ্যের ঝনঝন আওয়াজটা কমে গেলেও পুরো মিলিয়ে গেল না।

এ সাধারণ অনিদ্রা নয়, এ হল আয়েষার স্মৃতির সঙ্গে বয়ে আসা দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন। কাইপ ভাবল যে আজ রাতেই সে মারা যাবে।

বুড়ো উঠে টলতে টলতে এগিয়ে গেল কেবিনের মধ্যে প্রোশকার কাছে — এখন কাছে কোন জীবন্ত মানুষকে দরকার।

কাইপ দেখল সার্চলাইটের আলো কেমন করে কুয়াশাকে ভেদ করে যাওয়ার চেষ্টা করছে — রাত্রেও সমুদ্রের ভাপ বেরনো বন্ধ হয় নি।

বজরাটা এগিয়ে চলেছিল সহজগতিতে, প্রোশকার কোন কিছুর ওপর গিয়ে পড়ার ভয় ছিল না। তাই ঘণ্টা বাজিয়ে কাউকে বিরক্ত করছিল না সে...

কিন্তু অন্যান্য অদৃশ্য নৌকাগুলি ভীষণ জোরে জোরে সংকেত ঘণ্টা বাজাচ্ছিল, সেই আওয়াজ কাইপের কাছে মনে হচ্ছিল যেন নরকের দরজার প্রহরীর ঘণ্টার আওয়াজ।

এখন বুড়োর ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছিল যা আগে কখনও হয় নি। অন্তত আর একটা দিনরাত প্রয়োজন তার। একটা মাত্র দিনরাত, এই আজকের রাতটা আর কালকের দিনটা।

'সমুদ্রে জল ছাড়া মানুষ কি অনেক দিন বাঁচতে পারে?' বাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল প্রোশকা।

'মাছের রস খাওয়া যায়,' বলল কাইপ।

'আর ক্লান্ত হয়ে পড়লে?'

'যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ুক না কেন, স্রোত ওর নৌকাকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে যাবেই।'

'আর ডোবা পাহাড়গুলো?' থামল না প্রোশকা।

'ডোবা পাহাড় বড় জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক, নৌকার কোন ভয় নেই।'

'তার মানে, মানুষের সমুদ্রে মরার কোন ভয় নেই... তাহলে এত ঘটনা কি করে ঘটে?'

'মানুষ মরবে যদি সে নিজেই নিজের শত্রু হয়,' ফাঁকি দেওয়া উত্তর দিল কাইপ।

'বাবা কখনই নিজের শত্রু হয় নি,' বলল প্রোশকা। তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি নাকি কাইপচাচা? ঘুমিয়ে নিন। কাল হয়ত মাছ ধরা আরম্ভ হবে — ঘুমের সময় থাকবে না। আর যদি আরম্ভ নাও হয়, তাহলেও অন্য কাজ আছে। নুন গুঁড়োতে বলবে। তীরে বসে ছোট ছোট যাঁতাগুলো ঘোরাব। ঐ যে যেগুলো দিয়ে শুকান মাছ গুঁড়ানো হয়... ওগুলো চলবে তো কাইপচাচা?'

কাইপ ঘাড় নেড়ে জানাল চলবে।

'বাবাকে নিশ্চয়ই দিত গুঁড়ানো নুন। বাবাকে গুদামে সবাই জানে, আর আমাকে নাকে ধরে ঘুরিয়েছে। যাক...'

'শোন্ প্রোশকা,' বাধা দিল ওকে কাইপ। 'সবুজদ্বীপ তুই নিশ্চয়ই ভাল করে জানিস...'

'জান নিশ্চয়ই।' অবাক হল প্রোশকা। 'বহুবার গিয়েছি ওখানে। জানেন ওখানে নৌকা ভেঙেছে কত...'

'ও দিকে সোজা পথ আছে?'

'না, বালিদ্বীপ পেরিয়ে যেতে হবে। অন্য পথ জানি না।'

'ভাল করে ভেবে দেখ প্রোশকা।'

প্রোশকা খানিক চুপ করে থেকে বলল:

'ভেবেছি কাইপচাচা... চেষ্টা করা যেত হয়ত এখান থেকে সবুজদ্বীপ গিয়ে তারপর বাড়ী ফেরার। কিন্তু ভোরবেলায় ফিরতে পারব না হয়ত। সবাই বলবে, বাবা পালাল এখন ছেলেও — গোটা পরিবারটাই এমনি।'

আচ্ছা, সত্যি সত্যি চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? কাইপ নিজেই বজরা চালিয়ে নিয়ে যাবে ডোবা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে। কিন্তু সমুদ্রে যেন

সবাই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করেছে যে তাকে সবুজদ্বীপের পথ দেখিয়ে দেবে না, যেন তারা বুঝতে পেরেছে কি কারণে বুড়ো সেখানে যেতে চাচ্ছে — তারা তাকে ভালবাসে বলেই চায় না যে বুড়ো এই জেলে আর শিকারী, এই সহজ সরল লোকেদের জগৎ ছেড়ে চলে যাক। এই সাদাসিধে মানুষরা একে অপরকে কষ্ট দেয় না...

কাইপ জানে যদি এখন সে বালিদ্বীপে ফিরে যায় তাহলে মাছের ঝাঁক আসার আগে সে আবার রওনা দিতে পারবে বলে মনে হয় না। নেপেস সমস্ত নৌকা পাহারাদারদের বলবে যে বুড়োকে নৌকা দেবে তাকে মরতে হবে। বুড়োকে নুন গুঁড়াতে বসিয়ে দেবে, বস্তা বইতে, জাল বুনতে বলবে — সে সবই বুড়ো ঠিক ঠিক করবে যতক্ষণ না সে পড়ে যায় পা হড়কে...

যেকোন পথে, কোন কিছুকে ভয় না করে, কোন কিছুর সামনে না থেমে শীগগির পৌঁছতেই হবে সবুজদ্বীপে!

প্রোশকার কি হবে? যদি ও সকাল বেলায় নুন ভরা বজরা নিয়ে বালিদ্বীপে না ফেরে তো এরমালাইয়ের অবস্থা খুব খারাপ হবে। অন্যদিন কোন একটা কিছু অজুহাত ভেবে বার করা যায়। বলা যায় পথ হারিয়েছিল। কিন্তু এখন, যখন চারদিকে এমন তাড়াহুড়ো, মাছ শুকানোর জন্য নুন দরকার, তখন আর কোন অজুহাতই চলে না। প্রোশকা ঠিকই বলেছে, সবাই বলবে গোটা পরিবারটাই অমানি।

বেঁচে থাকা লোকদের জ্বালাতন করার কোন অধিকার নেই বুড়োর। তার জন্য এরমালাইকে যথেষ্টই নাজেহাল হতে হয়েছে।

প্রোশকা ক্লান্তিতে আর পারছে না। ওকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

কাইপ হাল ধরল, প্রোশকা গিয়ে শুয়ে পড়ল বস্তার ওপর আর বুড়োকে বলল চারদিকে চোখ রাখতে যদি হঠাৎ বাবার নৌকা দেখা যায়।

কাইপ শুনছিল প্রোশকা কেবল এপাশ ওপাশ করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, বাবার চিন্তায় ঘুম আসছে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, একটুখানি ঘুমোবার পরেই একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে গুঙিয়ে জেগে উঠল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সমুদ্রের চারদিকে দেখল তারপর আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। কাইপের কেবল মনে পড়ছিল পুরনো সব কথা, শান্তি পাচ্ছিল না সে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর কিছু মনে করতে ভয় হয়। সেদিক থেকে মনটা ঘোরাবার জন্য অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করল, যেমন ইন্সপেকটরের দ্বীপের কথা, যেখানে একবার মাছের দালালরা তাকে

অপমান করার জন্য বলেছিল যেন সে বালিদ্বীপের জেলেদের রাজী করায় নৌকাগুলি ডুবিয়ে দিতে, জাল ছিঁড়ে ফেলতে সমবায়ের হাতে সেগুলি যাতে না যায় সেই জন্য। তার এই দীর্ঘ জীবনের যে কথাই মনে করুক না কেন: ঐ মাছের দালালগুলোর কথা; যুদ্ধে আহত ছেলের কথা যাকে নৌকায় করে নিয়ে আসছিল আর্কচি থেকে সেবারও পথ হারিয়েছিল সে; সেই সময়কার কথা যখন সে দলনেতা ছিল, দ্বীপে মাছচুরির জবাব দেবার জন্য তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; যতই সে চিন্তা করে তার ফেলে আসা দিনগুলির কথা, ভাবে যে নিজের কাছে সে কোনদিনই অন্যায় করে নি, যতই অন্যেরা তার দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন। কেবল সেই অল্প বয়সে আয়েষার ঘটনাটা ছাড়া আর সবকিছুতেই সে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, আর কাউকে কখনও কষ্ট দেয় নি...

বরং এই ন্যায়পরায়ণতার জন্য সে চিরকাল ভুগেছে, কেবলমাত্র তার জ্ঞানই তাকে বাঁচিয়েছে রাগে জ্বলে উঠে নতুন কোন ভুল করে বসা থেকে, যার জন্য আবার নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হত।

'আমি আর থাকতে পারছিলাম না দ্বীপে, চলে যাব ঠিক করলাম। এ জন্য না যে ঐ ঘটনার নিয়ে কথাবার্তা, হাসাহাসি, আলোচনা আরম্ভ হয়েছে — তখনও কেউ তা জানত না... জানাজানি হয় অনেক দিন পরে...' মনে পড়তে লাগল বুড়োর।

'ভাবলাম ঝোপের মধ্যের ঐ ঘটনার জন্য করিমবাই, আয়েষা আর আমি তিনজনেই দোষী... আমি যে ভয় করতাম তাই হল। কতবার আয়েষাকে সাবধান করেছি, এমনকি ঘরে বন্ধ করে রেখেছি। ও কোন সুযোগ দিয়েছে করিমবাইকে — তাই এমন হল...

'সন্ধ্যাবেলায় যেখানে মাঠে সব লোকেরা বসেছিল সেখানে এসে বললাম রোজগারের জন্য দ্বীপ ছেড়ে যাব। আয়েষা আমার ফেরার অপেক্ষা করবে আর বিয়ে করবে কেবল তখনই যখন আমার মরাদেহ সমুদ্রে পাওয়া যাবে। যখন সবাই নিশ্চিত হবে যে আমি মৃত তখন আয়েষা মুক্ত হয়ে যাবে...

'সকালে আমি তখনও ঘুমোচ্ছিলাম দূরের পথে পাড়ি দেবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করব বলে। আয়েষা দ্বীপের বুড়ীদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছিল সারাদ্বীপময়, ' আমার জীবন, আমার বাগদত্ত চলে যাচ্ছে!..' এমনভাবেই বাগদত্তদের বিদায় দেওয়ার রীতি ছিল। আমার আর আয়েষার বিদায়পর্বের আচারঅনুষ্ঠান পালন করতে হবে...

'একজন বুড়ী আয়েষার হাত ধরে ফিসফিস করে হুমকি দিয়ে বলল, 'বল তুই — ও অত্যাচারী। এখন ও অত্যাচারী।'

'আয়েষা আর সহ্য করতে পারল না, চীৎকার করে উঠে জামার হাতা দিয়ে চোখ ঢাকল। আর বুড়ীরা তাকে ঠেলতে ঠেলতে আমার বাড়ীতে নিয়ে এল আর বলতে লাগল, 'এ তোর একার দুঃখ নয় কেবল, একার নয়...'

'আয়েষার ভয় লাগছিল — বুড়ীদের ঠাণ্ডা চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। কয়েকজন বুড়ী ছুটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এসে আমাকে জাগাতে লাগাল পিঠে মেরে মেরে। আমি গোঙাচ্ছিলাম। কালো কালো শুকনো শুকনো হাত দিয়ে মুখের ওপর মারছিল। তারপর অমনিই কালো শুকনো পা দিয়ে মারতে লাগল মরিয়া হয়ে যাওয়া বুড়ীগুলো, যাদের বয়স বোঝা কঠিন। মনে হচ্ছিল যেন ওরা জন্মেছেই এমনি হয়ে আর সেই থেকে ওদের একটুও পরিবর্তন হয় নি তেমনি কুৎসিত আর বুড়ীই রয়ে গেছে...

'ওরা প্রতিশোধ নিচ্ছিল আমার তারুণ্যের বিরুদ্ধে, যেহেতু দ্বীপে পুরুষমানুষদেরই কেবল মানুষ বলে গণ্য করা হত। আর যখন আমাকে মেরে মেরে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন উঠানে নিয়ে গেল আমাকে। আমার বাধা দেবার কোন অধিকার ছিল না। আমি দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর যদি পুরুষমানুষ বাড়ী, বাগদত্তা বধূকে ছেড়ে চলে যায় তো তাকে তার বাগদত্তা বধূ আর অন্য মেয়েরা মিলে ভীষণ মারে, এই নিয়ম...

'আমি বালিতে শুয়ে পড়লাম, হাঁফ ছাড়ার জন্য। কেবল ভেড়াগুলোই আমার কষ্ট বুঝছিল — কাছে এসে আমার সর্বাঙ্গ শুঁকছিল। তারপর আয়েষা বেরিয়ে আমার দিকে দেখল, বুড়ীদের বলল, 'ওকে তোলা দরকার এবার।' তার কথার সুরে আর সমব্যথা ছিল না একটুও। মুখটা বেঁকে গেছে, ওর নিজের মধ্যেই প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠেছে বুড়ীরা আমাকে কেমন করে মারছে তা দেখে...

'যতক্ষণ মেয়েরা আঁকশি দিয়ে বাড়ীর দেওয়াল থেকে শুকনো ভেড়ার মাংস পাড়ছিল ততক্ষণে আয়েষা তাড়াতাড়ি করে আমাকে শক্তি যোগাবার জন্য ভেড়ার চর্বি, সাকসাউল গাছের ছাল আর নোনামাটির গাছের পাতা মিলিয়ে এক পানীয় তৈরী করে দিল। যখন ওর দিকে তাকালাম ভাল করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আবার: ভয় আর সহানুভূতি আবার ফিরে এসেছে আয়েষার মধ্যে। কিন্তু যেই বুড়ীরা কড়া চোখে তাকাল তার দিকে অমনি ও ছুটে এসে আমার বুকের ওপর বসে চীৎকার করে শাপ দিল...

'একটু দূরে মাঠে বুড়োরা বসেছিল। বালি নরম, চমৎকার দ্বীপের অনেক দূরের জায়গা থেকে রাতের বেলায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই বালি নিয়ে আসে আলস্য, সুন্দর কোন প্রলোভন এবং বিষাদ। 'এখানে বেশ ভাল, উষ্ণতা।' কার যেন গলা শুনতে পেলাম। 'আরে এ তো কাদের সব যেন দেহ। মানুষের দেহে যে উষ্ণতা ছিল, তা শুধু শুধু চলে যায় না।' প্রথমজনের মতের সমর্থনে শোনা গেল। 'মৃত্যু মানুষকে পরিষ্কার করে তোলে।' শুনতে পেলাম আর কার গলা। 'মানুষ জীবনে যত নোংরাই হোক না কেন, তার বালি, সর্বদাই পরিষ্কার। অন্তুত...'

'কে যেন আমার দিকে দেখিয়ে বলল: 'এই তো ওর বাবা ছিল একটা পাষণ্ড আর গত শীতকালে মরুভূমিতে আমি ওর অস্থি খুঁজে পাই। গুহায় নিয়ে এসে কবর দেব বলে যেই তুলেছি, অমনি অস্থিগুলো গুঁড়িয়ে পড়ে গেল। অবাক হয়ে দেখি তার অস্থির গুঁড়ো সাদা...'

'বুড়োগুলোর কালো চেহারা, ভাঁজ পড়া মুখে বিষণ্ণতা। একে অপরের দিকে তাকিয়ে সরু প্রায় দেখা না যাওয়া চোখে ভ্রূকুটি নিয়ে। তারা গোল হয়ে বসেছিল, আমায় তাদের মাঝে ঢোকবার জন্য পথ করে দিল। আমি তাদের মাঝে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম...

'বুড়ীরা মাটির থালায় করে মাংস নিয়ে এল। বসল তারাও বুড়োদের কাছে, আর আয়েষা থালাটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার কাছে গেল। লোভের সঙ্গে খাচ্ছিল সবাই কোন কথা না বলে। আর হাড়গুলো ছুঁড়ে ফেলছিল আমার পায়ের কাছে...

'ওরা খেয়েদেয়ে যখন বলবে "যাত্রা নিরাপদ হোক" তখন আমি ঐ হাড়গুলি বস্তাতে ভরে নিয়ে নৌকায় চাপিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। সেগুলো আমার সঙ্গেই থাকবে যতদিন না আমি ফিরে আসি ততদিন পর্যন্ত — যাতে আমি আমার বংশকে ভুলে না যাই সে জন্য, আর যদি ভুলে যাই তো আমার মরাদেহটা সমুদ্রে মাছেরা খেয়ে নেবে...

'সবাই খাওয়া শেষ করে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি নীচু হয়ে হাড়গুলো ভরছিলাম বস্তায়। মাঝেমধ্যে কেবল তাকাচ্ছিলাম আয়েষার দিকে, এমন প্রতিশোধ নিতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে আছে যেন আধমরা, বোধহয় বুঝতে পেরেছে আমার কুঅভিপ্রায়ের কথা...

'আয়েষা আমাকে সাহায্য করল বস্তাটা কাঁধে তুলে নিতে — ভীষণ ভারী বস্তাটা, চারটে ভেড়াকে খাওয়া হয়েছে, তারপর বুড়ীরা আমাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। অতি কষ্টে এসে পেঁছিলাম বালির ঢিপি

পর্যন্ত, অনেকবার পড়ে গেলাম, শেষপর্যন্ত কবরখানায় এসে পড়ে একেবারে নির্জীব হয়ে পড়লাম। মৃত্যু হল দৈব ঘটনা, তাই মানুষ কবরখানা করার জন্য বেছে নিয়েছে একটা পোড়ো জায়গাকে, সৌন্দর্য বা অস্থির অমরতার কথা চিন্তা করে নি...

'আমি বস্তা কাঁধে নিয়ে চলছিলাম আর আমার পেছনে আয়েষা আর বুড়ীরা বংশের প্রতিষ্ঠাতা-প্রপিতামহের সমাধি খুঁজতে খুঁজতে আসছিল। সমস্ত ঢিপিগুলোই একরকম, যদিও কেউই নিশ্চিত জানত না যে এই ঢিপিটা সত্যি সত্যিই প্রপিতামহের সমাধি, একটা বুড়ী বলল, 'এখানে!' এখানে আমরা হাঁটু গেড়ে বসলাম...

'বুড়ী কলসী থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল ঢিপিটার ওপর। সবাই বালি আর জল মিশিয়ে তুলে নিতে লাগল। 'বল, আমার সঙ্গে সঙ্গে,' বলল বুড়ী, 'আমি আমার জন্মভূমি ছেড়ে যাচ্ছি...' আমি চোখ বন্ধ করে যতটা সম্ভব, করুণ মুখ করে বলতে লাগলাম। বুড়ীর হাত আমার মুখ ছুঁল। আমার কপালে, গালে, মুখে মাটি মাখিয়ে দিতে থাকল বুড়ী। '...যদি আমি জন্মভূমিকে ভুলে যাই, তো মাছেরা আমাকে খেয়ে ফেলে যেন...'

'আয়েষা আচারঅনুষ্ঠান যা যা করা দরকার সবই ঠিক ঠিক মত করে গেলেও এই কথাগুলি শুনে আর্তনাদ করে উঠেছিল...

' 'যদি আমি কোন মানুষ খুন করি তাহলে যেন তুষার ঝড়ে আমার চোখ অন্ধ হয়ে যায়।' বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বললাম আমি। আয়েষা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আমার পিঠে মারতে আরম্ভ করল, 'ক্ষমা কর আমায়!' চীৎকার করে বলল। বুড়ীরা ওকে আমার থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আয়েষা আমার পা আঁকড়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগল। আমি উঠে দৌড় লাগলাম কবরখানা থেকে। এইভাবেই ছুটে গেলাম একেবারে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত যেখানে আমার নৌকাটা দাঁড়িয়েছিল। ঘেমে নেয়ে অবিরাম নৌকা বাইতে লাগলাম। দ্বীপ থেকে ক্রমশই দূরে চলে যেতে লাগলাম, যেখানে আয়েষাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে গেলাম কষ্ট আর একাকীত্বে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য...'

৭

প্রোশকা ঘুমের মধ্যে খুব ছটফট করছিল। প্রায়ই গোঙাচ্ছিল। একবার উপুড় হয়ে শুচ্ছিল একবার চিত হচ্ছিল, একবার গুটিশুটি হয়ে যাচ্ছিল, তারপর বোধহয় ওর হাতে ঝিঁঝিঁ ধরছিল তাই ও হাতগুলোকে ছুঁড়ে

ছুঁড়ে আরাম করে শুল। সমুদ্রে প্রোশকা কখনই ভাল করে ঘুমোতে পারে না, চাঁদের আলো ওকে কেমন উদ্বিগ্ন করে তোলে, দুঃস্বপ্ন নিয়ে আসে।

সবুজদ্বীপের স্বপ্ন দেখছিল প্রোশকা, কেমন করে জোয়ারের সময় নৌকাগুলি কিছুতেই তীরে ভিড়তে পারছে না, তারা সাদা চন্দ্রালোকিত পথ বেয়ে চাঁদের দিকে যাচ্ছে, উঠছে, উঠছে তারপর কুয়াশায় মিলিয়ে গেল...

কাইপ আগের মতই হুইল ধরে বসেছিল। এখন তার মানসিক ভারসাম্য আবার ফিরে এসেছে।

বজরাটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগল আধাঅন্ধকারের মধ্য দিয়ে, তারপর আবার চাঁদের আলোয় ভাসা পথে।

কখনও সাদা, কখনও সবুজ সবুজ ছাপ ধরা ধূসর রংয়ের এই পথ আরম্ভ হয়েছে অনেক দূরের তীরে তারপর সারা সমুদ্র পেরিয়ে গিয়ে পেঁীছেছে বালিদ্বীপের কাছে; এই পথ আলো ফেলে জেটিতে নৌকার কাছে ঘুমিয়ে থাকা লোকেদের মুখে, তারপর আবার ফিরে যায় সমুদ্রে আর সবুজদ্বীপের সঙ্গে সে সাদা সেতুর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে, তারপর সেখান থেকেও চলে গিয়ে হাজারটা দ্বীপ পেরিয়ে অন্যদিকের তীরে গিয়ে পেঁীছায়, পেঁীছায় স্তেপভূমিতে, শহরে পৃথিবীর সমস্ত লোকেদের চিরভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে...

এখন কাইপও এই পথ ধরে যাচ্ছিল।

প্রথমে একটু অস্বস্তি হলেও তার হাত হাল ধরায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। বুড়োর মনে কোন উদ্বেগ ছিল না কারণ জানে যে সকালবেলায় বজরা গিয়ে পেঁীছাবে বালিদ্বীপে, প্রোশকা নিজের লোকদের দেখতে পাবে।

আর কাইপ কি করবে? ও বালিদ্বীপে ফিরে কি করবে? সবুজদ্বীপে যাবার জন্য আবার নৌকা ও কোথায় পাবে?

হয়ত পূর্বপুরুষ একটু আগেই ডেকে বসেছে ওকে, হয়ত যতদিন তার বাঁচার কথা, সে সব খরচ হয়ে যায় নি?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, কাইপের পথে যত বেশী করে বাধা দেখা দিচ্ছে সেগুলিকে জয় করার জন্য তার শক্তি ও সাহসও ততই বাড়ছে।

প্রোশকা ইতিমধ্যেই ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছে আর সে, বুড়ো একেবারে ভোর পর্যন্ত বিনা শ্রান্তিতে কাজ করতে—জীবনের সঙ্গে লড়তে পারে, মৃত্যু আপাততঃ পিছু হঠে গেছে... পড়ে না গিয়ে নিজের পায়ে

দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছা বুড়োর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু এ সমস্ত কিছুই তো অনন্তকালের জন্য নয়।

তার মানে, চালিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ ইচ্ছাশক্তি আছে তাকে নষ্ট না করে সবুজদ্বীপের তীরে গিয়ে পেঁছিতেই হবে, কালই। যদি নৌকা যোগাড় না হয়, নিজেই, সাঁতার কেটে চলে যাবে।

যাক্, এখন এ সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করার দরকার নেই। এখন বজরাটাকে বালিদ্বীপে নিয়ে যেতে হবে তাকে। মাছ ধরা যে কোন মুহূর্তে আরম্ভ হতে পারে। আর যদি নুন গুঁড়িয়ে উঠতে না পারা যায় তবে দুর্ভোগ আছে সবার কপালে। কার দোষ তা খুঁজে দেখা হবে না, গরমে পচে ফুলে সবুজ হয়ে মাছগুলোকে বালিতে পুঁতে দেওয়া হবে, কেবল ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো মাছের নাড়ীভুঁড়ি টানাটানি করে বেড়াবে গ্রামময়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাইপ আবার ধীর, বিষণ্ন স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেল।

‘একেবারে কাছেই, বালিদ্বীপে আমি থাকতে লাগলাম। আর যাতে এখানে পর হয়ে থাকতে না হয় বুড়োদের ঠিক করে দেওয়া একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হল। সবার কাছে আমি ছিলাম ভাবনাহীন, হাসিখুশী এক যুবক। বিনা কারণেই হাসতাম খুব, সমুদ্রে গান গাইতাম, সমবয়সীদের সঙ্গে কুস্তি লড়তাম বালিতে, প্রায়ই মারপিট ঘুষোঘুষি লাগিয়ে দিতাম।

‘আর্কচির মেলায় নিজের জন্য কিনেছিলাম শেয়ালের চামড়ার এক টুপি আর হলুদ রংয়ের এক হাইবুট। সেগুলো পরে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতাম আর দ্বীপের সুন্দরীদের সঙ্গে হাসিঠাট্টার বিনিময় করতাম। আমার এই আচার-ব্যবহার কেউ খারাপভাবে নিত না, ভাবত — বয়স বাড়লে বুদ্ধিও বাড়বে আর সবাইয়ের মত বংশ বাড়াবে, ভাল মাছধরিয়ে হবে...

‘সেই থেকে কখনই আমাকে সবুজদ্বীপে যেতে হয় নি। পরিবার, নানা দায়িত্ব, ছেলের জন্ম... তারপর এল কঠিন বিক্ষুব্ধ দিনগুলি, যখন কেবল নিজের অবস্থাই নয়, আশপাশের আর সবার অবস্থাও যাচাই করে দেখার প্রয়োজন পড়ল...

‘দ্বীপ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল উপকারী-মহাজনরা, দালালরা আর তাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতারণা, দারিদ্র্য — দ্বীপগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন হল, শ্রম লোকদের পরস্পরের কাছে এনে দিল আর আগে যারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলত, তারা সবাই একত্রিত হল এক বিরাট জেলে সমবায়ে...

'এরমালাই আমাকে রাজী করিয়েছিল তার সঙ্গে সমুদ্র পেরিয়ে গিয়ে ধর্ষণকারী করিমবাই আর তার বন্ধুদের ওপর প্রতিশোধ নিতে। নিজে আমি ও পথে কখনই যেতাম না হয়ত, কারণ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে জানতাম যে প্রতিশোধ অন্যায়ের সব থেকে ভাল জবাব নয়। এখন আরো জানি যে মানুষ জীবনে কোন এক সময়ে নিজের কার্যাবলী নিয়ে চিন্তা করে বলে তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি ইহজীবনে তার মন পরিষ্কার না হয় তবে পরজীবনে যে নতুন জগতে সে যায় সেখানে হবে...

'যখন আমরা আর্কাচিতে গিয়ে পেঁৗছলাম, জানা গেল যে, করিমবাইয়ের বাবা, কারখানার মালিক, খুন হয়েছে তাদের হাতে যাদের ওপর সে অত্যাচার চালিয়েছে, আর করিমবাইয়ের নির্বাসন হয়েছে জনহীন দ্বীপে। এবার ওরও ভাবার সময় এসেছে!..'

চন্দ্রালোকিত পথটা আস্তে মিলিয়ে নেমে যাচ্ছিল সমুদ্রের তলদেশে, ভোরের আলো ফুটছিল।

এরপর বাকী আছে আর একটা দ্বীপ পেরনো, তার থেকে বালিদ্বীপ দুহাত দূরে।

ঘুমন্ত, ঠাণ্ডা দ্বীপটা হঠাৎ দেখা দিল বাঁদিকে। আর হঠাৎই কাইপের মনে হল এই দ্বীপে নেমে তার আত্মীয়ের কাছে একটা নৌকা আদায় করা দরকার।

'প্রোশকা!' ডাকল সে।

প্রোশকা ইতিমধ্যেই গভীর ঘুম ঘুমিয়ে নিয়ে এখন কেবল ঝিমোচ্ছিল, উঠে দাঁড়াল চটপট।

'আরে এর মধ্যেই গন্ধকদ্বীপ,' একটু বিরক্তভাবে বলল সে, নিজেকে মনে মনে গালি দিল এই ভেবে যে সে সারাটা পথ ঘুমিয়ে কাটাল, বুড়োকে একটু বিশ্রাম করতে দিল না। বজরাটা একটু দিক বদল করে গন্ধকদ্বীপের দিকে চলেছে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'জল নেবেন নাকি, কাইপচাচা?'

'না, আমি এখানে নেমে যাব... ঐ যে বালিদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'

দিগন্তে ভেসে ওঠা দ্বীপটা সত্যিই বালিদ্বীপ।

'বাবাকে নৌকাটা দিবি। বলবি যে, আমি...' কাইপ বলতে চাইছিল যে এমনসব ঘটনা ঘটার জন্য সে অনুতপ্ত কিন্তু ভাবল এরমালাই বুঝতে পারবে।

'তার মানে, চলে যাচ্ছেন?' দুঃখিতমনে আবার জিজ্ঞাসা করল প্রোশকা।

কিন্তু কাইপ কেন চলে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করবে, ভাবল সে, নাঃ, ভাল দেখাবে না সেটা।

৮

কাইপের যে আত্মীয়ের কথা মনে পড়েছিল, সে হল সমবায়ের সভাপতি আরালভ।

সভাপতির কুটীরটা জেলে বসতির মধ্যে আলাদা করে চেনা যায় না— আধখানা বসে গেছে বালির মধ্যে, সরু দেওয়ালগুলো ক্ষতিগ্রস্ত, ছাতেঢাকা জলজ লতাপাতাগুলো বহুদিন আগেই পচে গেছে আর দলা পাকিয়ে গেছে যেন সেগুলোকে মাঠে কাজ করার কাঁটা দিয়ে ঘেঁটে দেওয়া হয়েছে।

জেলেরা ছুটির দিনগুলিতে সভাপতির বাড়ী সারিয়ে দিতে চেয়েছিল, ছাতে নতুন করে লতাপাতা বিছাবার জন্য লতাপাতা ইতিমধ্যে তুলেও এনেছিল, কিন্তু আরালভ তাদের নিরস্ত করছিল।

গন্ধকদ্বীপে সবাই জানত যে আরালভ বহুদিনই ভাবছে সবকিছু ছেড়েছুড়ে বিশ্রাম নেবে, জানত বলেই তারা ভয়ে ভয়ে ছিল। কোন কিছু পরামর্শ দিতে তাকে সংকোচ হত, কিন্তু ধীরে ধীরে চুপিচুপি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে আরালভ চলে যাবার জন্য কোন ছুতো না পায়।

জন্মসূত্রে আরালভ বালিদ্বীপের লোক, কিন্তু সেখানে খুব অল্পই যায় সে, সহকারীকে পাঠায়। বালিদ্বীপে তার সম্বন্ধে খুব একটা ভাল মনোভাব ছিল না।

সাধারণতঃ যখন আরালভ কোন দ্বীপে যেত জেলেরা সবাই তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গ্রামের কাজকর্ম, জাল, নৌকা সব দেখাত। বালিদ্বীপে কিন্তু সবাই তীরে বসে থাকত, অন্যান্য সব ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলত আর আরালভ একা একা দ্বীপময় ঘুরে বেরিয়ে ঘরগৃহস্থালী দেখে বেড়াত, সাকসাউলের বেড়া লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেত, ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে তাড়াত আর সবকিছু দেখে, হিসেব করে চুপচাপ মোটর-বোটে চড়ে চলে যেত।

বালিদ্বীপে তার নিজের দেশের লোকদের কেমন যেন অস্বস্তি লাগত এই কথা ভেবে যে, যে আরালভ নিজে জেলে, তার বাপ-ঠাকুর্দা জেলে, যে আরালভকে তারা বিয়ে দিয়েছে, সমুদ্রে নৌকা চালাতে শিখিয়েছে, ব্রিম

মাছ আর স্টার্জন মাছকে আলাদা করে চিনতে শিখিয়েছে, সেই আরালভ — তার মাথায় দুটো শিংও নেই, এমন কিছু জ্ঞানী মহাপুরুষও নয় — তাকে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য বসান হয়েছে।

বালিদ্বীপের লোকেরা বলাবলি করত, আরালভকে ওদের দরকারটাই বা কি? জেলেরা নিজেরাই যখন দরকার জাল ফেলে, মাছের ঝাঁকের পেছনে তাড়া করে, সমুদ্র তাদের যত মাছ দেয় ততই ধরে, একটা মাছ বেশীও না কমও না; তা না তো কি, এ তো ওদের নিজেদেরই কাজ, যে কাজ থেকে সরে থাকবে তার নিজেরই ক্ষতি, আরালভের তো কিছু না। সভাপতি তো আর তাদের হয়ে পেটে কিল মেরে থাকবে না।

অবশ্যই যদি আরালভ না হয়ে অন্য কেউ সভাপতি হত তবে বালিদ্বীপে তার পায়ে পায়ে ঘুরত লোকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, উপরওয়ালা একটু হাসল নাকি, যাতে তারাও সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসতে পারে, উপরওয়ালা কোন মজার কথা বলে নিজেই হা হা করে হেসে ওঠে নাকি যাতে তারাও সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়তে পারে।

এর আগের সভাপতি সাপারভকে তো সবার মনে আছে। সে কারুর মুখে বিদ্রূপের হাসি সহ্য করতে পারত না, পা ঠুকত অহংকারী, আর তক্ষুণি নিজের কুটীরে ঢুকে যেত।

...বড়, ছোট নামহীন অনেকগুলো দ্বীপের সভাপতি আরালভ। এসবগুলো খুব তাড়াতাড়ি একবার দেখে আসতে গেলেও এক সপ্তাহ প্রয়োজন।

একমাসও যায় নি আবার বৈমানিকেরা তাকে খবর দিল যে সমবায়ের সীমানায় দেখা দিয়েছে আবার একটা নতুন ছোট দ্বীপ, যা আগে ডোবা পাহাড় ছিল।

সেখানে গিয়ে দ্বীপটার চারদিক ঘুরে দেখা দরকার। দ্বীপটাকে মাপতে হবে, স্রোতটা এখন কোনদিকে গেল, তীরের কাছে সমুদ্রের গভীরতা কত দেখতে হবে, ভাবতে হবে ভবিষ্যতে জনবসতি সৃষ্টির কথা।

এই সঙ্গে মাছের গতিপথও পরিবর্তিত হল — বসে বসে এ সব হিসেব করতে হবে, বার্ষিক মাছধরার পরিকল্পনাও বদলাতে হবে।

...কাইপ, সভাপতির বাড়ীর বারান্দায় বসেছিল, তখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি, দেখতে পেল অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে আসছে পরিশ্রান্ত আরালভ।

‘কে তুমি গো বুড়ো?’ জিজ্ঞাসা করল আরালভ অপরিচিতকে তার বাড়ীর কাছে চুপ করে বসে থাকতে দেখে।

‘আমি কাইপ। তোমার মায়ের খুড়তুতো ভাই।’

‘বাড়ীর ভেতরে এস!’

কাইপের ভয় হল যে আরালভ এখন ঘুমোতে শুয়ে পড়বে আর সারা সকাল আর দিনটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কাইপ।

‘আমার একটা নৌকা দরকার আকসাকাল*,’ খুব সহজসুরে বলল সে যাতে কোনরকম সন্দেহ উদ্রেক না হয়।

‘কি!’ আরালভের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর হাহা করে হেসে চীৎকার করে বলল, ‘শুনলে, বউ, আমাদের আত্মীয়ের নৌকা দরকার!’

‘দিয়ে দাও,’ বলল ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ, খিটখিটে বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে।

‘শলা পরামর্শ হয়েছে দেখছি! আত্মীয়কে নৌকাও দেব না, মাছও দেব না!’ বলে আরালভ ঘরে ঢুকে খাটে শুয়ে পড়ল, ফোঁস ফোঁস করল খানিক, এপাশ ওপাশ করল তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

‘ঘুমিয়ে উঠলে মনটা ভাল হয়ে যাবে,’ বলে তার বৌ কাইপকে বারান্দাতেই রেখে ঘুমোতে চলে গেল।

কাইপ সমুদ্রতীর বরাবর ঘুরে ঘুরে দ্বীপটা আর তার বসতি দেখে বেড়াতে লাগল। ভোর হচ্ছে ইতিমধ্যে। রাতের বেলায় ছাতের ওপর লুকানো বাষ্প নড়েচড়ে উঠল, ঘন কুয়াশা হয়ে উঠে গিয়ে আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে গেল। বাষ্পটা সমস্ত বাড়ী পেরিয়ে, সারা দ্বীপের ওপর দিয়ে চলে গেল আর সঙ্গে করে পচা মাছের গন্ধটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেন এ হল উষ্ণ বৃষ্টি।

কাইপের আপাদমস্তক কাঁপছিল, দাড়িগুলো এলোমেলো হয়ে গেল।

সে শুনতে পেল সমুদ্র বাষ্পটা ফেরত নিয়ে, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ঢেউ খেলে গেল তার বুকে আবার সব শান্ত হয়ে গেল, তারপর নতুন দিনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, আজকের দিনটা হবে খুব কঠিন ও সংকটজনক, এমন দিন খুব কমই আসে।

চারপাশের সবকিছু একমুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর দরজা

---

* আকসাকাল — উজবেক ভাষায় বৃদ্ধদের সম্ভাষণের ভদ্র রীতি রূপে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। — সম্পাঃ

জানলায় আওয়াজ উঠল, ডেকচিতে জল ফুটে উঠল টগবগ করে, উনান থেকেও ধোঁয়া বেরিয়ে এল — জেলেরাও জেগে উঠল। জালে তাপ্পি দিতে লাগল, নৌকায় আলকাতরা মাখিয়ে জলে ঠেলে নামাতে লাগল। নৌকাগুলি লাফাতে লাগল, চিন্তিত হয়ে উঠল; সবাই, মানুষ আর নৌকা সবাই মাছের ঝাঁক আসার একান্ত অপেক্ষায় আছে।

একটু পরে জেগে উঠল পাখীরাও — বালির মধ্যে ফরফর করতে লাগল, ঝোপের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল চিল, শঙ্খচিল আর ফেজেণ্ট পাখী...

যেদিন থেকে মাছেরা সমুদ্রের উপরিভাগ ছেড়ে জলের গভীরে নেমে গেছে, পাখীদের পক্ষে নিজেদের খাবার খুঁজে নেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ল, সেই থেকে তারা দ্বীপে থাকতে লাগল আর জেলেদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। মানুষের ঘুম ভাঙার পরে তারা ঘুম থেকে ওঠে যাতে সকালের মাছ ধরার পরে চুনোচানা অখাদ্য মাছগুলি তাদের কপালে জোটে।

যখন পাখীরা একটু শান্ত হল, দ্বীপের ওপর শোনা গেল এরোপ্লেনের আওয়াজ, মাছের ঝাঁকের গতি পর্যবেক্ষণ করে ফিরছে।

জেলেরা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে আকাশে অনুসন্ধানকারীকে খুঁজতে লাগল: তারা তাদের সহজ প্রবৃত্তিবশে বুঝতে পারছিল যে এবারে মাছধরা দারুণ সফল হবে।

মানুষের মাথার ওপর দু'পাক খেয়ে, বন্ধুত্বসূচকভাবে পাখা নাড়িয়ে এরোপ্লেনটা নীচু হয়ে উড়ে গেল যেন সমুদ্রের জল খেল খানিক।

তখনই দলনেতা এল জেলেদের কাছে। সবাইকে জড় করে সে কি যেন বোঝাতে লাগল প্রত্যেকের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে, যাতে তার কথা তারা আদেশ বলে মেনে নেয়, তার কথার গুরুত্ব তারা বোঝে।

জেলেরা উত্তরে ঘাড় নাড়ল, বিভিন্ন দিকে চলে গেল তারা। তারপর কাইপের পাশ দিয়ে ছুটোছুটি করে তারা নিয়ে আসতে লাগল দাঁড়, জলের কলস; জালগুলোকে খোঁটা থেকে খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছিল নৌকার দিকে।

আর দলনেতা সারা গ্রাম ঘুরে দরজা, জানলায় টোকা দিয়ে দিয়ে কি যেন অনুরোধ করতে, বোঝাতে, হুমকি দিতে লাগল।

আরম্ভ হচ্ছে বোধহয়, ভাবল কাইপ, তাড়াতাড়ি করে আরালভের বাড়ীর দিকে চলল সে, দেখল আরালভ রেডিওতে কথা বলছে।

'আমাকে ভয় দেখাবেন না, ভগবানের দোহাই!' আরালভ চীৎকার

করে উঠল তারও ওপরওয়ালার উদ্দেশ্যে। 'সব থেকে বেশী পরিশ্রম অবশ্যই আমাদের! না, আমি বলছি না যে আপনারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন... নিজে এসে দেখে যান! সমুদ্র? শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। চলে আসুন!'

কাইপের দিকে পিছন ফিরে এক মিনিট বসে রইল আরালভ বোধহয় চিন্তা করছিল কি করবে তারপর উঠে বুড়োকে বলল:

'আজ বোধহয় কাজে নামছি...'

'আমার কি হবে, আকসাকাল?' ব্যস্তভাবে বলল কাইপ। 'আমার খুড়তুতো বোন তোমার মায়ের নামে অনুরোধ করছি...'

'কোথায় যাবে?'

'সবুজদ্বীপ। এক বেলাতেই পেঁছে যাব। সব থেকে খারাপ নৌকাটাই দাও, রাগ করব না।'

'সবুজদ্বীপ? দাঁড়াও, নৌকা কি হবে? একঘণ্টা বাদে আর্কাচ থেকে একটা বজরা ওদিকে যাবে, ওটাই তোমায় পেঁছে দেবে। কেমন? যাও জেটিতে গিয়ে অপেক্ষা কর।'

'বজরার ব্যাপারটা দারুণ বার করেছে তো মাথা খাটিয়ে,' অবাক হল কাইপ, কি তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, গুটিগুটি এগোল জেটির দিকে।

সত্যিই, একটু পরে ঘাটের কাছে দেখা দিল হাসপাতালের লাল ক্রশ আঁকা বজরা, সেটা থেকে মাইকে চীৎকার শোনা গেল:

'এই কে যাবে হাসপাতালে?'

কাইপের এই গোলমাল হট্টগোলের মধ্যেও ঢুলুনি এসে গিয়েছিল, চটপট চোখ মেলল আর নলখাগড়ার মধ্য দিয়ে বজরার দিকে এগিয়ে গেল, তার ভয় হল ভগবান না করেন খালাসীটা যদি হঠাৎ তাকে না নিয়েই চলে যায়। কিন্তু খালাসীটা দেখা গেল খুবই ভাল ছেলে। সে কাইপকে বজরাতে উঠতে সাহায্য করল, এমনকি স্যাঁতস্যাঁতে বাক্সের ওপর বস্তা পেতে দিল যাতে বুড়োর ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

ছেড়ে দিল বজরাটা এগিয়ে চলল সবুজদ্বীপের দিকে।

কাইপ বাক্সগুলোর ওপর বেশ আরাম করে গুছিয়ে বসল, নিজেকে বলল, 'ভগবান তোমার সহায় হোন, বুড়ো!' সে ঠিক করল কোন চিন্তা করবে না, একটু ঘুমিয়ে নেবে, তারপর কি হয় দেখা যাবে।

যদিও দুরাত ঘুমোয় নি সে তবুও মোটামুটি স্বাভাবিকই বোধ করছিল।

হঠাৎ তার কেমন যেন অস্বস্তি লাগল: কে যেন তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মানে, এখানে সে একা নয়।

একটা বিশ্রী ভয় চেপে ধরল কাইপকে যখন সে দেখতে পেল যে বজরার এক প্রান্তে বসে আছে এক যুবতী মেয়ে, তার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

কাইপ এই কদিনে এত লোকের সংস্পর্শে এসেছে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে এখন চাইছিল একা বসে তার ভেতরের ভগবানের কাছাকাছি হতে যার সঙ্গে সব বিষয় সম্পর্কে কথা বলা শেষ হয় নি এখনও।

আর ঐ খালাসীটাও তার কেবিন থেকে বারবার তাকিয়ে দেখছে, কেমন সব দুর্বোধ্য ইঙ্গিত করছে। মুখে চুকচুক আওয়াজ করছে, কাকে বোঝা যাচ্ছে না তাকে না ঐ যুবতীকে। কি একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়ায় বোধহয় খালাসীটা বজরাটাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাল ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এল, কাইপকে ধাক্কা দিয়ে বাক্সগুলোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, দাঁড়াল আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল, বুঝতে পারল না কি করে কথা আরম্ভ করবে ঐ লম্বা সোনালীচুল, নিরুত্তাপ অ-রুশীয় মুখচোখ মেয়েটির সঙ্গে যে এই এলাকায় এক অসাধারণ ব্যাপার।

খালাসীটা ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখাল, কাইপ বিষণ্ন হয়ে পড়ল।

যুবতীটি লিথুয়ানিয়া থেকে এসেছে সদ্য পাশ করা ডাক্তার, সে নিজে কাইপকে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগল ভাঙা ভাঙা রুশী আর লিথুয়ানীয়া ভাষা মিশিয়ে এক দুর্বোধ্য ভাষায়।

কত্তা তাকে কিছু খবরাখবর দিতে পারেন নাকি, এই সমুদ্রে সে এই প্রথম এসেছে, তার দেশের সমুদ্রের সঙ্গে এই সমুদ্রের খুব কমই মিল, আর্কাচিতে কিছুই জেনে নিতে পারে নি সে সবাই এই মাছের ঝাঁক আসার ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত তাকে বজরাতে উঠিয়ে দিয়েছে আর বলেছে হাসপাতালে গিয়েই তার এখানকার জীবনযাত্রা আর লোকেদের সঙ্গে পরিচয় হবে। সে অত্যন্ত খুশী কর্তার সহযাত্রীনী হতে পেরে যার মুখচোখের জ্ঞান আর স্থৈর্যের ছাপ তার মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছে। কর্তার বয়স কত, কি অসুখ করেছে, এখানকার সমুদ্রে কি মাছ পাওয়া যায়; সে শুনেছে এখানে বিষাক্ত মাছও আছে সত্যি নাকি ; বহুবিবাহ প্রথা পুরোপুরি উচ্ছেদ করা হয়েছে নাকি;এখানে রুশীর সংখ্যা কত, তারা কি এখানে বহুদিন বাস করছে;

আর সে লিথুয়ানীয় হয়ে দ্বীপের লোকেদের জাতীয়তাবোধকে কোন রকম আঘাত করে না বসে যেন; হয়ত কর্তা শুনে থাকবেন এক ভূতত্ত্ববিৎ বালদোনিসের কথা, যিনি বহুবছর ধরে এই দ্বীপগুলিতে কাজ করছেন? কর্তা যেন দয়া করে তাকে একটু সাহায্য করেন, কারণ সে এখানকার কোন কিছু জানে না বলে দিশাহারা হয়ে পড়েছে...

মেয়েটি কাইপের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলেই চলেছে। তার কথা কিছু বোঝা না গেলেও শুনতে ভালই লাগছিল — সৌজন্যতা আর সম্মান দেখিয়ে কথা বলছে সে যেন তার দূর দেশের সমুদ্রের গান গাইছে।

কাইপ তার দিকে তাকিয়ে রইল হতবুদ্ধি হয়ে — লিথুয়ানীয় মেয়েটি যা বলল তার থেকে সে কেবল বুঝল যে মেয়েটি কঠিন অবস্থায় পড়ে তার কাছে কোনো সাহায্য চাইছে।

খালাসীটাও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির কথা শুনছে, আর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে তাকে সাহায্য করার জন্য।

'বেচারী তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছে,' খালাসীটা এমনভাবে বলল যেন একটা পাখীর সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। জল এনে দিল সে মেয়েটিকে একটা ঘটিতে করে।

এক ঢোক মাত্র জল খেল মেয়েটি, ধন্যবাদ জানাল। বজরায় কেউ তার কথা কিছু বুঝতে পারছে না আন্দাজ করে সে ম্লান হয়ে গেল।

খালাসী ঘটিটা নিয়ে চলে গেল নিজের কাজে, মেয়েটি তার কাছে আরো বেশী হেঁয়ালী বলে মনে হতে লাগল।

সবাই চুপ কেবল বজরাটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে আর সমুদ্রের জলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাইপের প্রাণে খুব কষ্ট হতে লাগল। এই প্রথম সে সাহায্য করতে পারল না এমন একজনকে যে তার কাছে কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বোধহয় সাহায্য চাইছিল।

লিথুয়ানীয় মেয়েটি আবার চুপ করে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল।

খালাসীটা আর পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল না। এই জায়গায় সমুদ্রটা একটু অশান্ত, বজরাটাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। খালাসীটা বুঝল সমুদ্রের ভেতরে একটা বিরাট ব্যস্ততা চলছে যেমন প্রায়ই হয় সূর্যগ্রহণের আগে।

তারপর খালাসী একটা গোলমাল শুনতে পেল, অনেক দূরে লোকে উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচামেচি করছিল।

এমন চেঁচামেচি হতে পারে কেবল যদি হাজার জন লোক এক জায়গায় জড় হয় তবেই।

'মাছের ঝাঁক তোলা আরম্ভ হল নাকি ?' বাইনোকুলার দিয়ে দিগন্তে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল খালাসী।

আর সামনে যেদিকে তার বজরাটা যাচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে অনেক নৌকা, স্টীমার, ট্রলার আরও অন্যান্য জলযান।

এই গোটা ভাসমান শক্তিটা এক লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে সমুদ্রটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছিল কিন্তু কাছাকাছি এসেই তারা যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিল।

'মাছের ঝাঁক !' চীৎকার করে খালাসী তার যাত্রীদের জানাল। 'মাছ এসেছে ! উ-লু-লু। আ-লা-লা !' তারপর আফসোস হল। যেন চীৎকার করে দুর্ভাগ্য ডেকে আনল।

কোথা থেকে যেন খুব জোরে চালিয়ে নিয়ে আসা ফেনায় মাখামাখি একটা লঞ্চ দেখা দিল একপাশে, আর খালাসী আদেশ পেল গতি কমাবার।

বজরাটা ডাইনে বাঁয়ে দুলে উঠে থেমে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস ?' জিজ্ঞাসা করল লঞ্চ থেকে।

ইন্সপেকটর আলিবাবাকে চিনতে পেরে ম্লান হয়ে গেল খালাসী, আর যদিও সে আলিবাবার অধীনে কাজ করে না, ভয় পেয়ে গেল সে।

'হাসপাতাল যাচ্ছি ইন্সপেকটর সাব। নিয়ে যাচ্ছি ওষুধ,এক মেয়েমানুষ ডাক্তারকে আর এক বুড়োকে।'

কাইপ গুটিয়ে গেল একেবারে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল আলিবাবার ছিদ্র খোঁজা গাদা গাদা প্রশ্নের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

লঞ্চটা বজরাটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সেটার গায়ে একেবারে লেপটে গেল। আলিবাবা উঠে দাঁড়িয়ে আইনভঙ্গকারীকে ভাল করে মজা বুঝিয়ে দেবে ভাবল কিন্তু লিথুয়ানীয়ার যুবতীটিকে দেখে একটু নরম হল।

'তুই কি আদেশ শুনিস নি ?' দোষীভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খালাসীটাকে বলল সে।

'আমরা সকাল সকাল বেরিয়েছি আলিবাবাসাহেব... ডাক্তারেরও তাড়া ছিল।' খালাসী চোখে মিনতি নিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে তার হয়ে কথা বলার জন্য।

কিন্তু হায় সে কিছুই বুঝল না। বরং তার মনে হল সমুদ্রে দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে আর সাধারণতঃ নাবিকরা যা করে থাকে তেমনি থেমেছে শুভেচ্ছাবিনিময় করার জন্য।

'কে মেয়েটি ?' জিজ্ঞাসা করল আলিবাবা।

'ওর কাজের জায়গায় পেঁছাতে যাচ্ছি। বিদেশী। আমাদের ভাষা কিছুই জানে না। আমি আর বুড়োও ওর কথা কিছুই বুঝতে পারি নি।' খুশীমনেই বলে গেল খালাসীটা।

'মাফ চাইছি,' আলিবাবা ভুল রুশীতে মহিলার উদ্দেশ্যে বলল। তার সৌজন্যতার কারণে তাকে ভালই লাগল মহিলাটির। সে আলিবাবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যার ঘাড়ে অতিথির কাছে মাফ চাইছে আর আশা করছে যে কয়েক দিন বাদে যখন মাছধরা শেষ হবে তখন নিজের লঞ্চে করে তাকে হাসপাতালে পেঁছে দেবে। আর এখন বজরাটাকে আকচিতে ফেরত পাঠাতে হবে তাকে, কারণ সমুদ্রে তাদের পথ জাল আর নৌকাতে বন্ধ — অন্য যে কোন নৌকা মাছের ঝাঁক ধরার কাজে বাধা ঘটাতে পারবে না।

মহিলাটি অনেক কিছুই বুঝতে পারল, দিশাহারা বোধ করল সে। তারপর যখন আলিবাবার কথার উত্তর দিতে লাগল হুড়মুড় করে, তখন আলিবাবা কেবল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ইন্সপেকটর যদি তাকে লঞ্চে করে হাসপাতালে পেঁছে দেন তাতে তার কোন আপত্তি নেই... হয়ত সে তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবে... আর হ্যাঁ, আলিবাবা জানে নাকি তার দেশের লোক বালদোনিস্ এখন কোথায় ?

আলিবাবার মন খারাপ হয়ে গেল — চলে যেতে হবে, মহিলাটিকে হাত নাড়ল যেন বলতে চাইল সব ঠিক হয়ে যাবে আর খালাসীকে বলল:

'ছেড়ে দে নৌকা।'

'যে আজ্ঞে!' খুশী হল সে, সবকিছুই বেশ ভালয় ভালয় শেষ হল।

'আর বুড়োকে আমার কাছে ছেড়ে যাবি,' যেন হঠাৎ মনে পড়ল আলিবাবার। 'আশা করি অসুস্থ নয় ?'

'না, না, আমি ওকে জানি না। বারবার বলতে লাগল, নিয়ে চল্ আমায়, তাই...'

'ভাল ! ঠিক এখনই ও খুব কাজে লাগবে।'

বুড়ো যখন আলিবাবার লঞ্চে উঠে এল আলিবাবা বুড়োকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না, ভাব দেখাল যেন চিনতে পারে নি। খুব ব্যস্ত জিজ্ঞাসাবাদের সময় নেই।

দেখা গেল ধরা পড়েছে কেবল কাইপ একাই নয়, লঞ্চের কোণায় বসে ঢুলছিল তার অজানা আরো চারজন বুড়ো, তারা পরস্পরকে এমন জড়িয়ে আছে যেন তারা সবাই ভাই। তাদের কেউই এখুনি যাকে ধরা হয়েছে তার দিকে তাকিয়ে দেখলও না।

লণ্ডটা চলে যাবার জন্য পাক দিল, লিথুয়ানীয় মেয়েটি অবাক হয়ে কাইপের দিকে তাকিয়ে রইল — আর আলিবাবা বুড়োকে নিয়ে চলল সেই দিকে যেখানে এতদিন অপেক্ষা করে থাকা কর্মযজ্ঞের শুরু হয়েছে।

...ঐ সে এবার নৌকা আর জাল নিয়ে লোকদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর ঐ শত শত লোকের মাঝে কাইপের ভাইয়েরা বালিদ্বীপের জেলেরাও আছে।

সমুদ্র হঠাৎ যেন সংকুচিত হয়ে গেল, তারপর আবার জল বেড়ে গেল, ঐখানে জালের ওপাশে জল এতদিন ঘুমাবার পর হঠাৎ ছুটে গেল, নড়েচড়ে উঠল জালটা ভারী হয়ে পালের মত ফুলে উঠল, আর কাইপের সজাগ কান শুনতে পেল ফাঁদে পড়া মাছ সরলভাবে কেমন হায় হায় করে উঠল।

জালগুলো কেমন ফুলে উঠল আর জলের নীচে চলে যেতে থাকল তা দেখে কাইপ বুঝল মাছধরা খুব সফল, খুব কমই এমন হয়। এবার জেলেদের ঘরে ঘরে প্রাচুর্য আর খুশীর জোয়ার বইবে।

এখন কাজ চালিয়ে যেতে হবে যাতে এই মাছের ঝাঁকটাকে ঘিরে ফেলে সমুদ্রের তল থেকে তুলে আনতে পারা যায় পুরো ঝাঁকটাকে, জালটা টেনে নিয়ে যেতে হবে বালিদ্বীপের দিকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে হবে জেলেদের রাজধানী আর্কাচিতে, কারখানাগুলিতে...

৯

বুড়ো শেষ পর্যন্ত তার জন্মভূমি সবুজদ্বীপে গিয়ে পেঁছিল।

ভালয় ভালয় তীরে নামল, মাটি চুম্বন করল, আশীর্বাদ চাইল দেশের মাটির তারপর আস্তে আস্তে চলল দ্বীপের গভীরে ঝরণার দিকে...

কাইপের খোঁজ বহুদিন ধরে চলেছে। বালিদ্বীপে এমন কেউ নেই যে সমুদ্রে বেরোয় নি আর কুয়াশার মধ্যে নৌকা দেখে চীৎকার করে নি: "কাইপচাচা! ও চাচা!" সত্যিই, তার নামটাই যেন তার ভাগ্যের প্রতীক। *

তারপর ক্রমে ক্রমে তারা মনে করতে লাগল বুড়োর সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ঘটনা। কাইপ সম্বন্ধে এরমালাই অন্যদের থেকে বেশী জানত।

যেমন, এই পাহাড়টা, এরমালাই বলতে লাগল সবাইকে। প্রায়ই যখন

---

* কাইপ — গায়েব। — লেখক।

তুষারঝড় হত তখন এটা থেকে নুনের চাপড়া ঝরে পড়ত, খোলস বদলাত। কোথা থেকে ঐ নুন আসে — ধাঁধা লাগল কাইপের মনে।

বুড়ো ভাবল যে নুন হয়ত পাহাড়টার ভেতরে জমে আছে স্তরে স্তরে, খুঁড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু কয়েক টুকরো পোড়া মাটি ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না : বোধহয় পাহাড়টা কোন একসময় দুর্গ বা গোটা একটা শহর ছিল।

কাইপ বুঝল: ভেড়ারা কেন ঐ পাহাড়ে ওঠে না যতই ওদের তাড়ান হোক না কেন — কারণ মৃত শহরের নুন তেতো আর বিষাক্ত।

এই তো কিছুদিন আগে এক বিদেশী এসে এই পাহাড়টায় খোঁড়াখুঁড়ি করল।

সে দ্বীপের লোকেদের অর্থ দিল আর দ্বীপের লোকেরা তাকে সাহায্য করল যা তাদের মনে হয়েছিল ধনভাণ্ডার খুঁজতে। কিন্তু ধনভাণ্ডারের বদলে তারা খুঁড়ে বার করল দেওয়াল আর এক পাথরের মূর্তি। বালির নীচে বুকে হাত জোড় করে বসে সে ভাবছিল। তাকে টেনে তোলা হল সূর্যের আলোয় কিন্তু সে ভেবেই চলল। বিদেশী ভাল করে বুঝিয়ে দিল যে কোনো এক সময় এখানে এক মঠ ছিল, আর এই মূর্তিটা ভগবানের।

...মনে পড়ত এরমালাইয়ের বন্ধুর কথা... আর এই তো সবুজদ্বীপ থেকে এক জেলে ফিরে এসেছে যে ওখানে হাসপাতালে ছিল, ভগবানের নামে দিব্যি দিয়ে বলছে যে কাইপকে জীবন্ত-অক্ষত দেখেছে যেন বুড়ো মাঠে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে আর তার বশ করা সাপটা মাথা তুলে চারপাশের লোকগুলোকে দেখছে আর নাচছে। সে আরও বলল যে বুড়ো একা ছিল না তার কাছে সাপের ঝুড়ী ধরে বসেছিল তার বুড়ী।

'কোন বুড়ী? কি বাজে বকছিস?' উত্তেজিত হয়ে উঠল দ্বীপের লোকেরা। সবকিছু যাচিয়ে দেখার জন্য সবুজদ্বীপে বজরা পাঠান হবে স্থির হল।

আজ ভোরবেলায় এরমালাই আর কাইপের ছেলে আল্লাবেরগেন একসঙ্গে রওনা দিল সবুজদ্বীপের উদ্দেশ্যে।

প্রোশকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাঁতার কেটে চলছিল নৌকার পেছন পেছন কিন্তু বাবা সমানে তাকে চলে যেতে বলছিল।

মন খারাপ হয়ে গেল প্রোশকার, ফিরে এসে তীরে বসে রইল, ভালয় ভালয় তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায়...

ছোট জনবসতি অঞ্চল

প্রস্তাবনা

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালের এক রাতে পুরনো বুখারায় প্রাদেশিক পার্টি কমিটি-ভবনের সামনে দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধের সাজে সজ্জিত দুটি ভাল জাতের ঘোড়া। তাদের একটার ওপরে বসে ঘুমে ঢুলছিল বেকভের এড্‌জুট্যাণ্ট।

ভবনটির প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছিল, ঐ মানুষটির চেহারা তার মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল। এড্‌জুট্যাণ্টের মুখে একটা ক্ষতচিহ্ন কপাল থেকে আরম্ভ হয়ে সারা গাল ঘুরে ওপরের ঠোঁটের কাছে এসে শেষ হয়েছে – ওটা হল তরবারির আঘাতের দাগ। যদিও বহুদিন আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তবুও এড্‌জুট্যাণ্ট বেকভ ও বুখারাগণবাহিনীর অন্যান্য সৈন্যদের মতই খাকি কুর্তা লাল বর্ডার দেওয়া ব্রীচেস আর মজবুত হলুদ চামড়ার হাইবুট পরে।

প্রহরীটি এড্‌জুট্যাণ্টের ঘুম যাতে না ভেঙে যায় সে জন্য পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে, তারপর পার্টি কমিটির আস্তাবল থেকে খড় নিয়ে এল ঘোড়াগুলোর জন্য। কিন্তু ঘোড়াগুলো খেতে চাইল না।

প্রহরী চোখ পিট পিট করে দেখতে লাগল চমৎকার ঘোড়া দুটির দিকে, ঘোড়ার ওপর বসে ঘুমিয়ে পড়া এড্‌জুট্যাণ্টের দিকে। ভোর হয়ে আসছে।

ভবনটির ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। প্রহরী চমকে উঠে ছুটে গেল ফটকের দিকে। লোহা দিয়ে বাঁধাই করা দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে খুলে গেল, বেকভ বেরিয়ে এল। তার পেছনে — মার্ভলিয়ানভ।

প্রহরী ব্যস্ত হয়ে স্যালুট জানাল।

'তার মানে গাশ্‌দিবানে একদিন ব্যাস, তারপর বিদায় নিয়ে — ফেরত চলে এস।' বেকভকে বলল পার্টি কমিটির সম্পাদক।

প্রহরী আর একবার স্যালুট করল। বেকভ দায়সারা একটা উত্তর দিয়ে ঘোড়ার দিকে পা চালালো।

'আর গাশ্‌দিবানের খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা কোরো না।' পেছন থেকে চীৎকার করল মাভলিয়ানভ। 'চিন্তা কোরো না!'

বেকভ ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে শিস দিতেই পাথরে বাঁধান রাস্তায় খুরের আঘাতে আগুনের ফুলকি উঠিয়ে দৌড় লাগাল ঘোড়া।

খুব দক্ষ ঘোড়সওয়ার এই কম্যাণ্ডার বেকভ! অল্প বয়স, সুশ্রী, তার পরণের সবকিছুই উঁচু মানের, — খাকি কুর্তা, ব্রীচেস, হাইবুট আর তার ঘোড়াটাও এড্‌জুট্যাণ্টের ঘোড়ার থেকে দ্রুতগামী।

বেকভ ও এগামভ গর্বিতভাবে মাথা উঁচু করে পেরিয়ে গেল কতকগুলি নির্জন পাড়া, কতকগুলি দু'তলা তিনতলা বাড়ী — যেগুলি পুরনো বুখারায় কিছুদিন হল তৈরী করা আরম্ভ হয়েছে। বেকভ এত তাড়াহুড়ো করছিল যে এমনকি চাখানা 'দশটি পপলারের' দিকেও তাকাল না। বুখারা থেকে চলে যাবার আগে প্রতিবারই সে এই চাখানায় আসত, শান্তিতে বসে চা খেতে খেতে তাকিয়ে থাকত পপলার গাছের বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলির মাঝে সৃষ্টি হওয়া জলাধারের লাল মাছগুলির দিকে...

'যা! যা!' চীৎকার করে বেকভ ঘোড়াটাকে চাবুক কষাচ্ছিল।

যখন তারা শহর ছেড়ে শিশিরভেজা বড় রাস্তায় এসে পড়ল, তখন এগামভ বেকভের পাশে এল কেন "বিদায় নেওয়ার" কথা বলল জিজ্ঞাসা করার জন্য কিন্তু বেকভ আদেশ দিল:

'কোন প্রশ্ন নয়!'

তারা ডানদিকে মোড় ঘুরল। বেকভ তার জুতো দিয়ে "বুখারা — গাশ্‌দিবান ২০ কিলোমিটার" লেখা ফলকটার ওপর ধাক্কা দিল। সেটা অনেক দূরে বালির ওপর পড়ল গিয়ে। এগামভ একবার ভাবল ঘোড়া থেকে নেমে ফলকটাকে ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দেবে কিন্তু সাহস হল না তার!

স্তেপের ওপর এসে পড়েছে তারা। সাধারণতঃ তারা এই ছোট ছোট পাহাড়ে ভরা স্তেপভূমি পেরিয়ে যায় বেশ হাসি-খুশীভাবেই — গল্প করে সেই সব লড়াইগুলোর কথা। কতবার এই স্তেপের ওপর দিয়ে তারা ধাওয়া করে গেছে বাস্‌মাচ্‌দের*! অনেককে শুইয়ে দিয়েছে নোনা পাহাড়ের পাদদেশে, অনেককে বন্দী করেছে।

আজ কিন্তু বেকভ চুপ করে আছে আর এগামভকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। গরমে ঘেমে গিয়ে খাকি কুর্তাটার বোতাম খুলতে চেষ্টা করল

---

* বাস্‌মাচ্‌ — ডাকাত। — সম্পাঃ

বেকভ কিন্তু পারল না। একেবারেই প্রায় বেঁকানো যায় না বাঁ হাতটাকে যেটাতে বাসমাচ বোবো-নাজারের গুলি লেগেছিল, কিন্তু জেদী বেকভ বিশেষ করে ঐ হাত দিয়েই কুর্তার বোতামগুলো খুলত অভ্যাস করার জন্য।

'ঐ দেখ...' হঠাৎ বেকভ ঘোড়া থামিয়ে এগামভের দিকে ফিরে দেখাল স্তেপের দিকে যেখানে একটা শিয়াল দৌড়ে পালাচ্ছিল।

এগামভ সোজা হয়ে বসল ঘোড়ার ওপর — এত কাছে ছিল জন্তুটা, লাল, বড়, গরমে চোখগুলো চকচক করছে!..

বেকভ মাউজার পিস্তলটা হাতে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল চলতে চলতেই।

"শিয়ালটাকে. মেরে ফেলবে, এমনকি তুলে নিতেও দেবে না ওটাকে, ঐখানে বালির ওপরেই পড়ে থাকবে চিলেদের খাওয়ার অপেক্ষায়... এঃ!" দীর্ঘশ্বাস পড়ল এগামভের। তার চাষীহৃদয় টন টন করে উঠল।

কিন্তু বৃথাই লক্ষ্য স্থির করছিল বেকভ, কারণ শিয়ালটা ইতিমধ্যেই বালির ঢিপির আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে।

কম্যাণ্ডার রাগে ফুলতে ফুলতে পিস্তলটা কাঠের খাপে পুরে রাখল, এগামভ তাকে সান্তনা দেবার চেষ্টায় বলল:

'ওটাকে নিয়ে আমরা যে কি করতাম, যদি ওটা, ঈশ্বর না করেন...'

'তোর এই ছোটখাট ব্যাপারে গার্জেনি ফলানয় বিরক্তি ধরে গেছে আমার!' রুক্ষস্বরে বলল বেকভ, যেন তার মুখে একটা চড় মারল।

ওঃ, কম্যাণ্ডার একটু গলা উঁচু করে কথা বললেই কি কষ্ট যে হত এগামভের... সে কম্যাণ্ডারকে বড় ভালবাসত, তাই চাইত যেন কম্যাণ্ডার তার সঙ্গে নরমভাবে কথা বলেন। এমনভাবে না যেমনভাবে অন্যদের সঙ্গে কথা বলেন। কারণ এড্‌জুট্যাণ্ট তো তাঁর ডান হাত।

বেকভ তার কাছে ভগবান, বেকভের সঙ্গে একসঙ্গে থাকে বলে সে গর্ববোধ করে, এমনকি তার কথাবলার হাঁটাচলার ভঙ্গী নকল করত...

বেকভের ধরণধারণ নকল করত প্রায় সব সৈন্যই, কিন্তু এগামভের ছোটখাট, ভারী চেহারা, মুখে ক্ষতচিহ্ন থাকা সত্বেও তাকে মোটেই সৈন্য বলে মনে হয় না, তাই সে যখন বেকভকে অনুকরণ করার চেষ্টা করত তা দেখে সবাই হাসাহাসি করত তাকে নিয়ে...

'কম্যাণ্ডার আপনার এমন করে কথা বলা উচিত নয় আমার সঙ্গে,' অপমানে জ্বলতে জ্বলতে বলল এগামভ। 'শেষ দিনেও... আজই তো শেষ দিন, তাই না, কম্যাণ্ডার? আপনি তো আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?'

বেকভ ঘোড়ার গতি কমিয়ে এগামভকে কাছে এগিয়ে আসতে দিল।

'মাফ কর, কুলিখান। তুমি প্রকৃত সৈন্য। হ্যাঁ কুলিখান... চলে যাচ্ছি... পার্টি কমিটি আমাকে অন্য কাজে পাঠাচ্ছে বুখারায়। মাফ কর, কুলিখান, শহরে বলে কয়ে, তোমাকে পদক পাইয়ে দেব।'

'সেটাই বড় কথা নয়, কম্যাণ্ডার...'

'না, না আমি চাই যে তুমি পদক পাও।'

'যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি আমাকে নিজের কাছে বুখারায় ডেকে নেবেন, কম্যাণ্ডার।'

'নেব,' তাড়াতাড়ি করে বলল বেকভ।

'আপনার কাজে আসব আমি। আপনার হাতটার চিকিৎসা করব।'

বেকভ উত্তর দিল না, তারপরে শুনিয়ে শুনিয়ে চিন্তা করল:

'বুখারায় অবশ্য ঘোড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুই যদি শিখে নিস তো তোকে আমি আমার গাড়ীর ড্রাইভার করে নেব।'

'আপনি যেন ভুলে যাবেন না, কম্যাণ্ডার...'

স্তেপভূমি পেরিয়ে ঘোড়াগুলি নদীর ওপারের গ্রাম গাশ্‌দিবানে নিয়ে এল তাদের।

দারুণ গরমে শতখানেক লোক মাটি খুঁড়ছে, নালায় জল ঢালছে, ইঁট-কাঠ বোঝাই উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বেকভ সোজা হয়ে বসল ঘোড়ার ওপর, ঘোড়াগুলি নদীর কাছে নেমে গিয়ে ঘোলাটে জল খেল খানিক, তারপর কাঠের সেতুটার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল খুরের খটাখট আওয়াজ তুলে।

নদী পার হয়ে এসে প্রথম ছাউনিটার কাছেই বেকভ মাউজার পিস্তলটা হাতে নিয়ে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল।

সে প্রায় প্রতিবারই গুলি ছুঁড়ে তার আসার সংবাদ দিত, তবুও প্রচণ্ড গরমে, অনাহারে নাজেহাল হয়ে যাওয়া মানুষগুলো কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছিল না, প্রতিবারই তারা ভয় পেয়ে লুকোত উটের আড়ালে, মাটির দেয়ালের আড়ালে।

দ্রুতগতিতে চলা অবস্থাতেই বেকভ থামিয়ে দিল ঘোড়াটাকে।

লোকেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল:

'আপনার মঙ্গল হোক, কম্যাণ্ডার!,'

পিতৃসুলভ স্নেহের সঙ্গে বেকভ বলল, 'তোমাদেরও ভাল হোক!'

শহর তৈরী সবে শুরু হয়েছে। চারটি অস্থায়ী মাটীর কুটির তৈরী করা হয়েছে আর এখন পঞ্চম কুটিরটিকে তৈরী করছে সেই এলাকার সৈন্যরা মিলে।

সবাই জানত যে যারা বিয়ে করে একগাদা বাচ্চাকাচ্চার জন্ম দিয়েছে বেকভ তাদের ভাল চোখে দেখত না; তার মতে নিজের ব্যাক্তিগত সুখসুবিধা নিয়ে মাথা ঘামানর সময় এখনো আসে নি, সবার সুখের কথা চিন্তা করতে হবে আগে; কিন্তু যুদ্ধে বিরক্তি ধরে গেছে সবার, তারা ভালভাবে বাঁচতে চায়, তারা দাবী করছে যাদের পরিবার আছে তাদের জন্য বাড়ী তৈরী করা হোক আগে।

'এবার কার জন্য বাড়ী তৈরীর পালা ?' জিজ্ঞাসা করল বেকভ।

দেখা গেল, শান্তশিষ্ট ভীরু ধরণের সাইদভের বাড়ীর পালা।

'আমি তো সৈনিক হিসাবে কখনই খুব ভাল ছিলাম না। কিন্তু আপনি হুকুম দিয়েছেন আমার জন্য আগে বাড়ী তৈরী করতে। জানি না, কি করে এ ঋণ শোধ করব।' সাইদভ স্ত্রীকে ইঙ্গিতে জানাল চা দিতে।

সাইদভের স্ত্রী, অল্পবয়সী উইগুর জাতির মেয়েটি যাকে সাইদভ অনেক দূরের দেশ থেকে নিয়ে এসেছে, চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল বেকভের দিকে। তারপর লাজুকভাবে ধন্যবাদ দিতে লাগল বেকভকে সন্তানদের নামে।

বেকভ চা খেতে খেতে শুনছিল। সৈন্যরা চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে ভক্তিপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল অপেক্ষায়। সবাই জানে যে বেকভ বুখারা চলে যাচ্ছে।

সাইদভের ছেলেমেয়েরা সেখানেই বালির মধ্যে বেকভের পায়ের কাছে বসে খেলা করছে, বেকভের ধুলোভরা বুটে হাত ঠেকিয়ে দেখছে।

'কি করে ঋন শোধ করবি ?' প্রশ্ন করল বেকভ। 'সৎ পরিশ্রম দিয়ে। বাচ্চাদের মানুষ করে তোল্, প্রকৃত মানুষ ! এই হবে সৈন্যদের পক্ষে উপযুক্ত উপহার !'

'তাই হবে, কম্যাণ্ডার !'

'বুখারায় কি কথা হল, কম্যাণ্ডার ?' পেছন থেকে কে যেন সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করল।

বেকভ একটু দ্বিধায় পড়ল, বুখারা চলে যাবার কথা এখনি বলবে না ভাবল:

'বুখারায় আমাদের কাজে সবাই খুশী। কথা দিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে সিমেণ্ট, কাঠ পাঠাবে। এখন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে হবে।'

'আমরা রাতেও কাজ করব কম্যাণ্ডার। অনেক মশাল জ্বালিয়ে নেব।'

'মশালধারী কে হবে?' সৈন্যদলের আগে আগে কেমন মশালধারীরা চলত সারি দিয়ে বাসমাচদের ভয় পাইয়ে দেবার জন্য সে কথা মনে পড়ায় ঠাট্টা করল বেকভ।

'যারা আগে ছিল তারাই।'

বেকভ সম্মতি জানানোর ভাবে মাথা নাড়িয়ে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল। এতে সবাই অবাক হল।

সাধারণতঃ সে এখানে বাড়ী তৈরীর কাজে থাকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, নির্দেশ দেয়, নিজে হাতে বাড়ীর ভিত্তি গাঁথার উদ্বোধন করে— আর করবে তা জাঁকজমক করে, সৈন্যদলের কনসার্টের সঙ্গে। সে চাইত নবযুগের প্রতিটি দৃশ্য যেন সবার মনে দীর্ঘদিনের জন্য থেকে যায় আর চাইত যে পরিশ্রম যেন মানুষকে হতাশ না করে, তাকে আনন্দ দেয়।

এগামভকে ঘিরে ধরল সবাই।

'তুই জানিস নাকি কিছু?'

'না,' শক্তভাবে বলল এড্‌জুট্যাণ্ট।

তখন সবাই চীৎকার করে বলল;

'কুলিখান বলতে চাচ্ছে না!'

অনেকেই কুলিখানকে ভাল চোখে দেখত না, ভাবত ওর ঘাড়ে সব থেকে সহজ কাজের ভার— এড্‌জুট্যাণ্ট হওয়া...

এগামভ ঘোড়াগুলো সাইদভের হাতে দিয়ে হুকুম দিল তাদের খাওয়াতে, তারপর বেকভের পেছন পেছন চলল কারখানার দিকে।

হঠাৎ সে পিছন থেকে শুনতে পেল;

'শোন সবাই, কম্যাণ্ডার আর আমাদের এখানে থাকবেন না...'

এমন বিষাদ, হতাশা নিয়ে একথা বলা হল যে এগামভের হৃদয়ে যেন শর বিদ্ধ হল।

কিন্তু সে পিছন ফিরে তাকাল না। সে পরিষ্কার জানে যে কম্যাণ্ডার বুখারায় তাকে নিজের গাড়ীর ড্রাইভার করে নেবেন, এর থেকে ভাল কিছুর আর স্বপ্নও দেখতে পারে না...

'কার হাতে ফেলে যাচ্ছে আমাদের?' শোনা গেল আবার। 'কম্যাণ্ডার ছাড়া শহর তৈরী হবে না!'

এগামভ থামল হঠাৎ— তার পেছনে দলবেঁধে চলেছে লোকেরা, দলের

সামনে সব থেকে সাহসী যোদ্ধারা। এগামভ ভাবল, 'এখন অন্ততঃ একবার বুঝুক যে আমি কম্যাণ্ডারের ডান হাত!..'

'কাজ ফেলে চলে আসতে কে বলেছে তোমাদের?'

লোকেরা পিছিয়ে গেল, কালো শ্রান্ত চোখে উদ্বেগ নিয়ে তার দিকে তাকাতে তাকাতে ফিরে গেল সেখানে, যেখানে এলোমেলোভাবে পড়ে ছিল কোদাল, মালবওয়া হাতগাড়ী।

আর এগামভ স্তেপ দিয়ে এগিয়ে চলল কারখানার ফটকের দিকে। তার চারপাশের স্তেপভূমি ক্ষুধার্ত, ভয়ানক। দীর্ঘশ্বাস ফেলল এগামভ। দক্ষিণদিক থেকে বালি এগিয়ে আসছে সব সময়েই; গাশ্দিবান নদী, যার নামে জায়গার নাম, গরমকালে লক্ষ্যণীয়ভাবে তার জল কমে যায়।

বেকভের আদেশে দক্ষিণদিকের গোটা তীরটাতে সাকসাউল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু হাওয়ায় প্রায়ই সাকসাউলের আচ্ছাদন উড়িয়ে নিয়ে যায় আর বালি আবার ক্রমশঃ জলের দিকে এগোতে থাকে...

কেবলমাত্র পশ্চিমদিক থেকে সন্ধ্যাবেলায় হিম বয়ে আসে। বয়ে আসে পলাশ আর তুঁতগাছের গন্ধ...

এগামভ থেমে চোখ কুঁচকে তাকাল দূরে ধূসর দিগন্তরেখার দিকে। ওখানে অন্য মাটি, শক্ত মাটি, ওখানে মরূদ্যান। ওখানে জনবসতি। কম্যাণ্ডার বেকভ আর সভাপতি নুরভের প্রচেষ্টায় ওখানে যৌথখামার তৈরী হয়েছে দু' বছর আগে।

চলতে চলতে এগামভ ভাবল কবে যে শেষ পর্যন্ত যৌথখামার আর গাশ্দিবান একটা মরূদ্যানে মিলিত হবে। এরপরে যারা আসবে, তাদের এই বড় মরূদ্যান সর্বদাই মনে করিয়ে দেবে আমাদের কথা — কম্যাণ্ডার বেকভের কথা, সভাপতি নুরভের কথা!..

এগামভ কম্যাণ্ডারের নাগাল ধরল কারখানার একেবারে কাছে পৌঁছে। কারখানার নীচু মাটির দেওয়ালটার পাশ কাটিয়ে তারা নীরবে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে, যেখানে পাহারাদার দাঁড়িয়েছিল কাঁধে বন্দুক নিয়ে।

বেকভকে দেখে পাহারাদার এটেনশন হয়ে দাঁড়াল আর একেবারে দিশাহারা হয়ে গেল যখন বেকভ জিজ্ঞাসা করল:

'তুরসুনভ কোথায়?'

'শপে আছে, কমরেড ডিরেক্টর! ডাকব?'

বেকভকে এখানে বিভিন্নভাবে ডাকা হয়। কারখানায় তাকে ডাকে ডিরেক্টর বলে, যদিও এখানে কাজ করে তারই সেনাদলের যোদ্ধারা আর তাদের নেতৃত্বে আছে তুরসুনভ। যৌথখামারে ডাকে সভাপতি বলে যদিও আসল সভাপতি হল নুরভ। কেবলমাত্র শহর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত সৈন্যরাই তাকে আগের মত কম্যাণ্ডার বলে ডাকে। আগেকার এই ডাকটাই বেকভের বেশী ভাল লাগত, আর তাকে যে কখনো ডিরেক্টর কখনো সভাপতি বলে ডাকা হত তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে তার খুব অসুবিধা হচ্ছিল।

বেকভ কারখানার চত্বরে এসে দাঁড়াল।

কারখানার দুটি প্রধান শপ সবেমাত্র তৈরী হয়েছে। সেগুলো ইতিমধ্যেই কাজ করছে, তুলো শোধন করছে, আঁশ, তেলের জন্য বীজ আলাদা করছে।

অন্যান্য শপগুলি আর ক্যাণ্টিন তৈরীর কাজ এখনও চলছে, গুদাম বা চালা কিছুই তৈরী হয় নি। তাই নুরভের যৌথখামার থেকে বয়ে আনা তুলো ফেলে রাখা হয় খোলা আকাশের নীচে, অনেক পচে নষ্টও হয়ে যায়। আবার কখনও প্রচণ্ড গরম হয়ে জ্বলে ওঠে, চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

শান্তশিষ্ট বাধ্য তুরসুনভ বরাবরের মতই সবার অলক্ষ্যে এসে দাঁড়াল।

'আমাকে খুঁজছিলে?..' বেকভকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল তার মনমেজাজের গতি বোঝার জন্য।

বেকভ ঘাড় নেড়ে জানাল খুঁজছে।

'চলে যাচ্ছে,' হঠাৎ বুঝতে পারল তুরসুনভ, মনে মনে খুশী হলেও ভয় ধরল কেমন যেন।

'বুখারা থেকে ইঞ্জিনীয়ার এসে পেঁছৈছে,' নিজের মনের অবস্থাটা ঢাকা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি করে বলল সে।

'কোথায় থাকতে দিয়েছ ওকে?'

'অফিসঘরে। তোমার অপেক্ষায় আছে।'

'ওর কাছে পাহারাদার বসাও। কিজিলতেপেতে এমন একজনকে গুলি করেছে কুলাকরা।

বেকভ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তুরসুনভ চুপিচুপি মালিকের দৃষ্টি নিয়ে চারপাশে চোখ চালিয়ে নিল কারণ সে ভাল করেই জানে যে বেকভ চলে গেলে কারখানার একচ্ছত্র অধিপতি হবে সে... কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে মাটির শপগুলি তৈরীর কাজ, চত্বরে ব্যস্ততা এইসবের মধ্যে আগ্রহজনক কোন কিছুই সে দেখতে পেল না। ভয় ধরে গেল তার। পাগুলো অবশ হয়ে গেল,

ভাবল বেকভকে অফিসঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার, সেখানে ঠাণ্ডায় বসে সবাই মিলে ভাল করে ভেবে দেখা দরকার...

তুলোবোঝাই একটা ট্রাক ফটকের মধ্যে দিয়ে চত্বরে এসে ঢোকায় মাটি কেঁপে উঠল।

নুরভ লাফিয়ে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাক চালককে চীৎকার করে বলল:

'দেখিস তাড়াতাড়ি মাল নামান হয় যেন!' ট্রাকের দিকে কাঁটাকোদাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসা কুলিদের দিকে দেখাল সে।

নুরভ গায়ের থেকে রংচটা খাকি কুর্তাটা খুলে ঘামে ভেজা মুখ মুছল।

'আজ চারবার আনা হল, প্রতিবারই আমি নিজে যাই। অসম্ভব কুঁড়ে হয়ে গেছে লোকেরা,' বলল সে বেকভকে।

'কি হয়েছে?'

'তোমার চলে যাওয়ার কথা জানতে পেরেছে যৌথখামারের লোকেরা। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তোমাকেই তো ওরা রক্ষাকর্তা ভাবে। কিন্তু আমিও 'অত্যাচারী বদমাশ' ওদের জন্য কম ভাল করি নি!'

'তুমি ওদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার কর, ওদেরকে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। বিশেষ করে কৃষকদের।'

'শিক্ষিত করে তোলা?! একজনকে শেখাতে গিয়েছিলাম তা সে নদীর ওপার থেকে আমাকে গুলি করল। এই দেখ!'

জুতো খুলে নুরভ দেখাল ডান পায়ে একটা ক্ষতচিহ্ন। রক্ত পড়া সবে বন্ধ হয়েছে।

'তুমি আদর্শবাদী, ইসখাক! সব কিছুতেই!' চীৎকার করে বলল নুরভ। 'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে বিরক্তি লাগে আমার।'

'তর্ক কোরো না, নিজের কাজ করে যাও।'

'বহুদিনই তুমি আর কৃষক নেই, ইসখাক। মাটি তোমায় ভুলে গেছে। আরো বলি, যা কিছু তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাকে মাটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় নিজের কাছ থেকে। মানুষের বেলায়ও তেমনি।'

'আমাকে শেখাতে এসো না!' নুরভ কোন দিকে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বেকভ থামিয়ে দিল তাকে; নুরভ বলতে চাচ্ছিল যে শহর, কারখানা এত দ্রুতগতিতে আর কেবলমাত্র প্রচণ্ড ইচ্ছা আর উদ্যম নিয়ে তৈরী করা যায় না — এ হল জীবনধারার প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

না, নিজে নুরভ কারখানা আর তার নিকটবর্তী শহর গড়ে তোলার

বিরোধী নয়। কারখানা, শহর সবই প্রয়োজন, সেগুলো ছাড়া যৌথখামার শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারে না, সবই সে বোঝে।

'এই যে দয়ালু, ভালমানুষ!' চীৎকার করে বলতে লাগল নুরভ তুরসুনভকে দেখিয়ে। 'কিন্তু জেনো, তুমি চলে গেলে ও সব নষ্ট করবে।'

'তাহলে তোরও বিচার করার দাবী করব আমি।' শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে বলে বেকভ অফিসঘরের দিকে চলে গেল, যেখানে ইঞ্জিনিয়ার তার অপেক্ষায় আছে।

যুবক ইঞ্জিনিয়ার সালিখভ 'নতুন গাশ্‌দিবানের পরিকল্পনা' লেখা কার্ডবোর্ড দেয়ালে টাঙিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল।

বেকভ, নুরভ, তুরসুনভ, এগামভ বসেছিল শক্ত বিছানাটার ওপরে যেখানে দিনের বেলায় কম্যাণ্ডার লেখালেখি করে আর রাত্রে ঘুমোয়।

সালিখভ মস্কোতে পড়াশোনা করেছে, প্রথম উজবেক ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সে একজন। তখনকারদিনের সংখ্যালঘু শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের একজন বলে সালিখভের প্রতি সবারই বিশেষ দৃষ্টি।

প্রথমে বেকভের দলে সবকিছুই চলছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। জোয়ান সৈন্যরা যুদ্ধে গিয়েছিল। অনেক দিন ধরে লড়াই চালিয়েছে, অদ্ভুত উদ্দীপনা নিয়ে পুরনো জীবনধারণপদ্ধতির বিনাশ করেছে। কিন্তু যখন শান্তি এল তারা বুঝল যে ধ্বংস, বিশৃঙ্খলা বেশীদিন ধরে চলতে পারে না, তাদের নিজেদেরকেই গড়ে তুলতে হবে নতুন জীবন। তখন তারা আরো দিশাহারা হয়ে পড়ল কারণ গড়তে কেউ শেখায় নি তাদের।

তখন কম্যাণ্ডার বলল: গোটা দলটা মিলে এমন এক শহর তৈরী করা হোক যা কেউ কখনও দেখে নি। এই দশবছর একসঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে যে সব অভ্যাস হয়েছে, সৈনিকের জীবনের যত কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু সে সব দিয়েই এই নতুন সংসার গড়ে তোলা হবে। আর সব থেকে বড় কথা হল আজকের দিনে এসে পেঁৗছাতে হবে আমাদের বিশ্বাস উদ্দীপনা আর সাহস নিয়ে। আর আমি বেকভ তোমাদের ইঞ্জিনিয়ার হব, হব তোমাদের গুরু, আমি তোমাদের পরস্পরকে ভাই ভাবতে শেখাব।

কাজ আরম্ভ করার কিছুদিন পরেই বেকভ বুঝল যে তাদের প্রয়োজন এমন একজনকে যে যুক্তিযুক্তভাবে জনগণের শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তখন ডাকা হল ইঞ্জিনিয়ার সালিখভকে যে কম্যাণ্ডারের প্রস্তাব প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঙ্গে গ্রহণ করে নতুন গাশ্‌দিবান প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করল।

এখন সে বেশ উত্তেজিত, অকারণে ছটফট করছে, তার এই ছটফটানি দেখে বোঝা যায় যে সে ভীরু ভালমানুষ ধরণের।

'কম্যাণ্ডার বেকভ, আশা করি এবার আর তাড়িয়ে দেবেন না।' হেসে বলল সালিখভ।

'বেশ, বল কি বলবে।' অধৈর্য নিয়ে বলল বেকভ।

ইঞ্জিনিয়ার যে লাইনগুলির ওপর দিয়ে পেন্সিল বুলোচ্ছিল সেসব বেকভের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না, অন্য যারা বসে ছিল তারাও কিছু বুঝছিল না। ইঞ্জিনিয়ারের কথাগুলিকে তারা গ্রহণ করছিল যতটা না বুদ্ধি নিয়ে, তার থেকে বেশী অনুভূতি দিয়ে।

'হ্যাঁ, আপনাদের সব মতামতই বিবেচনা করে দেখা হয়েছে... যখন শহর তৈরী শেষ হবে, কারখানাগুলির এলাকাটা হবে শহরের উপকণ্ঠে। পাঁচ বছর পরে, সাঁইত্রিশ সালের শেষের দিকে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে সাড়ে তিন চারগুণ।'

'বেশী সময় — পাঁচ বছর, বড় বেশী সময়,' উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে আর মনে মনে কি যেন হিসাব করতে মাথা নাড়াল বেকভ।

বেকভের সঙ্গে যারাই কাজ করত তাদের সবাই এই "বড় বেশী সময়"-এর পাল্লায় পড়েছে। কখনও কখনও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ত বেকভ। তার মনে হত, তার চারপাশের লোকেরা এই কারখানা, এই শহরের আসল প্রয়োজনীয়তাটা বুঝছে না।

'বলে যাও ইঞ্জিনিয়ার...'

নুরভ আলোচনার সময় বরাবরের মতই বিষণ্ন হয়ে বসে ছিল, আর তুরসুনভ যেন সেখানে উপস্থিতই নেই। এই শান্তশিষ্ট, নির্বিকার লোকটি আর এগামভ একই গ্রামের লোক, একসঙ্গে বড় হয়েছে, মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেরিয়েছে; তার স্বভাব বেশ ভাল করেই জানত এড্‌জুট্যাণ্ট, বুঝল যে তুরসুনভ এখন ভাবছে এইসব কিছু ছেড়েছুড়ে অনেক দূরে পালিয়ে গিয়ে স্বস্তি পাবার কথা।

'এখন যদি কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকে চল্লিশ জন কর্মী, পাঁচ বছর বাদে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে আটশ', ন'শ'। কারখানায় কর্মীশিক্ষণের জন্য স্কুল খোলার পরিকল্পনাও আছে...'

'কাজের কথা,' ইঞ্জিনিয়ারের থেকে বিছানায় বসা লোকেদের দিকে উদ্দেশ্য করেই বেশী কথা বলছিল বেকভ।

এগামভ যে কোন মুহূর্তে নিজের কম্যাণ্ডারের সমর্থনে কথা বলতে প্রস্তুত। সে জানে বেকভ যাই করুক না কেন তা লোকের ভালর জন্যই। সে হয়ত উঠে দাঁড়িয়ে বলত: "ঠিক কথা, কম্যাণ্ডার, কাজের কথা।" কিন্তু কম্যাণ্ডারের তার সমর্থনের প্রয়োজন নেই জেনে চুপ করে বসে রইল।

'কর্মীশিক্ষণের স্কুল খোলা আপনার পরিকল্পনা, কমরেড বেকভ,' মনে করিয়ে দিল আগে থাকতেই বেকভের ভয়ে অস্থির ইঞ্জিনিয়ার, এখন সে নিজের যুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণ দেখানর চেষ্টা করছে। 'এছাড়া, রেললাইন বসান হবে শহরের দিকে আর শহর থেকে যৌথখামারের দিকে।'

'শুনছ হে, নুরভ, রেললাইন হবে!' কম্যাণ্ডার খুশীতে সভাপতির কাঁধে একটা চাপড় মারল। 'এই পোড়ো জায়গা দিয়ে রেল চলবে! এই ভুলে যাওয়া, অন্ধকার জায়গায় সভ্যতার আলো এসে পেঁছবে!'

নুরভ চোখের কোণ দিয়ে কেবল একটু হাসল মাত্র, কিন্তু তুরসুনভ যে কোন প্রকারে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করার জন্য বলল:

'রেললাইন বসানোর পরিকল্পনাও তোমার কম্যাণ্ডার! কমরেড ইঞ্জিনিয়ার দেখছি তোমার পরিকল্পনাগুলোই নকল করেছে!'

ইঞ্জিনিয়ারকে বেশ ভাল লেগে গেল বেকভের। ইঞ্জিনিয়ার যে প্ল্যানে তার মূল পরিকল্পনা প্রায় সবটাকেই রেখেছে তা দেখে খুশী হয়ে বলল বেকভ, 'ভাল কথা!'

তারপর সে অনেকক্ষণ ধরে ইঞ্জিনিয়ারের হাত ঝাঁকিয়েছিল:

'ধন্যবাদ। এবারে আর বকাবকি করি নি, দেখছেন তো। আর আগের বারের জন্য মাফ চাইছি। আমাদের যেন কোন ভুল না হয় তাই খালি ভাবি।'

সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে দেখে আর তার পরিকল্পনা, তার সমস্ত পরিশ্রমের সদ্ব্যবহার হবে জেনে ইঞ্জিনিয়ারও খুশী, তবুও বেকভকে সে আর একবার মনে করিয়ে দিল:

'এসবই আপনার পরিকল্পনা কমরেড বেকভ। আমি তো কেবল নকসা তৈরী করেছি। আর অর্থনৈতিক দিক থেকেও আপনার পরিকল্পনা খুবই উপযুক্ত এ সত্যি। আপনি প্রথমশ্রেণীর অর্থনীতিবিদ।'

'আরে ব্যাস, ব্যাস,' বেকভ তাকে থামিয়ে দিল উদার প্রসন্নতায়। 'ওসব কথা বলার দরকার নেই। আমি মোটেই অর্থনীতিবিদ নই, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেও পড়ি নি। কেবল মাদ্রাসা পর্যন্ত আমার বিদ্যের দৌড়, এখন তা হল ক্লাস সেভেন স্ট্যাণ্ডার্ড... উদ্যোগ আর বিশ্বাসই মানুষকে করে তোলে অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসক, শিক্ষক, মনে রাখবেন একথা। আপনি

ভাবছেন আমরা জ্ঞানী, বইয়ের পোকা সব? না হে, আমরা যোদ্ধা! এই যে এগ্রামভ, নোংরায় পড়ে ধুঁকছিল টাইফয়েডে, যখন আমাদের দল ওকে তুলে নেয়। আর এখন কেমন দেখছেন ওকে?! সুপুরুষ, অহঙ্কারী, পৃথিবীতে নিজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন...'

বেকভ যা কিছু বলে তাতে তার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার ফলে তার বক্তৃতা হয় চমৎকার, জীবন্ত। এমন কি সংশয়ী নুরভও নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল বেকভের কথা, বিশ্বাস করছিল তার প্রতিটি কথায়।

কতবার এমনি হয়েছে যে কোন লড়াইয়ের আগে বেকভ তার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে শীঘ্রই তাদের জয় হবে, একবার মাত্র শেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন — তাহলেই শান্তি আসবে; তার সৈন্যরা তখন আঘাত, মৃত্যু, ক্লান্তি ভুলে অসীম সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপর আর জয়লাভ করেছে।

এবারও তাই হল। কিন্তু নুরভ নিজের মাথা থেকে এমন সুন্দর ছবিটা সরিয়ে দেবার জন্য মাথা ঝাঁকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল:

'আর নদীটার কি হবে, কমরেড ইঞ্জিনিয়ার। শহর আর যৌথখামার বেড়ে উঠতে থাকবে। কিন্তু নদীতে তো জল বাড়ছে না...'

কিন্তু বেকভ তাকে কথা শেষ করতে দিল না। এবারও সে ধীরস্থির।

'এবার আপনার আগের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছেন আশা করি?' বেকভ ইঞ্জিনিয়ারের উদ্দেশ্যে বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বোধহয় ভুলই হয়েছিল।'

নুরভের মত ইঞ্জিনিয়ারেরও একটু দুশ্চিন্তা ছিল নদীটা নিয়ে, কিন্তু কম্যাণ্ডার প্রতিবারেই বলেছে যে নদীটা এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তাই শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার নিজেকে বোঝাল যে তার ভুল হয়েছে; আর তা সে করল হিসেব পরীক্ষা করে দেখে নয়, বেকভের মত তারও আর ভাবতে ইচ্ছে করছিল না যে তাদের এই বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার পথে কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সব সন্দেহ সে ঝেড়ে ফেলেছে মন থেকে।

'যার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল তাই বলেছিলাম আমি...'

'বুঝেছি, বুঝেছি। ভুল হয়েছিল। সবকিছুকেই আমরা মানুষের জন্য কাজে লাগাব — মরুভূমি, নদী। বছরদশেক বাদে এলে দেখবেন — শুধু শুধুই দুশ্চিন্তা করেছিলেন।'

'ধন্যবাদ,' ইঞ্জিনিয়ার নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবার তারা চারজনে একসঙ্গে। যেমন বহুদিন আগে ছাউনিতে এমনিভাবেই একত্রিত হত তারা চারজনে — কম্যাণ্ডার বেকভ, তার দু'জন সহকারী আর এড্‌জুট্যাণ্ট; কখনও বা মরুভূমিতে, যেখানে তারা এসে পড়েছে লড়াই করতে করতে; কোন বালির রাজ্যে, যেখানে চিলগুলো অপেক্ষা করে আছে তাদের আর তাদের শত্রুদের শবদেহগুলির জন্য। চিলেদের তো আর কোন বাছবিচার নেই, তারা বোঝেও না কোন পতাকা দিয়ে শবদেহগুলি ঢাকা...

চুপ করে বসেছিল সবাই।

'সব ঠিক আছে,' ভাবল বেকভ, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলার পরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, 'সবকিছুই ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে... নুরভই সবার থেকে বেশী খাটছে বলদের মত। ও দাঁড় করিয়ে দেবে যৌথখামারটাকে। যদিও মাথাটায় তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি খেলে না ওর, কাজ চালায় পুরানো পদ্ধতিতে, আর লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারটাও ঠিক ভাল না ওর। কিন্তু ওসব ঠিক হয়ে যাবে... তুরসুনভ সবকিছুতে বিশ্বাস করে কিন্তু ওর মনের জোর নেই তেমন। ওকে একটু সাহায্য করা দরকার... আমার সব সৈন্যরাই চমৎকার, বিশ্বস্ত এগামভ। ওরা চালিয়ে নিয়ে যাবে সবকিছুই...'

ওদিকে এগামভ তুরসুনভের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, 'এমন লোক কি কম্যাণ্ডারের জায়গা নিতে পারবে, পারবে যোদ্ধাদের পিতৃতুল্য হতে?'

কিন্তু তখনই আবার বেকভ তাকে নিজের কাছে বুখারায় নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেবার কথা মনে পড়ায় স্বস্তি বোধ করল।

তুরসুনভের মাথাতেও সেই একই চিন্তা ঘোরাফেরা করছিল। বেকভের মত এমন জনপ্রিয় সে হতে পারবে না — যুক্তি দিয়ে নিজের গুণাগুণ বিচার করতে লাগল সে।

'মাথা ঠাণ্ডা কর, এখন ওসব চিন্তা করার দরকার নেই,' নিজেকে বোঝাতে লাগল তুরসুনভ, তার বুকের ভেতর যেন আগুন জ্বলছে, বমিবমি ভাব লাগছে, কষ্ট হচ্ছে তার। ভীষণ ইচ্ছে হল কেউ যেন সহানুভূতি জানায় তাকে, এর জন্য সে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকে বেকভের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেও পারে; আর কাল ঘুম ভেঙে উঠে অন্য লোক হয়ে গিয়ে সফলভাবে কাজ করবে।

'বেকভ চলে গেলেই আমি বিয়ে করব,' চোখ বুজেই সিদ্ধান্ত নিল সে।

হঠাৎ নুরভের হাসিতে সে চমকে উঠল।

'বেকভ ঐখানে, ওপরে উঠে যাচ্ছে!' ঘরের ছাদটা দেখিয়ে চীৎকার করে বলল নুরভ।

'ওটাই আসল কথা নয়,' বলল কম্যাণ্ডার।

'আর তুরসুনভকে আর আমাকে গুলি করে মারবে। ওরা আমাদের মারার চেষ্টা করবে!'

অনুভূতিপ্রবণ তুরসুনভকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল এই কথাগুলি। মাথা নীচু করে সে বসে রইল বিছানায়।

'কম্যাণ্ডারের পক্ষেও খুব সহজ হবে না,' শেষ পর্যন্ত কথা বলল তুরসুনভ। কিন্তু বলে বসল সেই কথা যা সে মোটেই ভাবছিল না।

কিন্তু বেকভ ইঙ্গিতে জানাল যে নুরভ মানসিক অশান্তিতে ভুগছে তাই ওর কথার কোন প্রতিবাদ করার দরকার নেই।

নুরভ প্রতিটি কথা বলছে আর উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

'সব জায়গায় গাঢাকা দিয়ে আছে ওরা। গাছের ওপরে, খড়ের গাদায়। ওদের স্বভাব ভালই জানি আমি, এই যে!' বলে সে রিভলভারটা বার করে টেবিলের ওপর ঠুকতে লাগল কারণ তার নিজেরই ভেতরে ভেতরে হঠাৎ ভয় ধরেছে বেকভের চলে যাবার কথায়। যতই স্বাধীনভাবে কাজ করুক না কেন সভাপতি জানত যে আছেন একজন কম্যাণ্ডার, যাঁর ওপর নির্ভর করা চলে।

'যেখানেই আমি থাকি না কেন, কারখানার কাজে সাহায্য করব।' তুরসুনভের দিকে ফিরে প্রতিশ্রুতি দিল কম্যাণ্ডার।

'হ্যাঁ, অনুরোধ রেখো। আমি একা সব পেরে উঠব না।'

কাশতে কাশতে আর হাঁফাতে হাঁফাতে নুরভ দরজার কাছে ছুটে গিয়ে ড্রাইভারকে ডাকতে লাগল:

'চল যাব এবার আমরা!.. খোঁড়া সিরাজ ফিরেছে কিনা জানিস?'

'সিরাজকে গুলি করে মারা হয়েছে কমরেড সভাপতি।' উঠোন থেকে ড্রাইভারের ধীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'না, না ও ফিরে এসেছে, ও যে কথা দিয়েছিল!' এই কথাগুলো বলছিল নুরভ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই।

কিছুদিন আগে সে একা স্তেপের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়া করেছিল কুলাক সিরাজের পিছনে যে যৌথখামারের স্তূপাকার তুলোয় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তাদের মুখোমুখি লড়াইতে নুরভ মাথায় ছুরির আঘাত পায়। একমাস ধরে বুখারার হাসপাতালে পড়ে থেকেছে জ্ঞান হারিয়ে।

সেরে উঠল কিন্তু সিরাজ যে ফিরে আসবেই এ চিন্তাটা তার মাথা থেকে গেল না।

'আপনি নিজেই তো সিরাজকে গুলি করেছেন।' ধৈর্য নিয়ে বুঝিয়ে বলল ড্রাইভার।

'এখুনি যেতে হবে,' জেদীভাবে বলল নুরভ। 'আরও রক্তপাত হোক তা চাই না আমি।'

কম্যাণ্ডারের কাছে বিদায় না নিয়েই অবসন্ন নুরভ উঠোনে ছুটে বেরিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে কম্যাণ্ডারকে বিদায় জানানো আরম্ভ হল। শহর থেকে গাড়ী এসে পেঁছিল তাকে চিরকালের জন্য অন্য জগতে নিয়ে যাবার জন্য।

কম্যাণ্ডার যশখ্যাতির চূড়ায় উঠছে, যোদ্ধারা তা জেনে তার মহান সাফল্য কামনা করল। তাকে ছাড়া যোদ্ধাদের খুবই অসুবিধা হবে, কেউই বোধহয় এখন আর বেকভের জায়গা নিতে পারবে না। যত কষ্টই হোক তারা কিন্তু মন খারাপ করবে না, কম্যাণ্ডারের আদেশ অনুযায়ী সবকিছু ঠিক ঠিক করে যাবে।

কারখানা ঘেরা ছিল যে বেড়া দিয়ে সেই বেড়া বরাবর যোদ্ধাদের সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল এগামভ।

লোকেরা এল সবাই হেলমেট আর কোট পরে যেগুলো বহুদিন পড়েছিল সিন্দুকে অব্যবহৃত হয়ে।

এল যোদ্ধাদের বউবাচ্চারাও, নুরভের খামারের চাষীরাও, তাদের প্রিয় কম্যাণ্ডারকে বিদায় জানাতে।

একটু পরেই কারখানার ফটক দিয়ে বেরিয়ে এল স্বয়ং বেকভ আর তার পেছনে তুরসুনভ কম্যাণ্ডারের হাতব্যাগটা নিয়ে। বেকভ যা কিছু নিয়েছে সঙ্গে — বদলি পোশাক, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, আরো কি সব টুকিটাকি সবকিছুই ধরে গেছে ব্যাগটাতে। ব্যাস, এই সব। বেকভের লোভ ছিল না কোন কিছুতেই, আগের মতই সে সৎ, নিঃস্বার্থপর থেকে গিয়েছিল, যা ছিল যোদ্ধাদের কাছে আদর্শস্বরূপ।

লোকেদের যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত দেখে বেকভ খুশী ও অবাক হল।

'সাবধান!' আদেশ দিল এগামভ।

বিউগলে বেজে উঠল আড়ম্বড়পূর্ণ শোভাযাত্রার বাজনা।

সমান তালে পা ফেলে ফেলে এগামভ বেকভের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্যালুট ঠুকল।

'কমরেড কম্যাণ্ডার! বুখারা গণবাহিনীর এক নম্বর ডিভিশন আপনাকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত!'

'বিশ্রাম!' আদেশ দিল বেকভ, তারপর বিদায় নিতে লাগল।

প্রথমেই বেকভ বিদায় নিল তার আরবী ঘোড়াটির কাছে যার সঙ্গে একসঙ্গে কেটেছে তার লড়াই আর অভিযানের এতগুলি বছর।

ঘোড়ার মালিক কেমন করে তার কাছে বিদায় নিচ্ছে তা দেখে যোদ্ধাদের, পূর্বতন চাষীদের, কষ্ট হতে লাগল।

বেকভ প্রত্যেকের কাছে এগিয়ে গিয়ে পিতৃসুলভ কঠোর দৃষ্টিতে ভাল করে দেখছিল, ঢিলে হয়ে যাওয়া কোমরবন্ধ ঠিক করে দিচ্ছিল।

সবাইকে ঘুরে দেখা হলে সে চীৎকার করে বলল, 'ধন্যবাদ! বিদায়!'

তারপর গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

গাড়ীর পেছনে সারি বেঁধে চলল সবাই পা দশেক। কিন্তু মেয়েরা আর থাকতে পারল না, আর্তনাদ করে সারি ভেঙে তারাই প্রথম ছুটে এগিয়ে গেল সামনে। যোদ্ধারাও বিচ্ছেদের দুঃখবেদনায় অভিভূত হয়ে ছুটে চলল।

কম্যাণ্ডারের গাড়ীটা সেতু পেরিয়ে স্তেপে গিয়ে পড়া পর্যন্ত তারা ছুটে চলল পিছন পিছন।

৯

১৯৬২ সালের বসন্তকালের এক প্রত্যূষে স্মারকস্তম্ভের পদতলে বসে, সেই মহান দিনগুলিকে মনে করছিল এগামভ।

অনেক কিছুই তার স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে হারিয়ে গেছে, যদিও, তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগুলিকে হারান মোটেই উচিত ছিল না। কিন্তু বার্দ্ধক্য... এই বৃদ্ধ মগজে স্বপ্ন আর বাস্তব সবই একাকার হয়ে যায়, কিছুই আলাদা করা যায় না।

'হয়ত বা এ সবকিছুই আমি স্বপ্নে দেখেছি?' প্রায়ই ভাবে সে।

অন্য দিনের থেকে বেশ আগেই সে এসেছে আজ স্মারকস্তম্ভের কাছে।

ভোরের আলোয় জেগে ওঠা পাখীগুলি স্তম্ভের সাদাচূড়ার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সবেমাত্র। শীগগির সূর্য উঠবে আর তার রশ্মি এই উঁচু স্তম্ভের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে, স্তম্ভটার সাদা ঝকঝকে চোখ-ধাঁধাঁনো

ঔজ্জ্বল্য মনকে খুশী করবে। সারা গাশ্‌দিবান, তার অন্ধকার, ঘুঁপচি গলিগুলোও স্মারকস্তম্ভের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে...

বুড়ীরা ইতিমধ্যেই স্তম্ভকে ঘিরে বসে গেছে আর আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে, কোন ড্রাইভার হয়ত তাদের কাছে মুলো কিনবে সকালের খাবারের জন্য।

'আজ এখানে বসা নিষেধ। চলে যাও।' কঠোরভাবে বলল এগামভ।

সব্জীওয়ালীরা ভয় পেয়ে গেল। বহুদিন কেউ আর তাদের এই প্রিয় জায়গাটা থেকে তাড়াতে আসে নি। একসময় গাশ্‌দিবানের মিলিশিয়া এই স্মারকস্তম্ভের চত্বরে বিক্রীপাটা চালানো নিষেধ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তারাও হাল ছেড়ে দিয়েছে, পেরে ওঠে নি এদের সঙ্গে।

'আরে কুলিখান যে, চিনতে পারলেন না নাকি আমাদের? আমরা তো এখানকারই লোক, গাশ্‌দিবানের...'

'জানি আমি তোমাদের ছুটকো ব্যবসাদার, ফাটকাবাজদের। দূর হয়ে যাও! তোমাদের দেখে কম্যাণ্ডার বেকভ কি ভাববেন?'

বুড়ীরা ভাবল এগামভের মাথার গোলমাল হয়েছে, তাই ঐ কম্যাণ্ডার বেকভ আবার কে তা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই ওকে।

এগামভ তাদের তাড়িয়ে দিয়ে যেখানে ফুল ফুটে ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল।

গাশ্‌দিবানের ওপর উড়েবেড়ানো খিদেয় জ্বলা এই পাখীগুলোর হাত থেকে আর নিস্তার নেই বুড়োর। তারা অনেক ফুল নষ্ট করেছে, খাবারের সন্ধানে মাটি খুঁড়েছে, এগামভকে অনেক খেটে আবার সব ঠিকঠাক করতে হয়েছে।

তারপর কালোজামের ঝোপের আড়ালে লুকানো বালতি আর ন্যাতাটা নিয়ে স্তম্ভের সিঁড়ির ধাপগুলা ভাল করে মুছতে লাগল। চারদিক থেকে সিঁড়ি উঠে এসেছে। রাতে হাওয়া অনেক বালি উড়িয়ে এনেছে।

বহু বছর ধরে এগামভ স্মারকস্তম্ভের যেখানে যেখানে বালি এসে পড়ে, সে জায়গাগুলো মুছে আসছে। ধোয়, মোছে। প্রতি বসন্তে চত্বরে ফুলের গাছ লাগায়, প্রতি গ্রীষ্মে আর শরতে পচা, শুকনো ডালপালাগুলোকে কেটে ফেলে যাতে স্মারকস্তম্ভের চারপাশ ঝকঝক করে, সুগন্ধ ছড়ায়।

কে আর এসব করবে এগামভ ছাড়া?

কম্যাণ্ডার বেকভের অন্যান্য যোদ্ধারা কবেই মরে গেছে। অনেকে এখানে গাশ্‌দিবানের সমাধিক্ষেত্রে ঘুমিয়ে আছে, আবার অনেকে, এই মাটি যেখানে

বেকভ তাদের নিয়ে এসেছিল তার থেকে দূরে কোথাও গিয়ে মরেছে। যুদ্ধ বা অন্য কোন বড় ঘটনা তাদেরকে গাশ্‌দিবান থেকে বার করে নিয়ে গেছে, যারা চলে গেছে তারা আর ফিরে আসে নি...

আর আজ তাদের কম্যাণ্ডার বেকভের ফিরে আসার কথা।

সিঁড়িটা ঝাঁট দিতে দিতে এগামভ ভাবতে লাগল, 'কম্যাণ্ডার কি চিনতে পারবেন আমাকে?'

উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের হাতগুলোকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবতে লাগল, সেই জোয়ান, শক্তিশালী এগামভ যেমন তাকে বেকভ শেষবার দেখেছিল, তার আজ কি হাল।

প্রাক্তন এড্‌জুট্যাণ্টের মাথা পরিষ্কার কামানো, গাল আর ঠোঁটের কাছে কাটা দাগটা সাদা দাড়িতে প্রায় দেখাই যায় না।

পরণের খাকি কুর্তাটাও আর তেমন নেই। এত বছর ধরে পরার ফলে ঘষে, রংচটে গেছে, এখন একটু অসাবধান হয়ে হাঁটাচলা করলেই ছিঁড়তে থাকে। এমন একটুও জায়গা নেই সেটাতে যে তালি দেওয়া যায়। কাল রাতের বেলায় সে বস্তার কাপড় কেটে শেষ তালিটা দিয়েছে কম্যাণ্ডারের আসার উপলক্ষে তৈরী হবার জন্য।

কুর্তাটা যতই ছেঁড়াফাটা হোক না কেন সেটা পরে এগামভ খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আবার যৌবন ফিরে পেয়েছে বলে মনে হয় তার।

'আচ্ছা, কম্যাণ্ডারকে আমি যে কুর্তাটা সেলাই করে দিয়েছিলাম সেটা তিনি এখনও পরেন নাকি?' এগামভ নিজের চিন্তায় এমন ডুবে ছিল যে রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখতেই ভুলে গেল।

খানাখন্দহীন, চওড়া রাস্তা চলে গেছে দুদিকে: একটা যৌথখামারের দিকে, অন্যটা বুখারার দিকে, সেদিক থেকেই বেকভের আসার কথা।

শব্দে মুখর রাস্তাটা। গাশ্‌দিবান পেরিয়ে গাড়ীর স্রোত চলে যাচ্ছে, নুরভের যৌথখামার থেকে সেগুলো তুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বুখারা — তারা কেউ গাশ্‌দিবানের দিকে ফিরবে না। সারাদিনে কেবল একটা বাস আসে বুখারা থেকে গাশ্‌দিবানে।

বাসটা যেন ভেঙে পড়ার ভয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে স্মারকস্তম্ভের চত্বরটার দিকে। ঐ সময়ে প্রতিদিন স্মারকস্তম্ভের সিঁড়ির ধাপে বসে থাকা এগামভের পাশ কাটিয়ে যায় ড্রাইভার চুপচাপ, এগামভের অভিবাদনের কোন

উত্তর দেয় না। গাশ্‌দিবানের লোকেদের ওপর ওর কিসের অভিমান বোঝে না এগামভ।

অন্ধকার মুখ করে চা খায় সে চাখানাতে বসে, যেখানে তাকে সবাই বেশ সম্মানের চোখে দেখে, যেমন দেখে আর সব বড় শহর থেকে আসা লোকেদের। তারপর আবার খালি বাসটাতে উঠে বুখারার দিকে চলে যায়। গাশ্‌দিবানের লোকেরা খুবই কদাচিৎ বুখারাতে যায়। শুধু কেবল বাজার বা মেলার দিনগুলি ছাড়া।

এখানে এই স্মারকস্তম্ভের চত্বরটা থেকেই গাশ্‌দিবানের শুরু — তারপর একটা চওড়া রাস্তা সোজা চলে গেছে তুলোর মাঠ পর্যন্ত আর ঐ মাঠ থেকেই যৌথখামারের শুরু।

এগামভের দৃঢ় বিশ্বাস, যে কম্যাণ্ডার এলেই গাশ্‌দিবানের সবকিছু গাঝাড়া দিয়ে উঠবে যেন তাজা বাতাস লেগেছে, জীবন সেখানে আর একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, বেকভের সাদা ঘোড়ার মতই ধাওয়া করবে অন্যান্য উন্নত শহরের নাগাল ধরতে।

এগামভের বেশ মনে আছে: তাদের সেনাদল যেখানেই যাক না কেন, সবজায়গাতেই কম্যাণ্ডারের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা লোকের...

সকাল আটটা নাগাদ এগামভের পেছন থেকে টুংটাং আওয়াজ উঠল।

স্মারকস্তম্ভের কাছে পায়োনীয়াররা এসেছে তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ে, তাদের সঙ্গে আছে এক শিক্ষক সবুজ টুপি মাথায়, ব্যাণ্ডমাস্টারের লাঠিটা অতি সাবধানতা সহকারে ধরে রেখেছে হাতে।

কুর্তাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে, মুখে বেশ একটা জমকাল ভাব ফুটিয়ে এগামভ নেমে এল তাদের কাছে। ইঙ্গিতে পায়োনীয়ারদের দেখিয়ে দিল ফুলের কেয়ারির কাছে দাঁড়াতে।

আজ ছেলেরা ভাল পোশাক পরে আছে, মুখচোখে খুশীর আভা। এগামভও খুশী হয়ে শিক্ষককে বলল:

‘ভাল ভাল ছেলে বেছেছ, চমৎকার সব ছেলেরা... কি সুর বাজান হবে, জানে সবাই?’

‘নিশ্চিন্ত থাকুন।’ আশ্বাস দিল শিক্ষক।

‘তাহলে স্মারকস্তম্ভের বাঁদিক থেকে এদের দাঁড় করান।’

ছেলেরা যখন সারি বেঁধে দাঁড়াল, এগামভের চোখে পড়ল দুটি ছেলে

ফুলের তোড়া লুকিয়ে রেখেছে পেছনে, সপ্তাহখানেক আগে তোলা বাসিফুলের তোড়া।

এগামভ তখুনি ফুলগুলি তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিল।

'একি মাস্টার ? এ তো ভাল কথা না। কম্যাণ্ডারেব জন্য এমনি ফুল...'

'স্কুলের বাগানে কেবল এমনি ফুলই আছে,' কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল মাস্টার।

'এই দেখুন, দেখুন কেমন ফুল...' বলল এগামভ।

কোমরবন্ধ থেকে বাঁকা বুখারার ছুরিটা খুলে নিয়ে সে কম্যাণ্ডারের জন্য ফুলের কেয়ারি থেকে কেটে নিতে লাগল সব থেকে বড়, সব থেকে ভাল গ্ল্যাডিয়োলাস ফুলগুলো।

'ছোট একটু ভুলও সব নষ্ট করে দিতে পারে কুলিখান,' নিজেকে বোঝাতে লাগল এগামভ। 'চারদিকে নজর রাখ। তোমার মনের ভেতর যে কি হচ্ছে তা এরা কি বুঝতে পারবে ?"

কত ছুটোছুটি করেছে এগামভ, বুঝিয়েছে যাতে গাশ্‌দিবানের লোকেরা বেকভকে সমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা জানায়, পায়োনীয়াররা যেন স্মারকস্তম্ভের কাছে এসে শোভাযাত্রার সঙ্গীত বাজায় আর কম্যাণ্ডারের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নেয়।

'কে ? কোন বেকভ ?' বুড়োর কথা অনেকক্ষণ ধরে বুঝতেই পারছিল না কেউ, বুড়োকে নিয়ে হাসাহাসি, মজা করল সবাই।

এখানকার লোকেদের এমন হৃদয়হীনতায় শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল এগামভ, কর্তৃপক্ষকে জানাবে ভাবছিল যাতে মিলিশিয়া কোন দ্বিধা না করে লোকেদের তাড়িয়ে এনে জড়ো করে স্মারকস্তম্ভের কাছে, কিন্তু যৌথখামার থেকে এসে পড়ল নুরভ, গাশ্‌দিবানের লোকেরা তার কথা শুনল।

ছেলেমেয়েদের পিছন পিছন এখন তাদের বাবামায়েরাও এসে হাজির হল চত্বরে।

এই সব বুড়োরা একজায়গায় জড়ো হলেই কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে, কি করবে ভেবে পায় না, তাও আবার এমন উৎসবের দিনে।

এগামভের ভাল লাগল না তাদের মুখচোখের ভাব, যেন গাশ্‌দিবানের প্রতিষ্ঠাতাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে নি, এসেছে বাজার থেকে ভাল বেচাকেনা করে ফেরা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে।

'কেমন যেন অদ্ভুত লোক তোমরা,' সোজাসুজি বলেই বসল এগামভ। 'এমন দিনেও দেরী কর। সবাই এসেছে ?'

কেউ তার কথার উত্তর দিল না, বুড়োরা রোদের জন্যে চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল।

স্মারকস্তম্ভের সিঁড়ির ওপর উঠে গুণতে লাগল এগামভ:

'এক... দুই... তিন...' উত্তেজনায় কয়েকবারই তার ভুল হয়ে গেল গুণতে, বুড়োদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করতে লাগল, 'তিরিশ বছরে একবার এমন দিন আসে!'

আর ভীড়ের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল:

'যার যার ছেলেদের পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়াও আর ছেঁড়াখোঁড়া জামাজুতো ঢাকা দাও!'

বুড়োরা তার কথামত কাজ করল, এগামভ এবার শিক্ষককে বলল:

'আমি বলার পরে কিন্তু!.. কত বাজে?'

'পাঁচ মিনিট বাকী...'

"পাঁচ মিনিট বাকী" একটু পরে দেখা হওয়ার সুখানুভূতিতে এগামভের বুকে চাপ পড়ল।

এগামভ যতক্ষণে সবাইকে ঠিক করে দাঁড় করাচ্ছিল ওদিকে ততক্ষণে শুকিয়ে যাওয়া নদীটার ওপরের সেতু দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছে গাড়ীটা।

ধীর, খুশী মনে বেকভ তাকিয়েছিল গাশ্দিবানের দিকে।

'এখানেই আমি শেষ পর্যন্ত শান্তিতে বাঁচতে পারব।' একথা ভাবতে ভাবতে বেকভের চোখে প্রায় জল এসে পড়ল।

দুরুদুরু বক্ষে এগামভ তাকিয়ে রইল ছোট ছোট জানলাওয়ালা রহস্যময় সেই গাড়ীটার দিকে।

ঐ তো ড্রাইভার বাঁদিকের দরজার কাছে এগিয়ে এসে খুলে ধরল দরজাটা...

'না: এ কম্যাণ্ডার নয়।' ভাবল তখনি এগামভ।

যে লোকটি লাঠিতে ভর দিয়ে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল তাকে এগামভের ছোট, অসহায় মনে হল। কম্যাণ্ডার হলে এগামভ সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারত, এর নাকের ওপর আবার কি বিশ্রী এক চশমা বসান। সাদা সাধারণ কুর্তার বুকের বোতামগুলো ভাল করে লাগান, ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় বেচারার, ভাবল এগামভ। আর কি অদ্ভুত কুঁজো লোকটা।

নিজের প্রাক্তন এডজুট্যাণ্টকে বেকভও চিনতে পারে নি। এখানে

এমন ভীড় জমেছে কেন তাও বুঝল না। আর সবকিছুর ওপরে মাথা ছাড়িয়ে ওঠা এই স্মারকস্তম্ভটাও তার বিরক্তি ধরিয়ে দিল।

'না, কিছু একটা ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে, এর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই,' ভাবল বেকভ। 'সবার অলক্ষ্যে এই লোকগুলোর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারলে হয় এখন, কিন্তু কোথায় যাব? কার কাছে? এগামভের কাছে,' প্রথমে তার মাথায় এল।

'ইন্সপেক্টর, বোধহয়,' অসন্তোষ নিয়ে বেকভকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবল এগামভ। 'আঃ কি বিশ্রী ব্যাপার!'

ড্রাইভার বেকভের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ভীড়ের লোকেদের দিকে যারা উদাসভাবে নিরীক্ষণ করছে দু'জন লোককে বেকভকে আর এগামভকে।

'এই হল গাশ্‌দিবানবাসীরা... কিন্তু এরা এখানে জড়ো হয়েছে কেন কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। এখানকার লোকেরা ভীষণ রহস্যময়। প্রতিবারই নতুন নতুন নাটক।'

'এরাই গাশ্‌দিবানের লোক?' আবার জিজ্ঞাসা করল বেকভ, এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কি করবে বুঝতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'গাড়ীটাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলে হয় তা নাহলে কম্যাণ্ডারকে অভ্যর্থনা জানানর ব্যাঘাত হবে,' বিরক্তি নিয়ে ভাবল এগামভ, তখনও সে স্তম্ভের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েছিল, 'এই উদ্ধত ইন্সপেক্টরটাকে ভয় পেয়ে লোকেরা চলে যেতে পারে।'

কিন্তু ভীড়ের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই।

বেকভ গরমে ঘেমে গিয়ে টুপিটা খুলল মাথা থেকে, এগামভ লক্ষ্য করল তার হাতটা প্রায় ভাঁজই হচ্ছে না। আর যখন বেকভ একটু সাহস সঞ্চয় করে একটুখানি এগিয়ে এসে ভীড়ের লোকেদের জিজ্ঞাসা করল, 'কমরেডরা কেউ দেখিয়ে দিতে পার কুলিখান এগামভের বাড়ী?' প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট দুর্বল বোধ করল, যে লোকটাকে সে ইনসপেক্টর ভেবেছে সে লোকটা কম্যাণ্ডারের গলায় কথা বলে উঠল শুনে সে সামান্য গুঙিয়ে উঠল...

তারপর চীৎকার করে উঠল এগামভ:

'কমরেড... কমরেড কম্যাণ্ডার!'

হুড়োহুড়ি আরম্ভ করে দিল সে, নীচে লাফ দিয়ে পড়ল গাড়ীর কাছে।

'ঐ তো সে, প্রাণের কম্যাণ্ডার! আর আমি, বুড়ো গাধা... কি কেলেঙ্কারী!' এগামভ সারা জীবন নিজেকে ঘৃণা করতেও প্রস্তুত।

তার চীৎকার শুনে বেকভ কেঁপে উঠল।

এগামভ তার কাছে ছুটে গিয়ে প্রথমেই নিজের দাড়িটা তুলে ধরল যাতে কম্যাণ্ডার তার মুখের কাটা দাগটা দেখে বুঝতে পারেন যে সে এগামভ, তাঁর এডজুট্যাণ্ট।

তাকে চিনতে পেরে বেকভ টলে গেল এডজুট্যাণ্ট এত বুড়ো হয়ে গেছে দেখে।

এগামভ তাকে ধরল তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আর মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল যাতে কম্যাণ্ডার তার চোখের জল দেখতে না পায়।

বেকভ এডজুট্যাণ্টের চেহারা দেখে দিশাহারা বোধ করল।

'কি অদ্ভুত সে,' খেলে গেল তার মাথায়।

'সেই আগের মতই লম্বা আর মজবুত চেহারা, আমাদের কম্যাণ্ডার, কেবল আমার মত অশ্রুর চোখেই তা পড়ে নি, মনে হয়েছে সে অসহায়।' ভাবল এগামভ, ভেজা উচ্ছ্বসিত চোখে বেকভকে লক্ষ্য করতে করতে।

'এই তো,' বেকভ হতবুদ্ধিভাবে দু'হাত ছড়াল। 'এই তো চলে এলাম।'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' এগামভ উচ্চারণ করতে পারল কেবল।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে শিক্ষকের দিকে ফিরে হাত ইসারা করল।

এতক্ষণ অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পায়োনীয়াররা অলসগতিতে শোভাযাত্রার সুর বেজে উঠল। প্রথম বুখারা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার সুর।

সবই বুঝল বেকভ, বিষণ্ণভাবে একটু হাসল যেন এগামভকে তিরস্কার করল শুধু শুধু এই কষ্ট করার জন্য, তারপর দাঁড়াল সোজা হয়ে যাতে এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে পারে।

কম্যাণ্ডারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই মৃদুহাসি নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

পায়োনীয়াররা ফুলের তোড়া এগিয়ে দিল তার দিকে।

বেকভ নিজের ভূমিকায় আরো ভাল করে অভিনয় করার চেষ্টায় মুখে চোখে কঠোর ভাব ফুটিয়ে তুলল যেমন বীরের হওয়া উচিত, যদিও নিজের চোখেই নিজেকে হাস্যস্পদ বলে মনে হচ্ছে।

'ধন্যবাদ।' পায়োনীয়ারদের বলল সে।

তারপর এগামভ তাকে নিয়ে গেল বয়স্কলোকদের সারি পেরিয়ে।

'তোমাদের পিতা, গাশ্‌দিবানের প্রতিষ্ঠাতাকে অভ্যর্থনা জানাও!' চীৎকার করে বলল সে।

বুড়োরা নত হয়ে অভিবাদন জানাল।

'মঙ্গল হোক!' বলল বেকভ।

'গাশ্দিবানে সুস্বাগতম,' তারা উত্তর দিল।

অভ্যর্থনাকারীদের ভীড়ের সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া শেষ হলে ক্লান্ত বেকভ ভাবল এবার বোধহয় এই নাটকের শেষ হল, এগামভকে সে বলতে চাইল তাকে যেন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

'এই যে, কমরেড কম্যাণ্ডার।' এ তার জীবনে এমন এক উৎসবের মুহূর্ত যে এগামভ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নীরব হয়ে গেল।

এগামভ যে তাকে স্মারকস্তম্ভটা দেখাচ্ছে তা বেকভ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল না। এতক্ষণে একটু অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার প্রতি যেন সে উত্তর খুঁজে না পাওয়া একটি ধাঁধা, অন্ততঃ আজকের দিনে।

কিন্তু এগামভ জোরাজুরি করতে লাগল।

বেকভ সরুফ্রেমের গোল গোল কাঁচের চশমাটা ঠিক করে পরে নিয়ে মাথা তুলল।

সকালের সূর্যের আলোয় স্মারকস্তম্ভটা অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে।

কম্যাণ্ডার কিছু ভাববার বা বুঝে উঠবার আগেই এগামভ তার হাত ধরে স্তম্ভের পাদদেশের কাছে নিয়ে গেল।

'এই যে!' ছোট শ্বেতপাথরের ফলকটার ওপর সাবধানে হাত বুলিয়ে এগামভ বলল, 'এখানেই সব বলা হয়েছে।'

'এখানে গাশ্দিবানে ইসখাক বেকভের নেতৃত্বে গণবাহিনীর এক দল বাসমাচদের দলের নিধন করে।' পড়ল বেকভ।

পড়ল শান্ত, উদাসীনভাবে যেন অন্য কোন লোকের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

কিন্তু নায়কের ভূমিকার চূড়ান্ত পর্যায়ও সফল হওয়া দরকার। শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য করতে থাকা লোকেদের দিকে ফিরে বেকভ বলল:

'আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।' তারপর নীচু হয়ে ফুলের তোড়া দুটি স্মারকস্তম্ভের পাদদেশে রেখে বলল, 'শহীদের স্মৃতি চিরজীবি হোক...'

এগামভ কম্যাণ্ডারের এই বিরক্তি ও অখুশীকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করল।

'বিনয়ী লোক কম্যাণ্ডার। এমন অভ্যর্থনা আশা করে নি তো, তাই দিশাহারা হয়ে গেছে,' ভাবল সে।

বেকভ ফুলের তোড়া স্মারকস্তম্ভের পাদদেশে রাখল দেখে বুড়োরাও তাই করল।

কম্যাণ্ডার প্রত্যেককে বলল:

'ধন্যবাদ, আপনারা শহীদের মর্যাদা সযতনে রক্ষা করছেন...'

এগামভের যেন রূপান্তর হয়েছে, যেন জোয়ানবয়স ফিরে পেয়েছে, কম্যাণ্ডারের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার যেন মনে হচ্ছিল খ্যাতির চূড়ায় উঠে গেছে সে।

'গার্শুদিবানবাসীরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল আমি কে,' ভাবল। এখন আর সে সদাবিরক্ত গজগজে বুড়ো নয় যাকে নিয়ে তারা আড়ালে আবডালে হাসাহাসি করে।

সে এখন আবার বেকভের দলের সৈন্য। তার কম্যাণ্ডারের সম্মানেই এই স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে !

এগামভের মধ্যে এখন এত শক্তির সঞ্চার হয়েছে যে কম্যাণ্ডারের এক ডাকেই আবার সে ঘোড়ায় চড়ে লড়াইতে নেমে পড়তে পারে। সে তৈরী ! কম্যাণ্ডার কেবল একবার ডাক দিক...

বেকভ ওদিকে এই পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টায় এগামভের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল:

'যথেষ্ট হয়েছে, কুলিখান, এবার আমাকে কারখানায় নিয়ে চল।'

বলল বটে, কিন্তু আবার এত লোকের মুখোমুখী হবার ইচ্ছে খুব একটা ছিল না আর। কে জানে এগামভ হয়ত কারখানাতেও এমনি এক বিরক্তিকর অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে। এখন বেকভের সব থেকে বেশী প্রয়োজন শান্তি, কিন্তু সে বুঝল যে এই নতুন ভূমিকার আরো বেশ কিছুক্ষণ তার শান্তি পাবার উপায় নেই।

'কারখানাটা দেখাও, কেবল কোন লোকজন ডাকার দরকার নেই।' ব্যস্ত হয়ে পড়া এগামভকে আবার বলল বেকভ।

বেকভের এই অনুরোধ প্রাক্তন এডজুট্যাণ্টের রামধনুর রঙে রঙীন চিন্তাভাবনাগুলো তছনছ করে দিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ঘাড় নাড়িয়ে বলল সে, 'প্রিয় কারখানায়।'

কিন্তু আবার ইঙ্গিতে বাজনদারদের বাজনা বাজাতে বলল।

বেকভ দৃঢ়পায়ে নেমে এল নীচে ফুলের কেয়ারির কাছে। এগামভও নেমে এল তার পিছনে পিছনে। ড্রাইভার এতক্ষণ ধরে গাড়ীর ভেতরে বসেই হতবুদ্ধি হয়ে এই সব কাণ্ডকারখানা দেখছিল, এই সাধারণ বৃদ্ধ যাত্রীটি

তার চোখে এক বীর নায়কে পরিণত হয়েছে, এখন সে ছুটে এসে বৃদ্ধের দিকে বাড়িয়ে দিল তার হাতব্যাগটি।

এগামভ সেটা হাতে নিয়ে তাকিয়েই বুঝল যে এ হল সেই ছেঁড়াখোঁড়া হাতব্যাগটা যেটাতে করে তিরিশ বছর আগে কম্যাণ্ডার নিজের জিনিস নিয়ে চলে গিয়েছিল।

'চল কারখানায়।' কোন প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে জোর দিয়ে বলে বেকভ গাশ্‌দিবানের প্রধান রাস্তা দিয়ে হাঁটা লাগাল।

বুকটা ব্যাথা করে উঠল এগামভের। চারপাশে তাকাল সভাপতি নুরভের গাড়ী দেখতে পাওয়ার আশায়, আগে থাকতেই তাঁদের কথা হয়েছিল যে সে কম্যাণ্ডারকে নিয়ে যাবার জন্য আসবে।

কথা হয়েছিল যে স্মারকস্তম্ভের কাছে অভ্যর্থনা জানানোর পর নুরভের গাড়ী আসবে আর বেকভকে গাশ্‌দিবান বা কারখানা দেখার কোন সুযোগ না দিয়ে সোজা খামারে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে।

অসুস্থ বেকভের কাছ থেকে তারা আড়াল করতে চাচ্ছে গাশ্‌দিবানের অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার চিত্রগুলি, ধীরেসুস্থে তাকে প্রস্তুত করতে হবে সেই ব্যর্থতাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারার জন্য।

গাড়ীর তীব্র হর্ণ শোনা যেতেই প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট আনন্দে লাফিয়ে উঠল একটু। নুরভের 'ভোলগা' গাড়ীটা লোকদের দুপাশে হঠাতে হঠাতে এগিয়ে গিয়ে স্মারকস্তম্ভের কাছে গিয়ে থেমে গেল, তারপর শোনা গেল চীৎকার:

'এই, এখানে বেকভ কে আছ?'

হাসিতে ফেটে পড়া, উদ্ধত, বুড়ো হয়ে যাওয়া এক মুখ বেরিয়ে এল গাড়ী থেকে। কয়েক সেকেণ্ড কম্যাণ্ডারকে লক্ষ্য করে তারপর হাতের ইঙ্গিত করল: এদিকে এস।

নুরভ এমন উদ্ধত এবং কঠোর ভাব দেখাচ্ছিল কারণ তার ধারণায় এই হচ্ছে বেশ উপযুক্ত ব্যবহার যা বেকভকে তার ইচ্ছেমত চলতে বাধ্য করতে পারে।

আসলে তার ইচ্ছে হচ্ছিল ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে বন্ধুকে আর এতদিন বুকে যে পাষাণ নিয়ে কম্যাণ্ডারের আসার প্রতীক্ষা করেছে তা নেমে যাক।

'এ হল নুরভ, কমরেড কম্যাণ্ডার,' হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া বেকভের কানে কানে বলল এগামভ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ত,' বলল বেকভ, নুরভকে সে চিনেছে সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে প্রথম থেকেই জানত যে বহু বছর পরে নুরভকে সে দেখবে এমনি উদ্ধত এমনি হাস্যপরিহাসপ্রিয় এক বৃদ্ধের রূপে, সে চীৎকার করে বলবে: 'এই, এখানে বেকভ কে আছে ?'

নুরভকে আলিঙ্গন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেকভ, কিন্তু নুরভ তাকে কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই গাড়ীতে টেনে তুলে নিয়ে হাঁফাতে থাকা কম্যাণ্ডারের ওপর পড়ল নিজের ভারী দেহটা নিয়ে। গাড়ীটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

এগামভ ড্রাইভারের পাশে বসে কম্যাণ্ডারের জন্য চিন্তা করছিল।

আর নুরভ বেকভকে তখনও ধাক্কা দিচ্ছিল, কেমন অস্বাভাবিক হাসি হাসছিল, জড়িয়ে ধরছিল থেকে থেকে। বেকভ বাধা দিচ্ছিল, দুর্বল গলায় বিরক্তি জানাচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারছিল না নিজেকে।

কম্যাণ্ডারের চশমাটা নাক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল নুরভের কোলে। এগামভ পিছনে ফিরে সাবধানে সেটাকে তুলে জামার হাতা দিয়ে কাঁচটা ঘষে পরিষ্কার করল। কম্যাণ্ডারের চশমাটা কেমন অদ্ভুত দেখতে। এগামভ কিছুতেই সেটাকে সইয়ে নিতে পারছে না।

নুরভ শেষ পর্যন্ত বেকভকে রেহাই দিল তারপর বন্ধুত্বপূর্ণ ঠাট্টা করে তার নাকের ওপর চশমাটা বসিয়ে দিল।

'আঃ বুড়ো বয়সে তুমি কেমন ফিটফাট বিদ্বান মানুষটি হয়েছ, ঘেন্না হয়...' একটু অতিঅভিনয় হয়ে যাচ্ছে নুরভের।

'তুমিও আর তেমনটি নেই,' ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণভাবে বলল বেকভ।

'তেমনটি নেই ?! সেই রক্তপিপাসু মোরগছানাই আছি !' বলে নুরভ নিজের ভুঁড়িতে চাপড় মারল।

'রক্তপিপাসু মোরগছানা !' অল্পবয়সী নুরভকে যে নামে ডাকা হত তা মনে পড়ে মৃদু হাসল বেকভ।

'আর আমি কম্যাণ্ডার... আমি স্নেহময় সাপ,' বলল এগামভ।

'মনে পড়েছে,' আস্তে করে বলল বেকভ, তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকে দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে বুঝে গম্ভীর হয়ে গেল। 'গাড়ী ঘোরাও সভাপতি, প্রথমে কারখানায় যাব।'

এগামভের দুশ্চিন্তা হল, নুরভ ড্রাইভারকে আদেশ দিল:

'এগিয়ে চল।'

গুটিয়ে গেল বেকভ, ভাল করে লক্ষ্য করল ওদের দু'জনকে, প্রতিবাদ করতে চাইল, চাইল যে ওরা তাকে বুঝিয়ে বলুক সব কিন্তু নুরভ তার মন অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য আবার তাকে ধাক্কা দিতে লাগল জড়িয়ে ধরতে লাগল।

'আর তুরসুনভ, কমরেড কম্যাণ্ডার, লেজ-কাটা চিতা।'

'তুরসুনভ ? বেঁচে আছে ?' অন্যমনস্কভাবে বলল বেকভ।

'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে।' তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করল এগামভ। 'কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত। আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।'

বেকভের মনে সন্দেহ শেষ পর্যন্ত বেশ ভালভাবে গেড়ে বসল।

কি একটা যেন ঘটেছে গাশ্‌দিবানে, বন্ধুরা তার কাছ থেকে তা লুকোতে চাইছে। এমন একটা কিছু যা তার কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়। মন খারাপ হয়ে গেল বেকভের, জীবনে তার এত অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে যে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'দেখ, কম্যাণ্ডার !' নুরভ জানলার বাইরে দেখাল।

রাস্তার দু'দিকেই বিস্তৃত তুলোর খেত।

আঙ্গুরখেতে ঝুলন্ত পাকা আঙ্গুরের গুচ্ছে রোদ আর শিশির পড়ে ঝকঝক করছে।

তারপর বেকভের চোখে পড়ল এক বিরাট সবুজ মাঠ, অশ্বশাবকরা চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। গাড়ী দেখে সেই অশ্বশাবকগুলি দৌড় লাগাল, লাফালাফি আর চিঁহি ডাকতে আরম্ভ করে দিল, আর তা দেখে বৃদ্ধ অশ্বারোহীর মনে আবার আনন্দ জাগল।

প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট কিন্তু এসবকিছু দেখছিল একেবারে অন্য চোখে। এমনি মাঠেই সে বড় হয়ে উঠেছে, এমন জায়গাতেই সে মরতে চায়। যখন সে বুঝতে পারবে মৃত্যু এগিয়ে আসছে দমবন্ধ করা গাশ্‌দিবান ছেড়ে চলে আসবে এই সবুজ জনহীন সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবার জন্য।

'গাড়ী থামাও ড্রাইভার !' আদেশ দিয়ে নুরভ গাড়ীর দরজা খুলল।

মাঠটা দেখে মনটা খুব হালকা হয়ে গেল তার, মনে পড়ল যখন তারা জোয়ান আর সাহসী ছিল বাসমাচদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য যখন তারা মরুভূমিতে দিন কাটাচ্ছিল তখন তারা স্বপ্ন দেখত মরুদ্যানের। বালির সমুদ্রের মধ্যে ঘাসেভরা জায়গা দেখলেই, ঘাসে ডুবে পড়ে তারা কুস্তি শুরু করে দিত, পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য।

'নেমে এস বেকভ, কুস্তি করব !'

নুরভ গাড়ী থেকে নেমে এল, বুকপকেটের কাছে অবহেলায় পদক লাগান পশমের কুর্তাটা খুলে ফেলল।

'কি বলছ কি?' নুরভ ঠাট্টা করছে না বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল বেকভ।

'নেমে এস, বলছি!' বেকভকে টেনে নামিয়ে এনে, হাত ঘষতে ঘষতে নুরভ লড়াইয়ের জন্য তৈরী হতে লাগল।

কিন্তু বেকভের ক্ষমতা ছিল না প্রতিরোধ করার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল সে।

'তাহলে!' তাকে উৎসাহ দেবার জন্য চীৎকার করে বলল নুরভ, 'স্টার্ট!'

তারপর কম্যাণ্ডারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দু'জনে মিলে পড়ে গেল ঘাসের ওপর।

কম্যাণ্ডার আস্তে করে 'উঃ,' করে উঠল।

হতবুদ্ধি এগামভ সাহায্যের জন্য ছুটে আসবে ভাবছিল কিন্তু বুঝল যে ভয়ংকর কিছুই ঘটে নি।

দুই বন্ধু চুপ করে পাশাপাশি শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্মৃতির সাগরে ডুবে গেছে।

চারপাশের এই সবুজ ফিরিয়ে আনে মনের শান্তি।

'জান আমরা কোনখানে শুয়ে আছি?'

'জানি,' তেমনি নীচু, স্থিরস্বরে উত্তর দিল বেকভ।

'এখানে আগে বালি ছিল। এখানেই আমরা লড়েছি। আর আমাদের অনেকেই এখানে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'দেখ।' নুরভ একটা ঘাস তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল। 'এটা কারুর হৃদয়ের রক্তনাড়ী ছিল, সেই হৃদয় কেঁপে উঠেছে যখন তুমি তরবারি তুলে নিয়ে চীৎকার করে বলেছ: 'শত্রু নিপাত যাক!' আর এখন সেই হৃদয় পরিণত হয়েছে এক অতি সাধারণ ঘাসে।'

চুপ করে রইল বেকভ এমন সব জটিল চিন্তাধারায় হতবুদ্ধি হয়ে।

তা বুঝল নুরভ, তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে, তার কুর্তা থেকে ঘাস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আস্তে করে বলল:

'ধুত্তোরি, তোমার কাছে থাকলে কেমন যেন দার্শনিকতা করার ইচ্ছে হয় কেবল...'

চাষীরা জানত বেকভের আসার কথা।

গাড়ীর হর্ণ শুনে তারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে চোখ কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল চলে যাওয়া গাড়ীর দিকে কম্যাণ্ডারকে ভাল করে দেখার জন্য।

থামওয়ালা লাল বাড়ীটা — যেখানে যৌথখামারের কর্তৃপক্ষের অফিস — সেখানেও অনেক লোক জড় হয়েছে।

চুপ করে সবাই দেখছে, বেকভ কেমন করে গাড়ী থেকে নামছে, সদ্যরং করা বেড়ার কাছে তারা আরো পিছিয়ে গেল ঘেঁষাঘেঁষি করে, বেকভকে এগিয়ে যাবার পথ করে দেবার জন্য।

নুরভ চীৎকার করে বলল, 'দেখ সবাই, কে এসেছে!'

লোকেদের মধ্যে যারা সব থেকে সাহসী তারা কাছে এগিয়ে এসে বুকের ওপর হাত রেখে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল বেকভকে আর তাদের সভাপতিকে।

'কেবল দেখ তোমরা!' উচ্ছল আনন্দে বলতে লাগল নুরভ।

গম্ভীর হয়ে গেল কম্যাণ্ডার, তাদের দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি লাগল তার। স্থির করল যে সে এমন ভাব দেখাবে যে এসবকিছুই তার গায়ে লাগে না। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে লাগল অফিসের সামনের চত্বরটা, গাড়ী, ঠেলাগাড়ীগুলো যৌথখামারের চাষীরা যে গাধাগুলোকে তাড়িয়ে এনেছে সেগুলো।

'লোকেদের দিকে মুখ ফেরাও। ওরা তোমাকে অভিবাদন জানাতে চাচ্ছে।' বেকভের হাতে টান দিল নুরভ।

'এসবের কি প্রয়োজন?' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল বেকভ।

নুরভের ভাল লাগছিল যে লোকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, গ্রামের শান্ত জীবন আজ নষ্ট হয়ে গেছে। চাষীদের উদ্দেশ্য করে সে জিজ্ঞাসা করল:

'কে চিনতে পারে একে?'

নিরুৎসাহে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে নুরভ ভীড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক বুড়োর কাপড়ের কোমরবন্ধ ধরে টেনে নিয়ে এসে হুকুম দিল:

'দেখ, মনে কর!'

'কমরেড কম্যাণ্ডার।' বলে হঠাৎ চীৎকার করে উঠে বুড়ো কম্যাণ্ডারের হাতটা ধরে নীচু হল সেটাতে চুম্বন করার জন্য।

'সালাম, বোবো-নাজার,' বলল বেকভ, হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে।

'হ্যাঁ, আমি,' আতঙ্কিতভাবে পিছিয়ে গেল বুড়ো, তারপর টেনে টেনে প্রচণ্ড কাশতে আরম্ভ করল আর জামার হাতায় মুখ মুছতে লাগল, ক্ষয়কাশে ভুগছে সে, রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে গলা দিয়ে।

'তোমার মনে আছে ইসখাক, সেই খুনী বাসমাচটাকে?' বুড়োর কাশি থামানোর জন্য তার পিঠে চাপড় দিতে দিতে বলল নুরভ। 'এখন খামারে জল দেওয়ার কাজ করে, ভাল কর্মী।'

'তার মানে আমাকে আপনার মনে আছে, চাচা?' কেবলমাত্র কথা চালানোর জন্যই জিজ্ঞাসা করল বেকভ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রায়ই ভাবতাম: আপনি এখন কোথায়... ফিরে এলেন দেখছি।'

'ফিরে এলাম,' বলল বেকভ।

তারা তিনজনেই চুপ করে রইল।

'ভালই আছি আমি,' জানাল বোবো-নাজার।

'আমরা সবাই ভাল আছি,' সব চাষীরা বেকভকে জানাল কোমলস্বরে।

তাদের ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল কোন প্রকারে অতিথিকে খুশী করার, কিন্তু অতিথি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তা বুঝতে পারছিল না। সে কেবল মাথা নাড়ছিল আর অপেক্ষা করছিল কতক্ষণে চলে যাবে এদের কাছ থেকে।

তারপর তারা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন খেত ঘুরে দেখল, আঙ্গুরখেতে বেড়াল।

নুরভ আঙ্গুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে কম্যাণ্ডারকে দিচ্ছিল।

বেকভ নীচু স্বরে তাকে বলছিল এতগুলি বছর ধরে সে কোথায় কোথায় গিয়েছে, কি কাজ করেছে।

'এমনকি সাইবেরিয়ায় কাজ করেছি।' মনে পড়ল বেকভের। 'খনির পার্টি কমিটির নেতা হিসাবে।'

আর নুরভ এত বছর ধরে এই যৌথখামারের অপরিবর্তিত সভাপতি হিসাবে কাজ করে এসেছে। পরিবার আছে তার। আঙ্গুর তোলার কাজে নিযুক্ত তার বৌ আর ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বেকভের।

সেই ছোট্ট, সামান্য যৌথখামার আজ কেমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে কি চমৎকার দক্ষ হাতে এখানকার উদ্যোগ চলছে দেখে বেকভ বারবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল, গার্শ্ দিবান তৈরীর কাজে এমন একজন সহায়ক পাবার জন্য খুবই আনন্দিত হল সে।

'কেমন করে তুমি এসব করলে ?' অন্তরের অন্তঃস্থলে একটুখানি ঈর্ষা হল তার নুরভের প্রতি।

নুরভ বুঝল যে এ প্রশ্ন করা হয়েছে কেবলমাত্র কৌতূহলবশতঃ নয়, আঙুরখেতে ঘুরতে ঘুরতে সে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল কি উত্তর দেবে। কিন্তু মায়া হল তার কম্যাণ্ডারের জন্য ভাবল ঠাট্টা দিয়ে চাপা দেবে কথাটা, পরে কোন এক সুবিধেজনক সময়ের জন্য তা তোলা থাক্; দুপুরের খাবার সময়ে সে বেকভকে নিয়ে গেল অতিথিশালায়।

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন বহুদিন সূর্য দেখ নি।' মাঠে, আঙুরখেতে হেঁটে বেড়ানোর ফলে বন্ধুর গালে হালকা লালের ছোপ লেগেছে দেখে নুরভ বলল।

'হাসপাতালে ছিলাম অনেক দিন। তারপর ডাক্তাররা বলল কাজের থেকে অবসর নিতে।'

'কোথায় থাকবে ভাবছ ?'

'গাশ্‌দিবানে, বোধহয়।' ফাঁকি দেওয়া উত্তর দিল বেকভ।

'ছাড় ওসব। থেকে যাও আমার এখানে। তোমার জন্য বাড়ী বানিয়ে দেব। তোমার দেখাশুনা করব আমরা।'

'আমি গাশ্‌দিবান ভালবাসি। সব সময়ই ভেবেছি গাশ্‌দিবানে ফেরার কথা,' সভাপতির সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাইল বেকভ।

'তুমি তো এখন অবসর নিয়েছ...'

'তাতে হয়েছে কি ?! যে শহর আমি নিজে তৈরী করেছি তাতে আমার জন্য কি একটা জায়গা জুটবে না ?'

'তোমার কথার কোন ওজন নেই এখন, পরিস্থিতি শক্তিসামর্থ্য কিছুই নেই,' বলে চলল নুরভ। 'সত্যি কথা বলতে কি, গাশ্‌দিবানে এখন তোমার সামনে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। আর তোমার স্বভাব তো জানি, তুমি আবার অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়িয়ে কাজ খুঁজে বেড়াবে, বন্ধ সাদা দরজাগুলোর ওপর ধাক্কা দিতে থাকবে... ' একমনে বলে যাচ্ছিল নুরভ, তারপর হঠাৎ বুঝল যে এসব বলা বৃথা। 'গরম লাগছে !' জামাটা খুলে তোয়ালে দিয়ে খালি গা রগড়াতে লাগল।

দরজার কাছে গিয়ে চীৎকার করে বলল:

'বোবো-নাজারকে এদিকে আসতে বলো !'

নুরভ জামা ছেড়ে ফেলেছে দেখে বোবো-নাজারও খুলে ফেলল তার আলখাল্লাটা, কালোদেহে বুকের ওপর ঝুলছে একটা মাদুলি।

'আরাম করে বোস বেকভ। এখন বোবো-নাজার আমাদের সেই সব দিনের গল্প বলবে।'

বেকভের দলের সম্বন্ধে যারা জানত তারা সবাই প্রায় মারা গেছে অনেক দিনই, কেবলমাত্র প্রাক্তন বাসমাচ বোবো-নাজারই মনে রেখেছে সবকিছু। নুরভ প্রায়ই তাকে নিজের কাছে ডাকত আর নাজার নীচু স্বরে বলত কেমন করে বাসমাচদের মারা হচ্ছিল, কেমন করে তাদের পাহাড় পেরিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একেবারে আফগানিস্তানের সীমানা পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদের সবাই ধ্বংস হয়।

'কাল যা বলছিলাম সেই কথা?' জিজ্ঞাসা করে বোবো-নাজার মনের মধ্যে চিন্তাধারাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিতে লাগল।

'তুই আমাদের অতিথির সম্বন্ধে বল, কম্যাণ্ডারের সম্বন্ধে।' হুকুম দিল নুরভ।

বেকভ কিছুই বুঝতে পারছিল না কি ঘটছে। এখন সে কেবল গাশ্‌দিবানের কথাই ভাবছে আর অপেক্ষায় আছে সেই মুহূর্তের যখন সে ছাড়া পাবে নুরভের হাত থেকে।

'ঠিক আছে,' বলে আরম্ভ করল বোবো-নাজার। 'আমরা অনেকদিন ভেবেছি, আপনি এখন কোথায় কম্যাণ্ডার বেকভ।' আবেগে তার মুখের পেশীগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। 'এখানে মহামারী দেখা দিয়ে ছিল আর ছিল বাসমাচেরা, তারপর এল সোভিয়েতেরা। ক্ষুধায় আমাদের সবার পেট ফুলে উঠেছে। সেই বছরেই আপনি এলেন সভাপতি নুরভকে নিয়ে, সবকিছু নতুন করে করার জন্য,' সেই সব দিনের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেই বোবো-নাজারের মনে হয় সে তার শ্রোতাদের থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। এই যেমন এখন বেকভ আশ্চর্য হয়ে গেল যে সে একটু থেমে হুকুমের সুরে নুরভকে বলল, 'সভাপতি, চা দাও আমাকে। মাথাটা কেমন করছে...'

কয়েক ঢোঁক চা খেয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল:

'তারপর আমি আপনাকে গুলি করলাম... হাতে লেগেছিল একেবারে।'

কম্যাণ্ডার মলিন হয়ে গেল, টেবিলের ওপরে রাখা হাতটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল, ভয় হল বোবো-নাজার আবার চুমু খেয়ে বসবে।

'কিন্তু আপনি আমায় ক্ষমা করলেন,' নিজের ওপর রাগে আস্তে করে বলল নাজার।

'কিন্তু তুমি ওকে ক্ষমা করেছিলে কেন?' উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল নুরভ।

'মনে নেই,' এই অপ্রিয় কথাবার্তা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য বলল বেকভ।

নুরভের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল তারপর শান্তভাবে বসে নাজারকে বলল:

'কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে আজ তোর গল্প। যা এখন!'

'মাফ করবেন।' নাজার ধীরেসুস্থে আলখাল্লাটা তুলে নিয়ে, নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

২

প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট এতক্ষণ ধরে খামারের বাগানে বসে তার বন্ধু মালীর সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল। বাগানের কাজের বিভিন্ন ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তারা কথা বলছিল, বর্ষার সময় কেঁচো দেখা দেয় সে কথা, আপেল গাছে ন্যাসপাতি গাছের কলম করা ইত্যাদি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগামভ আর থাকতে পারল না, বন্ধুকে বলে ফেলল নিজের আনন্দের কথা।

'দেখ, আমি কেমন জোয়ান হয়ে গেছি আবার। আর এর কারণ হল আমার প্রিয় কম্যাণ্ডার আবার ফিরে এসেছেন।'

বলেই বুকটা তার ব্যথায় টনটন করে উঠল। মনে পড়ল দিনের শেষে কম্যাণ্ডার গাশ্‌দিবানে ফিরে যাবেন আর তখনই আরম্ভ হবে সব থেকে বিশ্রী ঘটনাগুলো।

কয়েকটা আপেল ছিঁড়ে পকেটে ভরে নিয়ে এগামভ বিদায় নিল, পথে একটা গাড়ীতে চড়ে গাশ্‌দিবান ফিরে গেল।

স্মারকস্তম্ভের চত্বরে আবার বুড়ীরা বসে আছে ন্যাকড়ার ওপর মুলো টমেটো সাজিয়ে কিন্তু এগামভ এমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল যে তাদের বকাবকি করল না।

'কম্যাণ্ডার আছে কি নেই তাতে গাশ্‌দিবানের এই লোকগুলির কিছুই যায় আসে না। সকালে এই বুড়ীরাই এখানে কম্যাণ্ডারকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, ফুল রেখেছে স্মারকস্তম্ভের পাদদেশে, আর দুপুর বেলায় তারা আবার সেখানেই পসরা সাজিয়ে বসেছে। এদের কাছে পবিত্রতা বলে কোন কিছু নেই!' দ্বিধাগ্রস্তভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবতে লাগল এগামভ।

সে ভাবছিল প্রথমে কোনটা করবে: কারখানায় তুরসুনভের কাছে যাবে না স্মারকস্তম্ভ আর চত্বরটার দেখাশোনা করে যে লোকগুলো কাজে অবহেলা করার জন্য ভাল করে বকে দেবে তাদের।

তাদের কাছে গাশ্‌দিবান, তার রাস্তাঘাট, চত্বর কোন কিছুরই কোন পবিত্রতা নেই, এখানে যে প্রতি কণা মাটিতে মিশে আছে এগামভ আর তার বন্ধুদের রক্ত তা তারা ভুলে গেছে...

একটা চওড়া রাস্তা জনবসতিটাকে গাশ্‌ ও দিবান এই দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। দু'পা এগোলেই দেখতে পাওয়া যাবে অন্ধকার গলিঘুঁজি। সেখানে এমনকি এখানকার পুরনো বাসিন্দাদের পক্ষেও পথ হারান খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

নীচু নীচু মাটির বাড়ীগুলি একটার ওপর আর একটা এমনি ভাবে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে, বাড়ীগুলোর ছাত পর্যন্ত সেঁতসেঁতে। মাটির তলা দিয়ে যে নুন মেশানো জল চোঁয়াচ্ছে তা গাশ্‌দিবানকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

উঁচু পাঁচিলঘেরা বাগানগুলিতে প্রয়োজনীয় তেমন কিছুই জন্মায় না কারণ সবর্ত্রই এই নুন।

মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে এগামভ এগিয়ে চলছিল রাস্তা দিয়ে।

সে জানে যে কম্যাণ্ডারের হয়ত ভাল লাগবে না এই পাঁচিল-দেওয়া ব্যাপারটা। এমনকি যখন গাশ্‌দিবানের ভিত্তিস্থাপন হচ্ছিল সবেমাত্র তখন থেকেই লোকের এই 'আমার-আমার' করা স্বভাব — উঁচু উঁচু পাঁচিলের আড়ালে বাড়ী লুকিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল, আর বাড়ীর জানলাগুলোকে রাস্তার দিকে না রেখে তারা বানিয়েছিলো নিজেদেরই ঘুপচি উঠোনের দিকে মুখ করে।

অনেক লড়াই করেছে কম্যাণ্ডার এই বিশ্রী স্বভাবের সঙ্গে আর যাবার সময় বলে গিয়েছিল:

'বাড়ীগুলি এমনভাবে তৈরী করবে যেন সেগুলি মিলে হয় একটা বড় বাড়ী, পাঁচিল দিয়ে নিজের বাড়ী অপরের বাড়ী থেকে আলাদা কোরো না, ভাই-ভাই হয়ে থেকো।'

কিন্তু যখন বছর দুয়েক বাদে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই নতুন জনবসতিতে এসে উপস্থিত হল অসংখ্য 'পরদেশী' আর যখন তারা এখানের আদি বাসিন্দাদের অর্থাৎ বেকভের দলের সৈন্যদের দাবিয়ে দিতে লাগল তখন সবকিছুই আবার আগের মতই আরম্ভ হল।

আর পাঁচিলের ওপরে ঐ কাঁচের টুকরোগুলো — সেগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিল এগামভ। ভাঙা কাঁচের টুকরো পাঁচিলের ওপর এমনভাবে লাগান আছে যে যদি কেউ চুরি করার চেষ্টা করে (কে জানে কি — টমেটো না মুলো ! এছাড়া গার্শদিবানের লোকেদের আর আছেটাই বা কি ?) তো হাত কেটে বসবে।

মাথা খাটিয়ে করা, বলার কিছু নেই !

যাচ্ছে এগামভ, তার পায়ের আওয়াজ শুনছে সারা গার্শদিবান, গলিগুলির মাটি অনবরত লোক চলাচলের ফলে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

এগামভের পায়ের আওয়াজ শুনে যেই বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোল, প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট তাকেই আদেশ দিল:

'পাঁচিলের ওপর থেকে কাঁচের টুকরোগুলো খুলে নাও ! কম্যাণ্ডার কি ভাববেন আমাদের সম্বন্ধে ?'

কিন্তু গার্শদিবানের লোকেরা কাঁধ ঝাঁকাল কেবল, কি অদ্ভুত বুড়ো রে বাবা !

এগামভ কোন কোন বাড়ীর ফটকে ধাক্কা দিল:

'তোমার বাড়ীর কাছটা ঝাঁট দিয়ে দাও এখুনি ! একটু পরেই কম্যাণ্ডার যাবেন এখান দিয়ে !'

দু'-তিনজনকে হুমকি দিল:

'যদি কাঁচের টুকরো উঠিয়ে না ফেল তো গার্শদিবান থেকে বার করে দেব !'

তারপর এগামভ যেখানে রুটি তৈরী হয় সেখানে গিয়ে জানলা দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল কেমন করে তার ছেলে মারুফ কাজ করছে।

জলের বালতিতে বাবার ছায়া দেখতে পেয়ে মারুফ আরো মন দিয়ে কাঠের চামচটা দিয়ে বড় ডেকচিতে ময়দা মিশাতে লাগল।

'বাবার শরীর ভাল না,' ছেলের মনে হল, 'এই চিন্তাভাবনায় বুড়ো বিছানা না নিলে বাঁচি। ঠাট্টা নাকি — কম্যাণ্ডার ফিরে এসেছেন...'

এগামভ দেখল, রুটি কারখানার প্রধান কর্মচারী বুড়ো নিশান এক কোণে ভেড়ার চামড়ার উপর বসে চা খেতে খেতে মাঝে মধ্যে নির্দেশ দিচ্ছে মারুফকে।

তার অন্য ছাত্র আদখাম গরম চুলার মধ্যে মাথা গলিয়ে বড় হুকের মত বাঁধান ডাণ্ডা দিয়ে রুটি বার করে করে আনছে।

চারবছর হল মারুফ ময়দা মাখছে, ঈশ্বরই জানেন কবে ও প্রধান কর্মচারী হতে পারবে। নিশান কাজ থেকে অবসর নেওয়ার কথা মোটেই ভাবছে না, লাভজনক কাজ, রুটি সবাইয়েরই লাগে।

কিন্তু নিশান মারা গেলে প্রধান রুটি প্রস্তুত কারকের পদটা যাতে আদ্খাম না পেয়ে, তার ছেলে মারুফ পায় তার জন্য সে সব চেষ্টা করবে। আদ্খামের বাবা চাখানার মালিক, পরিবারকে খাওয়াতে পারে, আর মারুফ যদি রুটির কারখানার কাজটা হারায় তো ও ঠিক চলে যাবে বুখারায়।

'যদি আমাদের ছেলেরা গাশ্দিবান ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমাদের পরে গাশ্দিবানে জীবনধারা চালিয়ে নিয়ে যাবে কে?' প্রায়ই ভাবে প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট।

'মারুফ।' আস্তে করে সে ছেলেকে ডাকল।

আলখাল্লায় হাতটা মুছতে মুছতে আর উদ্বিগ্নভাবে কাঁধটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বেরিয়ে এল মারুফ, বুঝতে পারছে কিছু একটা ঘটেছে।

তার সহজ প্রবৃত্তি তাকে কখনও মিথ্যা বলে নি — এগামভ এক চড় কষিয়ে দিল ছেলের গালে।

মারুফ মাটিতে পড়ে গেল আর আলখাল্লার নীচে মাথা লুকিয়ে পড়েই রইল।

'ভয় পেয়েছিস, বদমাশ কোথাকার!'

বাবার রাগ পড়ে গেছে বুঝে মারুফ উঠে বাবার দিকে তাকাল নিরীহ দৃষ্টিতে, এতে এগামভ আরো নিরস্ত্র হয়ে পড়ল।

'বাবা, রুটি পুড়ে যাবে...'

'দাঁড়া, তুই আজ স্মারকস্তম্ভের কাছে আসিস নি কেন?'

মারুফ চুপ করে রইল।

'কি করে আমি এখন কম্যাণ্ডারের কাছে মুখ দেখাব? মরুভূমিতে মরার সময় আমরা এমন সব সন্তানের স্বপ্নই কি দেখেছিলাম?'

'মাফ কর,' বলল ছেলে।

এত সহজে, মাত্র একটা চড় খেয়েই যে ব্যাপারটা শেষ হল তাতেই খুশী মারুফ। সে জানে বাবা কম্যাণ্ডারকে কতটা ভালবাসে, প্রতিদিন কম্যাণ্ডারের কথা মনে করে, মারুফ ভেবেছিল বাবা রাগে পাগল হয়ে যাবে।

সাতসকালে ছেলের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল কম্যাণ্ডারকে অভ্যর্থনা জানানর জন্য যেতে।

কিন্তু মারুফ বাবাকে খুবই ভালবাসে তাই স্মারকস্তম্ভের কাছে যা ঘটবে সেদিকে অবিচলিত চোখে চেয়ে থাকা তার পক্ষে কষ্ট কর। তাই সে পালিয়ে গিয়ে গাশ্‌দিবানের অন্ধকার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে, বাবার জন্য তার মায়া হয়েছে আর বেকভের আসার ফলে যে আরো কি হবে তাই ভেবেছে।

ছেলে তার বিশবছরবয়সের যুক্তিতে বোঝে সবই।

'ঠিক আছে,' এগামভ ছেলেকে বলল। 'বাড়ীতে কথা হবে, যা। আর সন্ধ্যাবেলায় কম্যাণ্ডারের জন্য টাটকা রুটি নিয়ে আসতে ভুলিস না...'

কারখানার দিকে এগিয়ে গেল এগামভ, এখান থেকেই গাশ্‌দিবানের ইতিহাসের শুরু। যে বেড়াটার সামনে সৈন্যরা দাঁড়াত সার দিয়ে সেটা কবে পচে ভেঙে গেছে। কিন্তু ফটকটা কেমন অদ্ভুতভাবে যেন খুঁটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার ওপরে ঝুলছে ত্রিশ বছর আগে টাঙানো সাইনবোর্ডটা "গাশ্‌দিবানের তূলাশোধন কারখানা"।

আর যদিও ভেতরে ঢোকা যায় সব জায়গা দিয়েই কিন্তু ফটকটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে ফটক হিসাবেই সকাল ঠিক আটটায় সেটা খুলে দেওয়া হয় আর সন্ধ্যাবেলায় কাজ শেষ হবার পর পাহারাদার সেটাকে হুড়কো লাগিয়ে বন্ধ করে কুকুর বেঁধে দেয় সেখানে।

"বেকভ এসেছেন" খবর পাহারাদারকে জানাল এগামভ কিন্তু সে এমন ভাব করল যেন শুনতে পায় নি।

প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট ছুটে উঠোনে ঢুকে চারপাশ তাকাতে লাগল যদি এমন একজনকেও খুঁজে পায় যে তাকে বুঝবে; এমন একজন যার সঙ্গে বসে সে আলোচনা করতে পারে কি করলে কারখানার এই দুরবস্থা কম্যাণ্ডারের কাছে অপ্রত্যাশিত আঘাত হয়ে না দাঁড়ায়।

কিন্তু বিরাট উঠোনটা জনহীন। নিস্তব্ধ সবকিছু, কোন শপেই কাজ হচ্ছে না। কম্যাণ্ডার চলে যাবার পর কারখানার মেরামতের কাজ আর এগোয় নি, এখন তার একেবারেই শেষ অবস্থা। যন্ত্রপাতিগুলোতে মরচে পড়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই চাকাগুলো আর মোটেই ঘুরবে না।

এগামভ চত্বরে জঞ্জালের গাদার কাছে দাঁড়িয়েই রইল যতক্ষণে না দু'জন শ্রমিক ভাঙা লোহার টুকরোটাকরা নিয়ে শপ থেকে বেরিয়ে এল।

আর একটা যন্ত্র বোধহয় টুকরোটুকরো হয়ে গেছে আর এখন সেই অবশেষগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে কারখানার উঠোনে যন্ত্রগুলোর কবরখানায়।

ঐ কবরেই পড়ে আছে ভোঁতা দাঁতওয়ালা একটা বিশাল চাকা যেন কোন জন্তুর চোয়াল, একটা বিদেশী যন্ত্রের অবশেষ, যেটাকে সে আর কম্যাণ্ডার বুখারা থেকে নিয়ে এসেছিল।

আরো অনেক বিভিন্ন ধরণের টুকিটাকি — যা কিছু তিরিশ বছর আগে ছিল যন্ত্র, লেদমেশিন, যেগুলো এমনভাবে তৈরী হয়েছিল যাতে মানুষের কাজে সাহায্য করতে পারে, যা দেখে এগামভের আনন্দ হত।

শ্রমিকদের মধ্যে কে যেন এগামভকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বলল:

'শুনলাম, বেকভ এসেছে...'

'ও এখানে আর নাক গলাবে বলে মনে হয় না,' বলল অন্য জন যাতে এগামভের প্রচণ্ড রাগ হল। এগামভ তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে চাইল যে কম্যাণ্ডারের সম্বন্ধে এমন ধরণের কথা বলা উচিত নয় তার। কারণ এই সব বিশৃঙ্খলার পিছনে কম্যাণ্ডারের কোন দোষ নেই, কম্যাণ্ডার কেবল সবার মঙ্গলই চেয়েছেন, এগামভ তার সাক্ষী।

আর একজন বালতিতে করে জঞ্জাল নিয়ে ফেলতে এল।

'বেকভকে দেখেছিস নাকি ?' শ্রমিকরা তাকে জিজ্ঞাসা করল।

'না, বেকভ আবার কে ?'

এগামভের ইচ্ছে হল কম্যাণ্ডারের ওপর ক্ষুব্ধ এই লোকগুলির বিবেক জাগিয়ে তুলতে, কারণ এরা সবাই তো বেকভের দলের লোকেদেরই ছেলেরা।

এদের জন্মদাতারাই তিরিশ বছর আগে এই কারখানাটা তৈরী করেছে, মেশিনের কাছে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে তারপর নিজেদের কাজ ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছে যাতে তারা কম্যাণ্ডারকে মনে রাখে, সম্মান করে।

'এই, বেকভকে দেখেছ নাকি ?' উঠোনের বিভিন্ন কোণ থেকে চীৎকার শোনা যেতে লাগল।

যখন এগামভ হঠাৎ কম্যাণ্ডারকে দেখতে পেল, সে যে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলল না কেন তা বুঝল না।

অফিসঘরের দরজাটা খুলে গেল আর বেকভ বেরিয়ে এল লোকেদের মুখে নিজের নাম শুনে।

'আমি বেকভ,' যারা তাকে খুঁজছিল, তাদের বলল সে।

কিন্তু শ্রমিকরা ইতিমধ্যে বাড়ী যেতে আরম্ভ করেছে, কম্যাণ্ডারের কথা কেউ শুনতে পেল না দেখে এগামভ স্বস্তি পেল।

কম্যাণ্ডার তাদের পেছন পেছন ফটকের দিকে যাবার উদ্যোগ করল কিন্তু কেন কি জানি থেমে গেল।

জঞ্জালের স্তুপের কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেকভ আবার অফিসঘরে ঢুকে গেল।

এগামভ ভাবল তার প্রিয় কম্যাণ্ডারের এমন কষ্ট দেখে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বেকভের পাণ্ডুর মুখ আরো অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তার কারণ চশমাটা ভেঙে গেছে তার, কিন্তু এগামভ তা জানত না।

প্রাক্তন এডজুট্যাণ্টের পা দুর্বল হয়ে গেল, একটা লোহার পাটার ওপর বসে পড়ল সে, উঠে গিয়ে যে কম্যাণ্ডারকে একটু সান্ত্বনা দেবে সে ক্ষমতাও আর রইল না।

কিন্তু কি করেই বা তাকে সব বুঝিয়ে বলা যাবে? হয়ত সে জানত, অনেকদিনই জানত যে সে চলে যাবার ঠিক দু'বছর পরে বুখারা থেকে নির্দেশ আসে যে গাশ্‌দিবানে কারখানা তৈরী যেন স্থগিত রাখা হয়।

নির্দেশে বলা হয়েছিল যে নদীটার ব্যাপারে ভুল করা হয়েছে। একই সঙ্গে শহর ও কারখানা ও নুরভের যৌথখামারকে জল যোগাবার পক্ষে নদীটা খুবই দুর্বল।

যেহেতু যৌথখামার ইতিমধ্যেই রূপ নিয়েছিল আর তার জমিতে তুলোর চাষ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ওদিকে গাশ্‌দিবান আর কারখানা সবেমাত্র তৈরী হচ্ছিল, তাই নির্দেশ আসে নদী যেন খামারের কাজে লাগান হয় যাতে যৌথখামার পড়ে থাকা জমিগুলো নিয়ে আরো বড় হয়ে উঠতে পারে।

গাশ্‌দিবানের কারখানার মাটির তৈরী শপের বদলে তুলো নিয়ে যাবার আদেশ দেওয়া হল বড় শহর বুখারাতে যেখানে বহুদিন আগেই পিটার্সবুর্গের বিশেষজ্ঞরা তৈরী করে দিয়েছে কারখানা।

সেই নির্দেশে সবকিছুই বলা ছিল শিল্প, নদী, যৌথখামার কিন্তু গাশ্‌দিবানের লোকেদের সম্বন্ধে একটি কথাও ছিল না, যাদের সংখ্যা বেকভের দলের লোকেদের নিয়ে সব মিলিয়ে ইতিমধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে তিনশ'রও বেশী।

তাদের মধ্যে চল্লিশ জন নিযুক্ত ছিল ঐ কারখানাটায় — কেন কে জানে সেটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল না — আর বাকীরা কোন আদেশ না পেয়ে যে যার ইচ্ছামত স্বাধীন ব্যবসাপত্র আরম্ভ করল, বিশেষ করে বাগানের তরিতরকারী বিক্রীর ব্যবসা।

এগামভ যখন জানল এই নির্দেশের কথা একরাতে তার মাথার চুল

সাদা হয়ে গেল। সে বেকভকে লিখেছিল যেন তিনি এসে তাঁর তরবারি দিয়ে এই মিথ্যা ভেঙে দেন। তার মনে হয়েছিল যে কম্যাণ্ডারের ভুল হতে পারে না। এসব বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত।

এগামভ এমন কি সেই সময়ে জল একেবারে কমে আসা নদীতে নৌকা ভাসিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল অন্য দেশের সেই সব লোকেদের যারা বাঁধ দিয়ে জল আটকেছে যাতে সবে গড়ে উঠতে থাকা গাশ্‌দিবান জল না পায়।

কিন্তু জল আসা আটকাবার জন্য কোনরকম বাঁধ বা কোন সন্দেহজনক লোক দেখতে না পেয়ে সে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল — নদীর জল বড় বেশী কাজে লাগানোর ফলে আর জল সঞ্চিত হতে পারছে না তার বুকে, তাই গাশ্‌দিবান আর যৌথখামার এই দুয়েরই প্রয়োজনমত জলের যোগান সম্ভব নয়।

'আর এখন কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়ে বলব: মন খারাপ করবেন না। আমি সুখী যে আপনার দেখা পেয়েছি কম্যাণ্ডার...' ভাবল এগামভ।

কারখানার অফিসঘরের দিকে এগিয়ে চলল এগামভ, নিজের পায়ের আওয়াজে নিজেই চমকে চমকে উঠল, টোকা দিল অফিসঘরের দরজায়।

কোন উত্তর দিল না বেকভ।

'কম্যাণ্ডার,' দরজা খুলবে কি খুলবে না ভেবে এগামভ ডাক দিল। 'বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। কড়া করে চা তৈরী করব 'খন তাতেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। আর আমার ছেলে মারুফও নিশ্চয়ই গরম রুটি নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

আরও কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কারখানা থেকে সাহায্যের জন্য লোক ডাকতে।

শোকে অভিভূত বৃদ্ধ কম্যাণ্ডার অফিসঘরে পাতা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির কথা ভাবছে। নুরভ আকার-ইঙ্গিতে তাকে বারবার বলেছে গাশ্‌দিবানে কি দৃশ্য তার জন্য অপেক্ষা করছে, সেই থেকেই সন্দেহ তার মন কুরে কুরে খাচ্ছিল।

সেই সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্য তার সম্মানে নুরভ যে দুপুরের খাবার আয়োজন করেছিল তা স্থগিত রেগে যৌথখামার থেকে সবার অলক্ষ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে তার যৌবনে ছেড়ে যাওয়া এই শহরে।

যা কিছু আজ বেকভ দেখেছে সেসব যে বেকভের কাছে একেবারে

অপ্রত্যাশিত ছিল তা' নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তার জ্ঞানও বাড়তে লাগল বেকভ বুঝতে আরম্ভ করল যে এখন পর্যন্ত যা কেউ জানে না তেমন নতুন জীবন গড়ে তোলা পুরনো জীবনকে ধ্বংস করে ফেলার চাইতে অনেক কঠিন। যে তরোয়ালটার এক আঘাতে শত্রুর বিনাশ করা যায়, সেই তরোয়ালটাকে সরিয়ে রেখে গাঁতি হাতে তুলে নিয়ে এক ঝলকেই একটা শহর তৈরী করে ফেলে, মানুষজনকে সেখানে এনে ফেলা সম্ভব নয়।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় সে কাজ করেছে, দেখেছে, সাফল্য পেয়েছে কেবল সেই সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোকেরাই যাদের শহর ও কারখানা স্থাপিত হয়েছে কোন রকম তাড়াহুড়ো ছাড়াই, বুদ্ধি ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে, প্রকৃতি ও তখনও বেকভের অজানা পরিস্থিতির অনুধাবন করে।

মৃতপ্রায় কারখানার অফিসঘরে শোকাভিভূত হয়ে একাকী বসে থেকে হঠাৎ বেকভের মনে পড়ল তার বহুদিনের পুরানো এক বন্ধুকে, আঞ্চলিক পার্টি কমিটির বর্তমান সেক্রেটারী মার্ভালিয়ানভকে যে গাশ্‌দিবানের সমস্যা অন্য যে কারুর থেকেই বেশী ভাল করে জানত।

বেকভ স্থির করল অবিলম্বে বুখারায় তার কাছে যাওয়া দরকার, কারণ সে এখানে থাকবে বলে যাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই সব লোকেরা তার অপেক্ষায় আছে।

যেই সূর্য অস্ত যায়, গাশ্‌দিবানের রাস্তাঘাটও ফাঁকা হয়ে যায়। চুলকাটার সেলুন, রুটির দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। জীবনের স্পন্দন রাস্তা থেকে এসে প্রবেশ করে বাড়ীগুলির উঠোনে, চুলা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়, গাশ্‌দিবানের লোকেরা সাদামাটা রাতের খাবার তৈরী করে, খাওয়ার পালা চুকলে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমোতে যায় তারা যাতে সারাদিনের গরমের পর রাতের বেলায় একটু ঠাণ্ডা হতে পারে।

ভগবানের দয়ায় একটা দিন কাটল। আর কিছু চাওয়ার নেই তাদের: না কোন জাদু, না বন্যা।

আর যাদের অনিদ্রারোগ আছে কেবল তারাই অনেক রাত পর্যন্ত চাখানাতে বসে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদে আর টর্চের আলো ফেলে পাখীগুলোকে জ্বালায়।

এগামভও এখন ঐ চাখানায় গেল। সবে চা তৈরী হয়েছে — বুড়োরা হাতে খালি পেয়ালা নিয়ে আরাম করে বেঞ্চিতে বসে আছে।

'গাশ্‌দিবানবাসীরা!' কোন রকম ভূমিকা না করেই আরম্ভ করল

এগামভ, কারণ দেরী করার মত সময় নেই। 'আজ কম্যাণ্ডার বেকভকে তোমরা এমন আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছ। আতিথেয়তার আইন কিন্তু অতিথিকে একা বসিয়ে রাখার বিপক্ষে।'

এই প্রথম এগামভ তাদের সঙ্গে কথা বলল এমন নরম সুরে, তাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। এরা অন্য জগতের লোক, আগন্তুক, এখান থেকে চলে যাওয়া আদিবাসিন্দা বেকভের সৈন্যদের মত সৎ, নিঃস্বার্থ নয়। সেইজন্য এগামভ তাদের এড়িয়ে চলত।

'সে তো আপনার অতিথি,' তারা প্রতিবাদ জানাল। 'আপনি তো নিজেই বলেছেন বেকভের সামনে না যেতে।'

'আমি বলেছি ছোটখাট ব্যাপারে তাঁকে বিরক্ত না করতে। কম্যাণ্ডার এই গাশ্‌দিবানকে এমন করে তুলতে পারেন যা দেখে বুখারারও হিংসা হবে। তোমরা তো তা চাও, নাকি?'

'হ্যাঁ, কুলিখানচাচা, আমরা চাই যে আমাদের শহর দাঁড়াক নিজের পায়ে, বেচাকেনা করার জন্য বুখারা যাবার কোন মানে হয় না। যত ছোটই হোক না কেন, নিজের শহর তো।'

কি জন্যে ওদের নিজের শহর দরকার তা ভালই জানে এগামভ — ছোটখাট ব্যবসা চালাবার জন্য, সে আর কম্যাণ্ডার যে শহরের স্বপ্ন দেখেছে তেমন শহরে তাদের প্রয়োজন নেই...

একজন বুড়ো বিষণ্ণভাবে বলল:

'চৌত্রিশ সালে যখন শুনলাম যে এখানে শহর তৈরী হবে তখন এখানে চলে আসি। আর চলে আসি বুখারাতে গিয়ে মুলো বিক্রী করার জন্য নয়। জুতোতৈরীর কাজ আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এই নদীটার জন্য সব চুলোয় গেল।'

এগামভ তাকে আশ্বস্ত করল, 'ব্যাস, এবার কাজ আরম্ভ হবে। এখানে সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্যই কম্যাণ্ডার এসেছেন।'

এগামভের কথায় বিশ্বাস করে বুড়োরা চাখানা থেকে বেরিয়ে এল। এগামভ তাদের নিয়ে চলল কারখানায়, যেখানে বেকভ বসে আছে বলে তার মনে হয়েছিল।

এগামভ শপের পর শপ পেরিয়ে চলল, আলো জ্বালতে জ্বালতে আর তার পেছনে বুড়োরা চলতে চলতে ছুঁয়ে দেখতে লাগল লেদমেশিনগুলো, ফিতে ধরে টানল, যন্ত্রপাতিগুলো দেখে বিস্মিত হয়ে জিভে চুকচুক করতে

লাগল, বহুদিন রং না করা হলুদ হয়ে যাওয়া দেয়াল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, জঞ্জালের স্তূপ ডিঙিয়ে, তেলকালি জুতো দিয়ে মাড়িয়ে গজগজ করতে করতে এগিয়ে চলল তারা।

একটার পর একটা শপ দেখে চলল তারা। এগামভ লক্ষ্য করল যে সে অবসর নেওয়ার পর যন্ত্রপাতিগুলো আরও পুরনো হয়ে গেছে, অবস্থা তাদের চরমে উঠেছে, দেয়াল আর ছাদের চুণবালি খসে পড়ছে। সবকিছুর শেষ অবস্থা আসন্ন, কিন্তু সেই শেষ অবস্থা নিয়ে আসছে আরও অনেক ঝামেলা।

তারপর সবাই চত্বরে বেরিয়ে এলো। কুকুর নিয়ে চৌকিদার এসে তাদের হুমকি দিতে লাগল, কিন্তু সবাই মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় দলে ফেলল তাকে।

তারপর কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে তারা বলাবলি করতে লাগল:

'চলে গেছে! বেকভের ভাল লাগে নি এখানে!'

'এমন লোকেদের পক্ষে বুখারায় থাকাই সহজ।'

'আর কুলিখান আমাদের ঠকিয়েছে,' বলল ভীড়ের লোকেরা।

ঐ লোকগুলো তাকেও মারধর করতে পারে এই ভয়ে এগামভ কয়েক লাফেই সবার আগে নিজের বাড়ীর কাছে গিয়ে পেঁাছল।

হাতে আলো ধরে মারুফ বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

খুশী হল এগামভ আর লোকেদের রাগও একটু পড়ে গেল।

'অতিথি আপ্যায়ন কর,' ছেলেকে বলল সে, 'ভেতরে চল ভায়েরা সব।'

মারুফ কতকগুলি চাটাই এনে বিছিয়ে দিল, বুড়োরা আরাম করে বসল উঠোনে।

এগামভ আলোটা ঝুলিয়ে দিল তুঁতগাছে, তাতেই চারদিক বেশ আলো হয়ে গেল।

অক্লান্ত মারুফ ইতিমধ্যেই চাল থেকে খরমুজের বস্তা নামাতে আরম্ভ করেছে।

বুড়োরা তাড়াতাড়ি বস্তার মুখ খুলে খরমুজ বার করে তুঁত গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে খেতে লাগল।

এগামভ আর তার ছেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে জানলার কাছে গিয়ে বসল।

'কিছু হয়েছে নাকি বাবা?' সতর্কভাবে প্রশ্ন করল মারুফ।

'কম্যাণ্ডার চলে গেছেন।'

'কোথায়?'

'জানি না। একেবারে চলে যেতে পারেন না তো? নাকি পারেন?' কাঁধ ঝাঁকাল মারুফ।

'জ্বালা ধরে গেছে জীবনে।' ফিসফিস করে বলল প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট।

বুঝতে পারে না মারুফ, কেমন করে বাবাকে সান্ত্বনা দেবে। সে জানে যাকিছু বাবার জীবনের অতীত দিনগুলি বা কম্যাণ্ডারের সঙ্গে জড়িত, সে সবই এত জটিল যে তার মত বিশ বছর বয়সী যুবকের পক্ষে কোন কিছু বলা খুবই দুরূহ।

তার চেতনায় বাবার প্রতিমূর্তি সর্বদা সংযুক্ত অসংখ্য কাগজ আর দলিলের সঙ্গে যেগুলো রাখা আছে চিলেকোঠায় একটা কাঠের বাক্সে।

ন্যাড়াগাছগুলির ওপর বৃষ্টি বা বরফ পড়া সন্ধ্যাগুলিতে যখন চারদেয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে থাকতে হত, তখন এগামভ ছেলেকে বলত সেই বাক্সটা নিয়ে আসতে।

বাবা অনেকক্ষণ ধরে বিষণ্ণ চোখ বোলাত সেই কাগজগুলির উপর, যেগুলিতে লেখা আছে বাসমাচদের সঙ্গে লড়াইয়ে তার কৃতিত্বের কথা।

কাগজগুলি দেখতে দেখতে সে মাথা নাড়াত, জিভে চুকচুক আওয়াজ করত। তারপর ছেলেকে বলত একটা পরিষ্কার কাগজ নিয়ে টেবিলে বসে মন্ত্রীকে সবকিছু লিখতে যাতে বিশেষ পেন্সন পাওয়া যায়।

প্রাক্তন এডজুট্যাণ্টের বলে যাওয়া সরল ভাষা লিখে পাতাগুলি ভরিয়ে ফেলত ছেলে। বুড়ো কড়া লক্ষ্য রাখত যেন সে যা যা বলছে ঠিক তেমনি লেখা হয়, তাতে যেন জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছেলেটা নিজে থেকে কোন কথা না জুড়ে দেয়।

এই মানসিক পরিশ্রমে কষ্ট হত ছেলের, বিরক্ত হত সে, কারণ বাবার মনের ভেতর কি ঘটছে তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না তার।

মন্ত্রীর চিঠিতে একেবারে শেষে আরও লিখতে বলত:

'এই সব লিখিত তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন একমাত্র কমরেড বেকভ, যাহার অনুসন্ধান করা আপনার পক্ষে সহজ হইবে। যেহেতু কম্যাণ্ডার বেকভ এখন আপনার মত সরকারী উঁচু মহলে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছেন, আর সরকারী ব্যক্তিরা সবাই পরস্পরের পরিচিত, পরস্পরকে খুঁজে পাওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ।'

কি লিখেছে ছেলে তা আর একবার শুনে নিয়ে এগামভ সেই চিঠিটা নিজে হাতে করে দিয়ে এসেছে গাশ্দিবান ডাকঘরের বড়কর্তার হাতে আর

তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে যে মন্ত্রীকে এই চিঠি লেখালেখির ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না সে।

মন্ত্রী প্রতিবারই ধৈর্যের সঙ্গে এগামভকে বুঝিয়ে বলেছেন যে তার অবদান যথেষ্ট, কিন্তু এত বড় নয় যে বিশেষ পেন্সন দেওয়া যায়, আর কমরেড বেকভের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নেই।

'ছোকরা মন্ত্রী তো, তাই কিছুই বোঝে নি,' গজগজ করত এগামভ। আবার ঠিক চারমাস বাদে আরও একটা চিঠি লেখে এই আশায় যে আগের সেই মন্ত্রীকে হয়ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই তো সেদিন বেকভের আসার আগেই এগামভ রাজধানীকে উদ্দেশ করে আর একটা চিঠি লিখতে বাধ্য করেছে ছেলেকে; এবারেও বরাবরের মত বাবাছেলের ঝগড়া হয়ে গেছে এ নিয়ে।

'নদীর পাড়ে কম্যাণ্ডারকে খুঁজতে যাবি নাকি?'

'যদি বল, যাব...'

'আলোটা নিয়ে যা। বলবি: সবাই আপনার অপেক্ষা করছে। আর কম্যাণ্ডার ফিরে এলেই ওদের তাড়িয়ে দেব, ওই ফাটকাবাজগুলোকে।'

খরমুজ খেয়ে, তার খোলাগুলো বুড়োরা উঠোনময় ছড়িয়ে ফেলল। ঘড়ঘড়ে সর্দিলাগা গলায় কথা বলছিল তারা সবাই — খরমুজগুলো খুব মিষ্টি।

যখন তার বউ মারা যায় বুড়ীরা তার মৃতদেহটাকে অনেকক্ষণ ধরে চান করাচ্ছিল, তখনও বুড়োরা ঠিক এমনিভাবেই উঠোনে বসেছিল।

কেউ কেউ উঠোনে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ল আবার কেউ কেউ অন্ধকারে বাগানের গাছপালাগুলোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগল।

পাইখানার দরজার ঘন ঘন আওয়াজ এগামভের মাথায় বাজতে লাগল ঠকঠক করে।

সবকিছু তার হাতছাড়া হয়ে গেছে একেবারে। বুড়োরা যা খুশী তাই করছে, গাছ থেকে কাঁচা কাঁচা টমেটোগুলো ছিঁড়ে নিচ্ছে মজা করে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলার জন্য।

আধঘণ্টাখানেক বাদে কে যেন এগামভকে ডাকল কথা বলার জন্য।

'বাগানগুলোর ব্যাপারে কম্যাণ্ডার নুরভের সঙ্গে যদি কথা বলেন তো ভাল হয়।'

'ঠিক আছে,' ঘাড় নাড়াল এগামভ।

'নুরভ আমাদের নদীতে একটু জল দিক।' বুড়ো যে চাটাইটার ওপর শুয়েছিল, তার কোণটা তুলে বলল: 'এই, ধর এতটুকু।'

'এটাই এখন বড় কথা নয়,' প্রতিবাদ শোনা গেল। 'গাশ্দিবানে জোয়ান জোয়ান পুরুষমানুষ, তাদের বাসা দিয়ে থাকতে দেওয়া হোক!'

কতকগুলো বুড়ো মজা পেয়ে হিহি করে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

'না, পুরুষমানুষে আর আমাদের দরকার নেই। আকাট কোথাকার! ও বরং আমাদের ছেলেদের মাথার বুদ্ধি দিক যাতে তারা বাড়ী ছেড়ে শহরে চলে না যায়।'

'সবার ছেলে আছে নাকি? হাত তোল।'

তিনটে হাত উঠল। এগামভও একটু ইতস্তত করে হাত তুলল।

'আর মেয়ে?'

'আমাদের আর লজ্জায় ফেলো না! আমার মেয়ে আজীবন কুমারী হয়ে থাকলেও তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে — কিছুতেই না!'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওরাও হাত তুলুক। আমরা যে তুলেছি।'

'কার মেয়ে আছে?'

'আর রেখে ঢেকে কি হবে! কানা, খোঁড়া নয় তো। তুলব হাত, আর তুমি কুলিখান-মিঞা মনে করে নাও যাতে তোমার কর্তার কাছে বলতে পার।'

এবারে দশটারও বেশী হাত উঠল।

'আর তোমরা নিজেরা কখনও চেষ্টা করে দেখেছ এই সব সমস্যার থেকে রেহাই পাওয়া যায় কিনা?' চীৎকার করে উঠল এগামভ।

বলেই বুঝল ভুল হয়েছে। এক ঝাঁক ভোমরার মত বুড়োর দল গোঁ গোঁ করে উঠল।

'দাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়তে হয় ওর। আর কাঁটাগাছ গেলাতে হয়।'

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল এগামভ আর সেখান থেকে লক্ষ্য করতে লাগল বুড়োদের। বুড়োদের মধ্যে জোর চেঁচামেচি চলতে লাগল। তারা দেখাতে লাগল তার বাড়ীর পাঁচিল, বাগান, ছাত, কাঁধ ঝাঁকাল — বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেবার কথা ভাবছে নাকি...

রাত যখন প্রায় গভীর হয়ে এসেছে, নুরভ নিজের গাড়ীতে করে এসে হাজির।

কেমন যেন অদ্ভুত লোকটা: এই গুমোট গরমেও কাঁধে ওভারকোটটা ফেলে ঢুকল এগামভের বাড়ীতে।

তার আর প্রাক্তন এডজুট্যাণ্টের সম্পর্কের মধ্যে কেমন যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল, সেই অল্প বয়স থেকেই, যদিও তারা দু'জনেই পরস্পরের কাছে আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

'এগামভ?' নুরভ ওভারকোটটা তার হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল।

'বলুন।'

'বেকভ ফিরেছে?'

'না, কোথায় তিনি, তাও জানি না। আমার ছেলে আলো নিয়ে খুঁজতে গেছে।

'বোধহয়, বুখারা গেছে। আমি ওকে বললাম, এখন ছুটোছুটি করে আর লাভ নেই!.. তোমার বাড়ীতে এরা সব কারা?'

'এখানকার লোকজন।'

'নিষ্কর্মার দল।'

গাশ্‌দিবানের লোকদের দুচক্ষে দেখতে পারে না সভাপতি। এগামভের মত তারও দুঃখ হত যে এখানকার আদি বসবাসকারী লোকেরা কোথায় যেন চলে গেছে, যারা ছিল তার ডিভিশনের সৈন্য সৎ, বিশ্বাসী যোদ্ধারা।

'মঙ্গল হোক, গাশ্‌দিবানবাসীরা!' উঠোনে ঢুকে সে বুড়োদের শুভেচ্ছা জানাল। 'উঠবেন না। আমি তো বয়সে আপনাদের থেকে ছোট...'

বুড়োরা তাকে ভয় করত, সম্মানও করত; সম্মান করত এইজন্য যে সে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করত, যে বছর খুব ভাল ফল হয়, আঙ্গুরের থোলোর ভার ঝুলতে থাকে আঙ্গুরলতায়, তখন নুরভ তাদের আঙ্গুর তুলতে অনুমতি দেয়, শীতকালে ঘর গরম করার জন্য কাঠ দেয়।

সেই সঙ্গে তাদের সংকীর্ণ জীবনধারার পরিবর্তন করে তাদেরকে কাজে লাগতে শেখাবার চেষ্টাও করত নুরভ; এখন সে ভাবছে গাশ্‌দিবানকে যৌথখামারের সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়, যৌথখামারে কাজে লোকের ঘাটতি আর এখানে এত লোক শুধু শুধু বসে আছে, কাজকর্ম নেই।

এগামভকেও সে অনেকবার বলেছে যৌথখামারে চলে আসার কথা, সেখানে তার আর তার ছেলের দু'জনেরই কাজ জুটবে, কিন্তু এগামভের মনে ধরে না সে প্রস্তাব। কম্যাণ্ডারের অপেক্ষায় আছে সে এই আশায় যে তিনি এসে গেলেই গাশ্‌দিবানে সবকিছু বদলে যাবে। এই শহরটা ছেড়ে চলে যাওয়া মানে কম্যাণ্ডারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কম্যাণ্ডার আদেশ

দিলে সে যে কোন জায়গাতেই যেতে পারে আর যতক্ষণ না কম্যাণ্ডার গাশ্‌দিবানে থাকার হুকুম ফিরিয়ে না নেন ততক্ষণ গাশ্‌দিবানে থাকতেই হবে।

'কুল্‌মুরাদ্‌,' নুরভ তার ড্রাইভারকে ডেকে বলল। 'রুটিগুলো নিয়ে আয়, দেখি। এখানে খেতে বসেছে সবাই।'

ড্রাইভার এক গোছা রুটি নিয়ে এল।

'পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার দিনে,' বলতে বলতে বুড়োদের মধ্যে রুটি বিলিয়ে দিতে লাগল নুরভ।

কিন্তু দেখা গেল অজ্ঞাতকুলশীল এই বুড়োদের এমন দিনের কথা মনে নেই।

'গাশ্‌দিবানের পিতৃস্থানীয় লোকেদের ভোলা উচিত নয় এমন সব দিনের কথা।'

'পিছিয়ে থাকা গ্রাম্য লোকেরাই কেবল সব উৎসব মনে করে রাখে।' গ্রাম্যলোকটার কাছে অপদস্থ না হবার জন্য প্রতিবাদ করল তারা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, রুটিগুলো রাখুন।'

বুড়োরা খুশীমনে রুটিগুলো লুকিয়ে রাখল আলখাল্লার ভেতর আর ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গিতে সভাপতির দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়াল।

তাদের মধ্যে একজন বলল:

'আমরা এখুনি খেয়ে উঠেছি তাই রুটিগুলো বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি।'

রুটি বিতরণ করা হলে পর নুরভ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। পবিত্রভাব ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

সুকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল সে:

'হে কালো তারাদের মধ্যে বিচরণকারী আমাদের পূর্বপুরুষরা! আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই...'

তার শান্তিপূর্ণ স্বর শুনতে শুনতে তার প্রতিধ্বনি করতে লাগল বুড়োরাও।

'হে কালো তারাদের মধ্যে বিচরণকারী আমাদের পূর্বপুরুষরা! আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই...'

'ব্যাস।' উঠতে উঠতে বলল নুরভ। 'পরলোকে জিজ্ঞাসা করবে যখন যে আত্মাকে পবিত্র রাখার জন্য তুই সবকিছু করেছিস তো?'

'তা ঠিক।' একমত হল বুড়োরা।

নুরভের মেজাজ ভাল আছে দেখে বুড়োরা তাকে বলল তাদের সাহায্য করার জন্য।

বুখারার বাজারে মুলোর দাম নিয়ে কথা আরম্ভ হল।

কে যেন বলল:

'আমাদের সবারই লোকসান হচ্ছে। সব থেকে জমজমাট বাজারে এখন এক আঁটি মুলোর দাম পাঁচ কোপেক।'

'ঠিক।' বাকী সবাই সমর্থন জানাল। 'আমাদের নদীতে একটু জল দিতে পারেন না আপনি যাতে আমরা আসছে বছর খরমুজের চাষ করতে পারি আমাদের বাগানে।'

'না, যৌথখামারে জলের খুব টানাটানি।'

'কিন্তু আপনার তো হাজারজন লোক আছে।' নুরভকে খোসামোদ করতে লাগল তারা। 'আপনি সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর, পদক পেয়েছেন। কবে যেন ভোটও দিয়েছি আমরা আপনাকে। আর আপনি নদীটার জল এমন করে আটকে দিলেন যে আমরা এক ফোঁটা জল পাই না...'

'আমরা নদীর জল আটকেছি কারণ যৌথখামারের জল দরকার। আর তোমরা নিজের নিজের ব্যবসা খুলে বসেছ। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। যৌথখামারে কাজের লোক দরকার। অনেক লোক। যারা যৌথখামারে কাজ করতে আসবে, তাদের থাকবার জায়গা দেওয়া হবে, গরু কেনার টাকা দেওয়া হবে। তার পরিবর্তে চাই কেবল — কাজ। গাশ্দিবানে তো তোমাদের কাজ নেই। তোমাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভাব। হাতের কাছেই যখন কাজ রয়েছে, তখন কাজ খোঁজার জন্য বুখারা যাবার কি দরকার।'

সঙ্গে সঙ্গে বুড়োদের মুখ ঝুলে গেল, নুরভের দিকে আর তাকাচ্ছেও না। এসব পুরনো কথা আর ভাল লাগে না তাদের।

এগামভ উঠে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। নুরভ এখন যে সব কথা বলছে তার মধ্যে সেও এসে পড়ে। খারাপ লাগে তার যখন তাকে এইসব ফাটকাবাজগুলোর সঙ্গে এক দলে ফেলা হয়।

'এগামভ,' ডাকল সভাপতি।

বেরিয়ে এল এগামভ অপরাধীর মত মাথানীচু করে।

'চল বুখারায় যাই বেকভকে নিয়ে আসতে... এ লোকগুলো ভাল, মন্দ কিছুই চায় না।'

তাদের সামনে রাতের শহর তার সমস্ত সৌন্দর্য মেলে ধরেছে। ম্যাড়-ম্যাড়ে চাঁদের আলোর রাস্তাঘাট, মিনারগুলি রহস্যময় দেখাচ্ছে। রাত্রিবেলায়

লোকেদের বাড়ীর ফটক বন্ধ করার আওয়াজ, সারা তুরান উপত্যকায় প্রসিদ্ধ তুঁতবনের মধ্য দিয়ে বয়ে শহরের জলাধারে এসে পড়ে যে ছোট্ট নালা তার ওপর ঝুঁকেছে একাকী পথিক জল খাবার জন্য।

রাত দুটোর সময় গাড়ী এসে থামল প্রাদেশিক কমিটির ভবনের সামনে।

পাহারাদার জানাল সন্ধ্যাবেলায় একজন কমরেড এসেছিলেন, যিনি নিজের নাম বলেন বেকভ, কিন্তু একটু পরেই তিনি মুখেচোখে হতাশ ভাব নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

'স্টেশনে রাত কাটাবার ঠিক করেছে মনে হয়।'

নুরভ স্টেশনের দিকে যেতে বলল ড্রাইভারকে।

'কম্যাণ্ডার চিরদিনের জন্য চলে গেছেন,' মন খারাপ লাগল এগামভের। সভাপতির সামনে এখনও তার অস্বস্তি লাগছে। 'যাক্, নিজের বিচারবুদ্ধি মতই কাজ করেছেন।'

স্টেশনে যাবার পথে কাঠগুদামের কাছে গাড়ী থামাল নুরভ। গজগজ করতে করতে রেল লাইনটা পেরিয়ে গেল, অনেক দূরের থেকে কাঠ বয়ে নিয়ে এখুনি এসে পেঁাছান ওয়াগনগুলি দাঁড়িয়ে আছে; টর্চের আলোয় মাল নামানর কাজ চলছে।

নুরভকে এখন কাকুতিমিনতি করতে হবে গুদামের ম্যানেজার ঐ ছোটখাট মানুষটাকে, যে নিজের অফিসঘরে বসে জানলা দিয়ে কাঠ নামান তদারক করছে।

দরজার চৌকাঠে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে নুরভ বিরক্ত মনে সেই ছোট মাথার ভাঁজ পড়া পিছনদিকটা দেখল।

লোকটি ঘোলাটে কাঁচে অনেকক্ষণ আগেই দেখেছে সভাপতির ছায়া, তবুও ভাব দেখাতে লাগল যেন খুব ব্যস্ত হর্তাকর্তা লোক।

'এবারে আপনি আমাকে রাতেও জ্বালাতে আরম্ভ করেছেন দেখছি, কমরেড নুরভ।' শেষ পর্যন্ত পেছন ফিরে ঠাট্টার ভঙ্গীতে বলল, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল যে নুরভকে একটু অপমান করার জন্যই তা বলা।

'যেতে যেতে দেখলাম, কাঠ এসে পেঁাছেছে,' দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে বলল নুরভ।

ভেতরে ভেতরে লোকটি কিন্তু নুরভকে ভয়ই পেত, সতর্কভাবে বলল সে:

'এমন একজন লোক, কাঠ যোগাড় করতে পারছে না, হায়-হায়। কিন্তু আমার অবস্থাটাও বুঝুন, যাদের আগে কাঠ পাবার পালা তাদের তো দিতেই হবে...'

'গুদামের অভাবে আমার সব্জী পচে যাচ্ছে,' কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলল নুরভ। 'এবারে আমার কাঠ চাই-ই চাই, নাহলে যৌথখামারের ক্ষতি হবে লাখটাকা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' উঠতে উঠতে বলল লোকটি। 'আমরা চুনোপুঁটি তো, চট করে রাজী করান যায় আমাদের। কাল গাড়ী নিয়ে আসুন।'

গাড়ীর মধ্যে দুলতে দুলতে সভাপতি ভাবল: 'হায়রে আহমেদ নুরভ, তুই যদি এখন ভেড়ার ছানাদের সঙ্গে ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করে বেড়াতিস, পাখীর বাসা খুঁজে বের করে শিয়ালের হাত থেকে সেগুলোকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করতিস... আর প্রকৃতির শান্তিভঙ্গকারী শিকারীদের দ্বারা আহত শিয়ালগুলির চিকিৎসা করতে পারতিস... তুই যেন একটা আধনেংটা ভাঁড়, হাজার হাজার লোক তোর দিকে তাকিয়ে হাসছে... বেকুভ আবার জিজ্ঞাসা করছে কেমন করে খামারটাকে দাঁড় করালাম আমি... সব ছেড়েছুড়ে পালাতে পারলে হয়। অনেক দূরের সেই গ্রামটিতে যেখানে তুঁতগাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে পারে... একটা নীতিকথা আছে এক হাজী আর তুঁতগাছ নিয়ে...' সেকথা মনে পড়ায় মনে মনে হাসল নুরভ।

এক হাজী মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছে আর লোকের মঙ্গলের কথা ভাবছে। মক্কা থেকে হেঁটে ফিরছে সত্তর দিন ধরে, সেখানে তাকে, একজন কৃষককে, পয়গম্বরের সমাধির কাছে হাজীতে পরিণত করা হয়েছে। আর তা করার কারণ হল সে পায়ে হেঁটে মরুভূমি পেরিয়ে মক্কাতে এসে পেঁাছেছে।

সেই হাজীটি এতই পুণ্যাত্মা ছিল যে তার কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম মাটিতে পড়লেও, সে মরা মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে ফুলফল গজিয়ে উঠত।

বসে আছে হাজীটি মরুভূমির মাঝে তার আসনটিতে। বিশ্রাম করছে আর অন্যের মঙ্গল করার কথা ভাবছে। ভাবছে যে মানুষের তিন রকম মঙ্গল হতে পারে: অল্প একটু মঙ্গল, বড় কিছু মঙ্গল আর মঙ্গলের জন্যই আরও কিছু মঙ্গল।

এই বালির থেকেই মানুষের উৎপত্তি, বালিতেই আবার মিলিয়ে যাবে, ভাবতে লাগল হাজী, আর এই পৃথিবী মানুষের জন্য, মানুষ পৃথিবীর জন্য... অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে সব গুলিয়ে গেল হাজীর, পৃথিবী মানুষের জন্য না মানুষ পৃথিবীর জন্য।

মাত্র গতকালও সে চাষী ছিল, তাই অনেক বাজে চাষাড়ে স্বভাবও তার থেকে গিয়েছিল। এই যেমন, কোন কিছু ভাবতে ভাবতে পায়ের গোড়ালি চুলকোতে ভালবাসত সে। যতক্ষণ সে মঙ্গলের কথা চিন্তা করছিল পয়গম্বরের

সমাধি থেকে আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে নিয়েছে এক মুঠো পবিত্র মাটি, যার গুণ হল ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাসী লোকের পায়ে আটকে যাওয়া।

আল্লাহ্ই জানেন আরও কতক্ষণ সে ভেবে চলত, যদি না হঠাৎ তার হাতের তালুতেই ঐ মাটির ওপর একটা গাছ গজিয়ে উঠত।

'তার মানে, গাছটা... আর সব থেকে মজার ব্যাপার হল যে ঐ হাজীটি অতদিন মরুভূমিতে থাকার ফলে একাবোধ করতে লাগল — এখনকার ডাক্তাররা হয়ত তার নাম দিতেন কোন একটা কমপ্লেক্স,' হঠাৎ হেসে উঠল নুরভ, গল্পটায় এত মশগুল সে যে ড্রাইভার আর এগামভের অস্তিত্ব ভুলে গেছে।

তারপর, হাতের ওপর গাছ... সেখান থেকে একটু দূরে একজন লোক জমিতে লাঙল দিচ্ছিল। এই ছোট্ট এক টুকরো জমিতে সে বহুদিন ধরে পরিশ্রম করছে কিন্তু সব বৃথা। মরুভূমির শুকনো বালিতে লাঙল দেওয়া অর্থহীন। বালির ওপর দিয়ে মইটা এগিয়ে যাচ্ছে কোন ছাপ পড়ছে না। বালি আবার ফিরে আসছে নিজের জায়গায়।

হাজী লোকটির বৃথা পরিশ্রম দেখে তাকে বলল:

'আয় এই গাছের তলায় বসে একটু বিশ্রাম করে নে। তারপর নতুন শক্তি আর আমার শুভকামনা নিয়ে কাজ করতে যাবি। যদি কিছু কাজ হয় তাতে।'

তার মানে হাজী দ্বিতীয় ভাল কাজ করলেন ঐ খেটে হাঁপিয়ে পড়া লোকটিকে আশ্বস্ত করে, তার মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে। আর প্রথম ভাল কাজটা করল সে যখন তার হাতের তেলোয় গাছটা গজিয়ে উঠল।

আর ঐ লোকটিও বিশ্রাম নেবার প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করার মত বোকা নয়।

সে কাজ ছেড়ে এসে গাছের ছায়ায় বসল। চারপাশ তাকিয়ে দেখে: কি চমৎকার জায়গাটা, ঠাণ্ডা! ডালে ডালে বানর ছুটোছুটি করছে, গাছের ছাল কুরে খাচ্ছে পোকারা, আর কাকেরা গাছের কোটরে বাসা বানিয়েছে, গাছের শিকড়গুলির মধ্যে দিয়ে সাপ ঘোরাফেরা করছে।

সেগুলোকে মেরে, তাড়িয়ে নিজের মত একটু জায়গা পরিষ্কার করে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে আর ভাবছে, আঃ কি আরাম!

লোকটা দেখা গেল বেশ বেপরোয়া গোছের। দেখছে হাজীর মনটা ভাল, একটু পরে সেই গাছের তলায় এনে হাজির করল নিজের গোটা সংসারটা — বাজার হাট, চানের জায়গা, আঁস্তাকুড়, কবরখানা সবকিছু। পাকাপাকি গেড়ে বসল সেখানে।

হাজী বলল: 'হয়েছে, এবার যাও নিজের খেতে গিয়ে কাজে লাগো, এই অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে খেটে খেতেই তোর জন্ম।' লোকটি তার উত্তরে বলল: 'না, আমার জন্ম আপনার কাছে থাকা, আপনার সেবা করার জন্য।' — 'কি ভাবে তুমি আমার সেবা করবে?' — 'চিরকাল আপনার গল্প শোনা।' — 'তাহলে শোন।'

এইভাবে হাজী করল তৃতীয় ভাল কাজটি অর্থাৎ ভাল করার জন্য ভাল করা।

সে গল্প বলতে বলতে ইতিমধ্যে গাছটা পচে গিয়ে পড়ে গেল।

এদিকে হাজী এতক্ষণ ধরে আগুনঝরা আকাশের নীচে বসে আছে আর লোকটি তার গল্প শুনছে...

স্টেশনের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় গাড়ীর হেডলাইটের আলোয় এক ঝলক দেখা গেল এগামভের ছেলেকে।

'মারুফ!' এগামভ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল।

কেটলি হাতে দাঁড়িয়ে রইল মারুফ, কাছে আসতে চাইল না।

'ওর দিকে আলো ফেল দেখি,' ড্রাইভারকে বলল এগামভ।

প্রাক্তন এডজুট্যান্টের মাথায় একটা ভয়ংকর চিন্তা খেলে গেল: মারুফ বাবাকে ফেলে পালিয়ে এসেছে বুখারায় বড়ভাইয়ের কাছে কাজের খোঁজে।

'কম্যাণ্ডারকে চা খাওয়াব,' বলে মারুফ দৌড়ল চাখানার দিকে। বাবাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বুঝে খারাপ লাগল তার।

সভাপতি আর এগামভ গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ওয়েটিংহলে ঢুকে দেখল একটা বেঞ্চের ওপর কম্যাণ্ডার শুয়ে আছে।

বেঞ্চে কম্যাণ্ডারের পায়ের দিকে বসল তারা কোন কথা না বলে। বেকভের ফোলা ফোলা মুখচোখ দেখে তারা আন্দাজ করল যে একটা হার্ট এটাকের ধাক্কা সামলিয়েছে সে।

'হাইবুটের মধ্যে পাগুলো বোধহয় ফুলে গেছে,' নুরভ বলল বেকভকে। 'খুলে ফেলতে হবে ওগুলো।'

'হ্যাঁ,' দুর্বল গলায় উত্তর দিল বেকভ।

এগামভ লাফ দিয়ে পড়ল কম্যাণ্ডারকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু নুরভ নিজেই বেকভের পায়ের থেকে জুতোজোড়া খুলে নিল।

নুরভ ভাবল তার সঙ্গে এখন গাশ্‌দিবানের ব্যাপারে কোন কথা বলবে না। বুঝতে পারল যে বেকভ প্রাদেশিক কমিটিতে ছুটে এসেছিল মৃতপ্রায় কারখানাটার ব্যাপারে কোন সাহায্য পাবার আশায়।

8—54

‘এখন বেকভ আমার বিরুদ্ধে যাবে,’ নুরভ বিষণ্ণ হয়ে গেল।

সে জানে যে অসুস্থ কম্যাণ্ডার এখন কিছুই করতে পারবে না, কেবল পুরনো, অভ্যস্ত যুক্তি অনুযায়ী গাশ্‌দিবানকে অন্যভাবে দেখতে চাইবে না, লেখালেখি করবে, কমিটি ডাকবে, এইভাবে তার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়বে।

কেটলি নিয়ে ফিরে এল মারুফ, নুরভকে অভিবাদন জানাল। সভাপতির নকল করে আর বেকভের প্রতি তার অবজ্ঞা ফুটিয়ে তোলার জন্য কেটলিটা বেঞ্চির ওপর রাখতে রাখতে কঠোর স্বরে বলল:

‘এই শেষ। চাওলা বলছে মাগনায় আর দেবে না। আমি বললাম যে আপনি কম্যাণ্ডার, কিন্তু ও শুনছেই না।’

বেকভ দিশেহারা হয়ে মাথাটা তুলল একটু।

‘আমি ঐ চাখানায় বহুবছর চা খেয়েছি। ক্লিচ্‌কে মনে আছে কুলিখান ?’

‘মনে থাকবে না আবার, কম্যাণ্ডার ?’

‘সব পয়সা খরচ হয়ে গেছে। চাওলাকে বল্‌ মারুফ, পেনসনটা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুক।’

‘কি বলছেন কম্যাণ্ডার ?’ কম্যাণ্ডারকে এমন অবমাননাকর পরিস্থিতিতে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল এগামভ। ‘আপনি আমাদের অতিথি !’

পকেট থেকে পয়সার ছোট্ট থলিটা বের করে ছেলের হাতে দিয়ে বলল:

‘যা দিয়ে আয়। ক্লিচকে বলিস, ওরও ভাল হবে না !’

ক্লিচকে মুখের মত জবাব দিতে পারার আনন্দে মারুফ খুশীমনে আবার ছুটে গেল চাখানায় আর ভাবতে লাগল কম্যাণ্ডার আর তার প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট কেমন যেন অদ্ভুত আর আবেগপ্রবণ।

ক্রুদ্ধ এগামভ অনেকক্ষণ ধরে শান্ত হতে পারল না, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাওলাকে নির্লজ্জ গাধা বলে গাল দিতে লাগল।

‘নাও,’ বেকভ তার দিকে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিল।

সকৃতজ্ঞভাবে এগামভ চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বেঞ্চের এক পাশে বসল।

নুরভ সে সময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে চার দিকে বসে থাকা চাষীদের লক্ষ্য করছিল কোন চেনা লোককে খুঁজে পাবার আশায়, যাকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, বাস তো সকালের আগে আর চলবে না।

মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি নিয়ে মারুফ ফিরল, খুব কষে গাল দিয়েছে চাওলাকে বোঝা যাচ্ছে, যে তার বাবার চরম শত্রু।

নুরভের কাছে বসল সে আর যতক্ষণ এগামভ আর বেকভ চা খাচ্ছিল, মারুফ সভাপতির সঙ্গে কি সব কথা বলল।

'সামনের বছর ট্রাকটর চালানোর কাজ শেখা আরম্ভ করবি।' এগামভ যাতে শুনতে পেয়ে প্রতিবাদ না করে সেজন্য আস্তে করে বলল নুরভ।

বড়রা যখন তার সঙ্গে কথা বলে এমন গুরুত্ব দিয়ে খুবই ভাল লাগে মারুফের।

তার সমবয়সীদের সঙ্গ পরিহার করে চলে সে, ভাল লাগে না তাদের।

বাবার কাছ ঘেঁষে মারুফ ফিসফিস করে বলল:

'বাবা আমি প্রাদেশিক কমিটির অফিসে ঢুকেছিলাম। জান সেখানে দেয়ালে দেয়ালে এত ঘড়ি ঝুলছে...'

'পরে,' পাত্তা দিল না এগামভ।

'জান বাবা,' ছাড়তে চাইল না ছেলে, 'কম্যাণ্ডার অবশ্যই মান্য লোক কিন্তু ভীষণ বিরক্তিকর লোক। কি করে যে আমরা ওঁর সঙ্গে থাকব জানি না।'

একথাটাও এগামভ না শোনার ভান করল ভাবল কম্যাণ্ডারকে সম্মান না দেওয়ার জন্য ছেলেকে শাস্তি দেবার সুযোগ পালিয়ে যাচ্ছে না।

যৌথখামারে ফিরে যাবার জন্য সবাই বাইরে বেরিয়ে এলো, এগামভ আর মারুফ চায়ের বাসনপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আসতে চাখানায় গেল।

যখন তারা স্টেশনের কাছে ফিরে এল লরিটা তাদের না নিয়েই রওনা দিয়েছে।

'কম্যাণ্ডার,' চীৎকার করল এগামভ, ভয় হল তার যে এই গভীররাতে বাড়ী থেকে এত দূরে পড়ে থাকতে হবে। 'আমাদেরও তুলে নিন!'

থেমে গেল গাড়ীটা, বেকভ গাড়ীর মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে দোষী দোষী ভাবে বলল:

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ, আমার ভালমানুষ কুলিখান?'

লরির পেছনে উঠে পড়ে স্বস্তি পেল এগামভ। আধঘুমন্ত ছেলের কাঁধ জড়িয়ে কাছে টেনে নিল।

'দেখছ আবার সেই সঙ্গে স্বার্থপরও,' ফিসফিস করে বলল মারুফ।

'যদি তুই আর একবার খারাপ কথা বলিস কম্যাণ্ডারের সম্বন্ধে তো আমি তোর বাবা নই!' আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল এগামভ।

সারা পথটাই সবাই চুপ করে রইল। উষ্ণ রাতটা কেমন যেন এক বিষণ্ণতা নিয়ে এসে নানা ভাবনা চিন্তা জড়ো করেছে সবার মনে।

প্রাদেশিক কমিটির অফিসে পুরনো বন্ধু মাভলিয়ানভের দেখা পার

নি বলে আফসোস হল বেকভের। প্রাদেশিক কমিটি অফিসে আগেকার লোক বলতে আছে ঐ একজনই মার্ভালিয়ানভ... তার থেকে নীচু পদের যে কর্তার কাছে ক্লান্ত, শ্রান্ত কম্যাণ্ডার নিজের দুঃখের কথা জানাল, সে কম্যাণ্ডারকে আশ্বাস দিল যে বেশ কয়েক বছর ধরেই নুরভ গাশ্‌দিবানকে নতুন করে তৈরী করার প্রকল্পরচনা করছেন, সে প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে...

কয়েকঘণ্টা আগে বেকভ ন্যায়বিচারের আশায় বুখারায় এসেছে। আবার তার মনটা খারাপ হয়ে গেল, অপরাধী মনে হল নিজেকে। কিন্তু সে অপরাধবোধটাও কেমন যেন ভাসাভাসা, স্পষ্ট করে বোঝা যায় না।

সে ভাবল: 'পালিয়ে না গিয়ে মনে বল এনে ফিরে এসে ভালই করেছি... আর তুই ইসখাক, গাশ্‌দিবান আর কারখানার কি হাল হয়েছে দেখে পালাতে চাইছিলি, জীবনের কঠোর যা কিছু থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চেয়েছিলি, তাই না ?.. না, জীবনের শেষ পর্যন্ত আমি থাকব গাশ্‌দিবানের লোকদের সঙ্গে, মারুফের সঙ্গে, যে আমাকে আরও অনেক প্রশ্ন করবে, এগামভের সঙ্গে, যে আমাকে অন্ধের মত ভালবাসে আর আমাকে বহুদিন আগেই মাফ করে দিয়েছে.... নুরভের সঙ্গে, ওর নতুন প্রকল্প... কিন্তু এখন আমার কি করা উচিত, ওকে সাহায্য করা না ওর বিরোধিতা করা, কারণ যা করা দরকার তার ঠিক উল্টোটাই করছে ও...'

...ভোরের হাওয়ায় ভ্যাপসা গন্ধ ছড়ানো বাগানের কাছে উঠোনে বসে তখনও ঝিমোচ্ছিল বুড়োরা। নুরভ রাগ করে তাদের বলেছিল: 'অপেক্ষা কর !' ওরা অপেক্ষা করছে।

বেকভ কিছুই লক্ষ্য করল না। সে এখন তাড়াতাড়ি বিছানা নিতে পারলে বাঁচে, দুর্বল শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

মারুফও উঠোনে পা দিয়েই ছুটে ঢুকে গেল বাড়ীর মধ্যে। 'ছেলেটা দুর্বল, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে বুড়োদের মত,' ভাবল এগামভ। 'সব ঠিকঠাক গুছিয়ে উঠতে পারলে, ভাল করে খাওয়াতাম ছেলেটাকে... এমন ছেলেকে দিয়ে কিছুই হবে না, না কাজে লাগা, না বিয়ে দেওয়া। হয়ত রোগা বলেই অমন রাগী, বিষণ্ন, সবকিছু হতাশচোখে দেখে ?'

প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট গাছের থেকে আলোটা নামিয়ে নিয়ে কম্যাণ্ডারকে পথ দেখাতে লাগল। দেখল, ঘুমিয়ে থাকা লোকেদের কারুর হাত মাড়িয়ে না ফেলার জন্য সাবধানে চলতে হচ্ছে পরিশ্রান্ত বেকভকে।

উঠোনের আধখানা ভালয় ভালয় পেরিয়ে যাবার পর কে যেন হঠাৎ কম্যাণ্ডারের একেবারে পায়ের কাছে উঠে দাঁড়াল।

'কম্যাণ্ডার বেকভ,' শোনা গেল কার ফিসফিসানি, এগামভ চিনতে পারল না সে গলার স্বর।

আলো তুলে ধরল এগামভ, তাতে অস্বস্তিতে লোকটি চোখ কোঁচকাল।

'ব্যস্ত হয়ো না,' অনিশ্চিতভাবে বলল লোকটি।

'কে আপনি ?' জিজ্ঞাসা করল বেকভ।

'লেজকাটা চিতা...'

তুরসুনভকে যে নামে ডাকা হত তা শুনে কেঁপে উঠল বেকভ। তুরসুনভকে আলিঙ্গন করার জন্য যখন সে হাত বাড়াল, সেগুলি উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

কিন্তু তুরসুনভ পিছিয়ে গেল।

'তিনঘণ্টা বসে আছি আপনার জন্য,' অভিমান বাজল তুরসুনভের গলায়।

'এখানে সেই থেকে বসে আছেন ? অপেক্ষা করছেন ? কেন ? আপনার বাড়ীতে আমাকে ডাকলেই তো পারতেন...'

'প্রথমে বসেছিলাম, তারপরে আর পারলাম না, শুয়ে পড়লাম। ঘুমোই নি কিন্তু। আপনাকে চিনেছি সঙ্গে সঙ্গেই,' বলল তুরসুনভ। 'আপনি হঠাৎ এমন বদলে গেছেন... হঠাৎ...' আলোটা নিয়ে তুলল কম্যাণ্ডারের মুখের কাছে। 'সময় আপনাকেও ছেড়ে দেয় নি দেখছি। আমি ভাবতাম... দেখতে এসেছেন, কেমন আছি আমরা ? সুস্বাগতম ! আছি যেমন থাকা উচিত। ভাল আছি, সুখেশান্তিতে আছি।'

'আপনি যে মদ খেয়েছেন দেখছি,' অবাক হল বেকভ।

'হ্যাঁ আমি মাতাল,' হতাশভাবে বলল তুরসুনভ, 'আসুন, উঠোনে বসা যাক। এখুনি ভোর হবে। সূর্য উঠবে, আমাদের কারখানাকে আলোকিত করে তুলবে। ছুঁচোরা পালাবে...'

কম্যাণ্ডারকে জড়িয়ে ধরে তুরসুনভ আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়তে লাগল মাটিতে।

'আপনাকেও সময় ছেড়ে কথা কয় না দেখছি। আর আমি কিনা ভাবতাম,' বুঝতে পারে না সে কিছুতে। 'কারখানা দেখেছেন ?..'

'দেখেছি... পঁয়ত্রিশ সালের বসন্তে আমি যে কাঠের পাটাগুলো পাঠিয়েছিলাম তোমায়, সেগুলোর কি হল ?'

'পঁয়ত্রিশের বসন্তে ?'

'আর লোহা ? সিমেণ্ট ?' জিজ্ঞাসা করতে লাগল বেকভ।

চুপ করে রইল তুরসুনভ। বেকভ তার ওপর ঝুঁকে পড়ে এগামভকে বলল:

'ঘুমিয়ে পড়েছে...'

'আপনার জন্য বিছানা করি গিয়ে, কম্যাণ্ডার,' বাড়ীর ভেতর যেতে যেতে বলল এগামভ, কিন্তু বেকভ বলল:

'না, আমি এখানে থাকব, ওর সঙ্গে।'

উবু হয়ে বসে সে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল তুরসুনভকে। বুড়ো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে আর মৃত্যুমুখে পতিত কারখানার এত দায়দায়িত্ব তার ওপর থাকায় তার মুখেচোখে বুদ্ধির ছাপ পড়েছে।

'কিন্তু বাড়ীর ভেতরে গেলে হয় না?' অবাক হয়ে বলল এগামভ।

'যাও তুমি!' রেগে বলল কম্যাণ্ডার। তুরসুনভের মাথার কাছে ব্যাগটা রেখে নিজেও শুয়ে পড়ল।

ভোরবেলায় বাগানে যখন শিশির পড়তে লাগল বেকভ ঘুম ভেঙে গুটি-শুটি হয়ে গেল, হাতড়ে হাতড়ে কম্বলটা খুঁজতে লাগল। তারপর উঠে আধোঘুমন্ত অবস্থায় বুড়োদের ধাক্কা দিতে লাগল, কার হাত মাড়িয়ে দিল। তারা গজগজ করতে লাগল, কম্যাণ্ডার মাফ চেয়ে নিয়ে আবার খুঁজতে লাগল তুরসুনভকে।

তুরসুনভ কিন্তু নেই সেখানে। এগামভ জানলা দিয়ে দেখেছে ঘণ্টাখানেক আগে চোখ মেলে তুরসুনভ কাছেই ঘুমিয়ে থাকা কম্যাণ্ডারকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। যেন বেকভের সঙ্গে রাতের বেলায় পঁয়ত্রিশ সালের কাঠের পাটা, সিমেণ্ট কোনো কিছু নিয়েই কথাবার্তা হয় নি, যেন এই প্রথম দেখল তুরসুনভ কম্যাণ্ডারকে...

কিন্তু এগামভ ভাবল বেকভের দেখা পাওয়ায় তুরসুনভের খুবই আনন্দ হয়েছে। তার মনে হল তুরসুনভ মোটেই ঘুমোয় নি, কেবল ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে শুনেছিল কেমন করে কম্যাণ্ডার তাকে মমতা জানাচ্ছিল, তাকে শুইয়ে দিয়েছিল। এর চেয়ে আর বেশী কিছুই দরকার নেই তুরসুনভের। এই দীর্ঘ ক্লান্তিকর বছরগুলি সে কাটিয়েছে কম্যাণ্ডারের আসার অপেক্ষায়, আজ কম্যাণ্ডার এসেছেন, তুরসুনভকে মাফ করে দিয়েছেন, আবার বন্ধুকে সম্মান দেবার জন্য তার কাছেই শুয়ে পড়েছেন...

খুব ভাল করেই জানে এগামভ, এবারে অপরাধমুক্ত হয়ে ও গা ঢাকা দেবে আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কম্যাণ্ডারকে এড়িয়ে চলবে, যেহেতু

কম্যাণ্ডারকে তার আর দরকার নেই, তার সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহও নেই তুরসুনভের।

উঠোনে কি ঘটছে না ঘটছে জানলা দিয়ে তা লক্ষ্য করতে করতে এইসব ভাবছিল এগামভ।

অনেক বছর আগে যখন নদীর জল একেবারে কমে গেল, তুরসুনভ তা ভাগ্যের বিধান বলে মেনে নিয়েছিল তারপর আস্তে আস্তে ত্রাস কাটিয়ে উঠে কারখানা পরিচালনার কাজ চালাচ্ছিল। কিন্তু যে বিরাট কারখানাকে ঘিরে গাশ্দিবান গড়ে ওঠার পরিকল্পনা ছিল, তা নয়, বেকভ থাকাকালীন যে দুটি ছোট শপের কাজ আরম্ভ হয়েছিল সেগুলিরই কাজ চালাতে লাগল।

এখন বেকভ তুরসুনভকে মাফ করে দিয়েছে, তার বিশ্বাস অর্জন করবারও চেষ্টা করবে, কারণ বেকভ দয়ালু, মনটা তার পরিষ্কার। আর যেহেতু এখানকার জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা আছে নুরভের আর সে বেকভের মতন না, প্রচণ্ড লড়ুয়ে মনোভাব তার, তাই বেকভের সাথী হতে হবে এই হতাশ, নিষ্ক্রিয় তুরসুনভকেই।

‘কম্যাণ্ডার,’ আস্তে করে ডাকল এগামভ, ‘বাড়ীর মধ্যে যান, আমি কম্বলটা নিয়ে আসছি...’

বেকভের শরীরটা এখনও স্বাভাবিক হয় নি, টলতে টলতে কোনরকমে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু শান্তি পাবার জো নেই তার।

ঐ বুড়োর দল... ওরা তাকে প্রতি পদে অনুসরণ করছে। বেকভ দরজার দিকে এগনো মাত্রই কে যেন চীৎকার করে উঠল:

‘কম্যাণ্ডার পালিয়ে যাচ্ছে!’

এগামভ বেরিয়ে এল কম্যাণ্ডারকে বাড়ীতে ঢুকতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু বুড়োরা জেগে উঠে জানলার কাছে গোলমাল আরম্ভ করে দিল, কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

এগামভ বলল, ‘ঠিক আছে, জানলা দিয়ে কথা বলুন ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমার অনুরোধ, কোন কিছু প্রতিশ্রুতি দেবেন না।’

‘এরা কারা?’

‘এরাই আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে স্মরকস্তম্ভের কাছে। এরা আপনাকে ভালবাসে কম্যাণ্ডার। কিন্তু সে ভালবাসা সাপের বিষের থেকেও ভয়ংকর।’

বুড়োরা জানলার দিকে হাত বাড়িয়ে হৈচৈ করতে লাগল, ছেঁড়া আলখাল্লার প্রান্ত দোলাতে লাগল।

‘কম্যাণ্ডার, আমাদের জন্য কিছু করুন।’

‘চিরকালই অমনি দাবী চালিয়ে আসছে।’ বললে এগামভ।

কিছু না বুঝতে পেরে বেকভ জিজ্ঞাসা করল:

‘কি করতে হবে ওদের জন্য ?’

‘কান দেবেন না। ওরা ভান করছে। আসলে লোকেরা খুব সুখী কম্যাণ্ডার। আপনি কেবল এখানে থাকলেই ওরা সুখী।’

উঠোন থেকে চীৎকার শোনা গেল, ‘কম্যাণ্ডার, আপনার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ লোকটাকে তাড়িয়ে দিন। অত্যাচারী ও, এতবছর ধরে জ্বালাচ্ছে আমাদের, ও আমাদের ঘৃণা করে। ওকে তাড়িয়ে দিলেই আপনার ভাল হবে। ও শয়তান, আর আপনি আমাদের পিতা...’

‘ঠিক আছে’, বলল বেকভ। ‘কুলিখান, তুমি অন্য ঘরে যাও।’

‘আমি চলে যাবো, কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না ওদের।’

ঘুমন্ত মারুফের বিছানার পাশে বসে এগামভ শুনল বেকভ বুড়োদের বলছে:

‘বুখারা এ নিয়ে ভেবে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিপদের দিনে আমরা সাহায্য পাবই।’

তারপর এগামভ আর শুনতে পেল না — মারুফ জেগে উঠে ফিসফিস করে বলল:

‘কম্যাণ্ডার তোমায় তাড়িয়েই দিল দেখছি...’ এগামভ চুপ করে রইল।

৩

ভোর হলে বেকভ রাস্তায় বেরিয়ে এল গাশ্‌দিবানকে ভাল করে দেখবার জন্য।

স্মারকস্তম্ভের কাছে সে দেখতে পেল এগামভকে, রাতের বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় বিষণ্ন সে। প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট একটা ন্যাকড়ার টুকরো হাতে নিয়ে গ্রানাইটপাথরের সিঁড়িগুলো ধুচ্ছে, পাখী তাড়াচ্ছে, যাতে তারা ফুলের কুঁড়িগুলি না ছিঁড়ে ফেলে। কম্যাণ্ডারকে দেখে পেয়ে এগামভ লজ্জা পেয়ে ন্যাকড়া ধরা হাতটা পেছনে লুকাল।

‘তুমি এখানে কি করছ ?’ বুঝল না বেকভ।

‘এই একটু ধোয়ামোছা করছি, কম্যাণ্ডার,’ কম্যাণ্ডারের প্রতি ভালবাসায় গদগদ হয়ে বলল তার প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট।

'ভালই করছ...' নিজের মত জানাল বেকভ। বলে এগিয়ে চলল।

'কোথায় চলছেন, কম্যাণ্ডার?' তাকে একা যেতে দেখে উদ্বেগ বোধ করল এগামভ।

'বেড়িয়ে আসি।'

'সকালের খাবার খাওয়া হল না...'

চলে গেল বেকভ। দোকানের কাছে সে দেখল নুরভ গাশ্দিবানের লোকদের মধ্যে বিতরণ করছে যৌথখামারের খেতে তোলা আঙ্গুর।

গাড়ীতে দাঁড়িয়ে সে প্রতি পরিবারকে দু'কিলো করে আঙ্গুর ওজন করে দিচ্ছে।

তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নুরভকে একেবারে আকাশে তুলছে।

লোকের ভাল করতে পারায় নুরভেরও আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু বাক্স থেকে আঙ্গুরের থোলো হাতে তুলে নিয়ে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার, কারণ ফল সংরক্ষণের উপযুক্ত জায়গা নেই খামারের, সেই লোকটির কাছে যে কাঠের তক্তা সে আদায় করেছে তা এখনও এসে পেঁছায় নি।

বেকভ একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুঃখিতমনে লক্ষ্য করতে লাগল গাশ্দিবানে নুরভের প্রভাব কতটা, তারপর খারাপ মেজাজ নিয়ে ফিরে চলল বাড়ীর দিকে।

এমন একটা ঘরে থাকতে দিয়েছে কম্যাণ্ডারকে যে এগামভের লজ্জা লাগছে। খালি একটা ন্যাড়া টেবিল আর খাট, জামাকাপড় ঝোলাবার জন্য একটা দড়ি টাঙান। ঘরের কোণায় কোণায় বোনা ঝুড়িতে ঝুলছে খরমুজ।

এর থেকে ভাল ঘর আর নেই এগামভের। এক সময় এখানে থাকত তার ছেলে আনোয়ার।

বুড়ো এডজুট্যাণ্ট ভাবত আনোয়ার এখানে বউ নিয়ে আসবে আর যখন নাতিনাতনী হবে তখন ডানদিকের দেয়ালটা ভেঙে, এ ঘরটার সঙ্গে একটা শোয়ার ঘর তৈরী করতে হবে।

কিন্তু ছেলে তাকে ফেলে চলে গেছে অন্য শহরে, অন্য লোকেদের কাছে, একটা পরের মেয়ের কাছে, বৌয়ের বাপমাই এখন তার বাপমা, তার এখন সচ্ছল অবস্থা। থাক, অত দুঃখ করার কিছু নেই, কুলিখান...

এখন এই ফাঁকা ঘরটায় এগামভ কম্যাণ্ডারের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বেকভের কিন্তু একটুও রাগ হয় নি, বসে বসে কোন কথা না বলে ব্যগের থেকে জিনিসগুলো বের করে টেবিলে রাখতে লাগল।

কাঁটাভাঙা একটা পুরনো ঘড়ি বার করে তার ঢাকনাটা ঘুরিয়ে খুলে ফেলতেই বেরিয়ে এল একটা লাল চকচকে পদক।

'শ্রমের লালপতাকা পদক। তেতাল্লিশ সালে পাই। আলমা-আতা শহরে।'

এগামভ সাড়ম্বরে সেটিকে হাতে তুলে নিল।

'বেশ বড় মেডেল, কম্যাণ্ডার। আপনি যা করেছেন তাতে আপনার এমন একশ'টা মেডেল পাওয়া উচিত, মানতে হবে একথা।'

যখন বেকভ তার পোশাকটা বার করল, কেঁপে উঠল এগামভ। সেই বহু পুরনো দিনের গন্ধে তার মাথা ঘুরে গেল। কম্যাণ্ডারের খাকি কুর্তাটা দেখে কেঁদে ফেলল এগামভ।

'আমরা যেন আবার সেই পুরনো দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছি!' কুর্তাটায় হাত বোলাতে বোলাতে ফিসফিস করে বলল সে, সেই পবিত্র পোশাক ছুঁয়ে তার আঙুলগুলো যেন ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। 'একেবারে নতুন, ঠিক তেমনটিই আছে যেমনটি আমি আপনাকে সেলাই করে দিয়েছিলাম।'

'শহরে এটা পরার প্রয়োজন হয় নি আমার।'

বেকভ তার সাধারণ পোশাক ছেড়ে ফেলল, এগামভ তাকে সাহায্য করল সামরিক পোশাক পরতে।

'দেখছ, কেমন ঢিলে হচ্ছে পোশাকটা। আমি আর সেই বেকভ নই, দেখাই যাচ্ছে।'

'যদি অনুমতি দেন কুর্তাটা আমি সেলাই করে ছোট করে দেব, তাহলে আবার পরতে পারবেন।'

'এখানকার লোকেরা হয়ত ভালচোখে নেবে না।'

'আপনি যেন সেই আগের কম্যাণ্ডারের মত হন সবকিছুতে, এটাই দরকার লোকেদের, সত্যি বলছি!'

কম্যাণ্ডারের পোশাকটা নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল সে। কাঁচি, সুতো নিয়ে বসে হাতাটা সেলাই করতে বসল।

যেদিন থেকে কম্যাণ্ডার গাশ্‌দিবানে থাকতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই লোকেরা ফিসফিস করে কথা বলে, বলে কেবল তার সম্বন্ধে ভক্তি, শ্রদ্ধা মিশিয়ে। পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে সবাই।

মারুফের আচার ব্যবহারও কেমন যেন অদ্ভুত। সারা দিনটাই যেন উত্তেজনার মধ্যে আছে, কম্যাণ্ডারের কাছছেড়ে একপাও নড়ে না, বেকভের

বয়স যখন তার মত ছিল, সেই সব মহান দিনগুলির কথা জিজ্ঞাসা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এই তো এখুনি কাজ থেকে ফিরেই মারুফ গেল কম্যাণ্ডারের কাছে। এগামভ কান পেতে তাদের সব কথাবার্তা শুনল।

প্রথম ক'দিন সে খুব ভয়ে ভয়ে ছিল, মারুফ যেন অভদ্র রুক্ষ ব্যবহার করে অপমান না করে বসে কম্যাণ্ডারকে। তাহলে এগামভকে অমন ছেলের জন্য লজ্জায় পুড়ে মরতে হত। কম্যাণ্ডারের স্বপ্ন তো কেবল গাশ্‌দিবানকে নিয়েই নয়, তার লোকেদের নিয়েও...

'ওখানে ইতিমধ্যে এত লোক জড় হয়েছে,' উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল মারুফ। 'ওখানটা পেরিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। কমিটির লোকেরা সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ইসখাকচাচা, ওরা আপনাকে বাদ দিয়েই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে না বসে যেন...'

'লোক জড় হয়েছে, ভাল কথা, কমিটি সবার কথা শুনবে, সবকিছু দেখবে।'

'আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি যান। ওরা শীগগির কারখানায় যাবে। নুরভও এসে পড়েছে এরমধ্যে।'

'মারুফ!' চীৎকার করে উঠল এগামভ।

মারুফ অপরাধীভাবে দরজার বাইরে মুখটা বাড়াল। তার সারা শরীরে ময়দা মাখা — কাজের পরে চান করে ফেলতে আলস্য তার।

'কম্যাণ্ডারকে জ্বালিয়ে মারছিস কেন?'

মারুফের মুখ মলিন হয়ে গেল, করুণ মুখ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল বাবা কি করছে।

'বাবা, তুমি সবসময় আমাকে বকাবকি কর কেন? আমার তো বিশ বছর বয়স হল...'

'হ্যাঁ, বিশ বছর বয়স। কিন্তু এখনও তুই বড় হস নি। আর মনে করিস না যে তুই তোর বাবার থেকে বেশী জানিস... আপনি কেবল একবার ওর বুদ্ধির দৌড় দেখুন কম্যাণ্ডার,' মারুফের পেছনে কম্যাণ্ডারকে দেখে এগামভ বলল। 'শুনুন একবার!'

মারুফ মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

'তোমার বড় কড়া শাসন, কুলিখান,' বলল বেকভ।

'ওকে আমি ভালবাসি, কিন্তু কড়া শাসনে রাখি যাতে ভাইয়ের মত শহরে না পালায়।'

'বৰ্দ্ধিমান তোমার ছেলে।'

'আপনি বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলেটাকে ভাল করেই গড়ে তুলেছি, কম্যাণ্ডার।'

কিন্তু আবার মারুফকে বাগানে বসে টমেটো ছিঁড়তে দেখে এগামভ আর থাকতে পারল না!

'ওই বয়সে আমি শত্রুর মাথা কেটেছি! আপনি সাক্ষী, কম্যাণ্ডার। আর ওর বাবাকে নিয়ে একটুও গর্ব নেই...'

মারুফ এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছু শুনতে পাচ্ছে না, ছোট ছোট গাছগুলোর মাঝে বসে বাগানের পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছে যেন সে বন্দী।

'আমি কেমন যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছি, কম্যাণ্ডার। দেখছেন আমার হাত ঘামছে। কিন্তু আপনি তো ধীর, স্থির, এ ভাল! কুর্তাটা পরে নিন।'

কম্যাণ্ডারকে কুর্তাপরা অবস্থায় দেখে এগামভকে তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। অপূর্ব দেখাচ্ছে কম্যাণ্ডারকে, দৃঢ় আর শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দেবার মত।

'আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন, কমরেড কম্যাণ্ডার!'

এগামভ দেখল যে কম্যাণ্ডারও অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

'আমার স্বপ্ন ছিল বুড়ো বয়সটা সেখানেই কাটান, যেখানে অন্ততঃ একজন লোকও আমাকে মনে রেখেছে...'

'ধন্যবাদ কম্যাণ্ডার! আপনি যাতে এখানে ভাল থাকেন তার জন্য আমরা সবকিছু করব... তারপর আপনি যখন গাশ্‌দিবানে নিজের সব জিনিস নিয়ে আসবেন তখন ঐ দেয়ালটা ভেঙে আপনার ঘরটা আরও বড় করে দেব।'

'কোন জিনিস?' বুঝতে পারল না বেকভ। তারপর দেখাল হাতব্যাগটার দিকে, পদক সমেত ঘড়িটার দিকে, কুর্তা, জামাকাপড় আর তোয়ালের পোঁটলাটার দিকে। 'এই আমার সব জিনিস। আর কোন কিছুই নেই।'

'নিশ্চয়ই, জিনিস নিয়ে মানুষের হবেটাই বা কি?! আপনি মহান লোক, কম্যাণ্ডার। আমি বরাবরই তা জানতাম... আমিও থাকি, দেখতেই পাচ্ছেন, অত্যন্ত সাধারণভাবে। এই টুকিটাকি পুরনো কিছু জিনিস যৌতুকে পেয়েছিলাম।'

'আসল কথা হল কুলিখান, সততা, দয়ামায়া, ন্যায়পরায়ণতা। আমরা জিনিসের জন্য, আরামের জন্য লড়াই করি নি, মনে করে দেখ।'

'হ্যাঁ এ হল ধ্রুবসত্য। এখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। আপনার মত এমন লোককে কমিটি ভুল বুঝতে পারেই না... চলুন, কম্যাণ্ডার, সবাই আমাদের অপেক্ষায় আছে...'

গলিটা নিস্তব্ধ, কেবল তুঁতগাছের পাতা মচমচ করছে পায়ের নীচে।

'শরৎ এসে গেছে,' বলল এগামভ।

বেকভ চুপ করে রইল।

উল্টো দিক থেকে একজন মিলিশিয়ার লোককে আসতে দেখা গেল। বেকভকে দেখে সে তাড়াতাড়ি রাস্তার অন্য দিকে চলে গিয়ে স্যালুট ঠুকল।

কম্যাণ্ডার প্রথমে বুঝতে পারল না যে তাকেই অভিবাদন জানাচ্ছে তাই একটু ইতস্ততঃ করে তারপর হাতটা সোজা তুলল রগের কাছে। এগামভও খুশীমনে তা করল। মিলিশিয়ার লোকটির কাছে ছুটে গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাতেও পারত সে। কম্যাণ্ডারের মুখোমুখী হয়ে তাকে সম্মান দেখিয়ে মিলিশিয়াটি এগামভের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এনে দিল যে গাশ্‌দিবানের লোকেরা কম্যাণ্ডারকে পিতার মতই সম্মান করে।

কিন্তু স্মারকস্তম্ভের চত্বরের কাছে এসে কম্যাণ্ডার আবার নিভে গেল। কেন কে জানে। এগামভ তাড়াতাড়ি করে চোখ বুলিয়ে নিল ফুলের কেয়ারিগুলোর ওপর, সে নিজে এই জায়গাটা ধোয়ামোছা করে। তার চোখে তেমন কিছু পড়ল না।

আস্তে আস্তে চলেছে বেকভ, বাড়ীগুলোর গা ঘেঁষে যাচ্ছে, যেখানে একটুখানি ছায়া পড়েছে। রাস্তা কিন্তু ফাঁকা।

কারখানার কাছে কেবল একটু ব্যস্ততার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এল মারুফ আর বেকভের সঙ্গে সঙ্গে চলল নীরবে আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে।

তারপর আরও কিছু লোক চলতে লাগল তাদের পেছন পেছন, শত্রু না মিত্র তারা বুঝল না এগামভ।

এগামভ যেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।

চারদিকে লোক আর লোক — ক্রমশঃ বাড়ছে তাদের সংখ্যা — তাদের হাবভাব কেমন যেন অদ্ভুত। নাপিতেরা মাথা কামাচ্ছে একেবারে রাস্তাতেই; দোকানীরা ভুট্টা সেঁকছে। অচেনা কারা সব গাধার পিঠে চড়ে এদিক ওদিক করছে। দু'জন লোক মশাল ধরে কি যেন বলছে চেঁচিয়ে কিন্তু তাদের কথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

যৌথখামারের কৃষকরা খোলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিল বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি করে রেখে। কান কাটা বড় বড় কুকুরগুলোকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে কি ঘটছে তা দেখছে লোকেরা।

কারখানার ভেতরে দেখা গেল আরও বেশী লোক জড় হয়েছে। মলিনমুখে, নীরবে তারা ঘোরাফেরা করছিল উঠোনে। যখন সাদা পোশাক পরা কমিটির তিনজনের দিকে বেকভ এগিয়ে গেল, কেউ তার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না।

কেবল তুরসুনভ, পরিষ্কার কামানমুখ, কেমন অদ্ভুত লোকদেখানভাবে বেকভের হাত জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে চলল।

সাদা পোশাক পরা লোকগুলোকে ভয় হচ্ছিল এগামভের, স্বস্তি পেল সে যখন তাদের থেকে পাঁচ মিটার দূরে ঐ লোকগুলির গতি কমে এল।

কমিটির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে নুরভ, মনে হচ্ছে যেন চারপাশে যা কিছু ঘটছে তাতে নুরভই একমাত্র অংশীদার।

শ্রমিকরাও ছিল সেখানে, চল্লিশজনই, উদ্ধত, বেয়াড়া, কমিটির ডানদিকে হাঁটছে তারা, তামাসা করছে।

তুরসুনভ তাদের দিকে দেখাল বেকভকে।

'এরা আমাদের চল্লিশজন সৈন্যের ছেলেরা?' জিজ্ঞাসা করল বেকভ।

'হ্যাঁ, তারাও আছে...'

'সবকিছুই এখানে পরিষ্কার ছকা দেখছি,' এগামভের মাথায় খেলে গেল। 'কমিটি আর নুরভ সামনে, পাঁচ পা পিছনে কম্যাণ্ডারকে নিয়ে আমরা, ডানদিকে — শ্রমিকরা, বুড়োরা আর বাকীসবাই সবার পিছনে।'

'একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক,' বলে কম্যাণ্ডার একটা বাক্সের ওপর বসল। 'পারছি না আর।'

তুরসুনভও বসে পড়ল তার পাশে, এগামভ আর মারুফ দাঁড়িয়ে রইল।

'কি হল কম্যাণ্ডারের?' উদ্বিগ্ন হয়ে ফিসফিস করে বলল মারুফ।

'কম্যাণ্ডার জানেন যে তিনি ঠিক পথেই আছেন, তাই নিশ্চিন্ত।'

তারপর কমিটিকে নিয়ে লোকের পুরো দলটা শপের মধ্যে ঢুকে গেল। উঠোনে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'আমি এ নিয়ে আর বিশেষ চিন্তা করি না,' ধীরস্থিরভাবে স্বীকার করল তুরসুনভ, বিবেকের দংশনবোধ করছে না সে। 'আর কিছুই করে উঠতে পারি না ইসখাক।'

'একটু চুপ করে থাক,' ক্লান্তভাবে চোখ বুঁজে বলল বেকভ; এই বুড়ো

বয়সে এ কি ঝামেলা, ভাবল সে। কিছু করতে পারত হয়ত সে কিন্তু একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

'তোমার মনটা পরিষ্কার, ইসখাক,' মোল্লার উপদেশের মত শোনাল তুরসুনভের কথাটা। 'সেইজন্যেই তোমার মধ্যে এমন শান্তি।'

মারুফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তাদের কথা শুনছিল।

'যা, শপের ভেতরে কি হচ্ছে দেখ গিয়ে!' তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল এগামভ।

'দু'জন জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়া মানুষ যখন কথা বলে তাদের ছেলেদের তা শুনে কাজ নেই। ভুল বুঝতে পারে ওরা। প্রবীণদের মনের মধ্যে কি ঘটছে, তাদের জীবন এত কঠিন যে তা বুঝতে গেলে তাদের ছেলেদের নিজের বাবাদের বয়সে পেঁছিতে হবে।' ভাবল এগামভ।

শপে মারুফ নুরভের কাছে গিয়ে বলল কম্যাণ্ডার উঠোনে বসে আছে। কমিটিকে ছেড়ে নুরভ উঠোনে বেরিয়ে এল। তার সমস্ত শরীর, পোশাক মর্চেতে মাখামাখি।

বেকভের করমর্দন করল নুরভ, মায়া হল তার বন্ধুর জন্য, এত খারাপ দেখাচ্ছে তার চেহারাটা। কি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে এখন বুঝতে পারল না নুরভ, চোখ ফেরাল তুরসুনভের দিকে।

'যে পীচফলগুলো পাঠিয়েছি তোমার বাড়ীতে, ভাল ছিল তো?'

'হ্যাঁ, বউ সেগুলো দিয়ে খুব চমৎকার জ্যাম বানিয়েছে। এসো চেখে দেখবে 'খন।'

'কমিটির লোকেদের খাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। তোমার বউ খামারে গিয়ে মাংস আনুক। গাড়ী দেব।'

'চিরকুট লিখে দাও।'

তুরসুনভ নীচু হল। তার পিঠে প্যাডটা রেখে লিখল নুরভ।

ধন্যবাদ জানিয়ে চিরকুটটা নিয়ে তুরসুনভ পকেটে রাখল।

'শুনেছ, ইসখাক, খাওয়াদাওয়া হবে। তুরসুনভের বাড়ীতে সন্ধ্যা সাতটায়।' বলল নুরভ।

'আচ্ছা,' অন্যমনস্কভাবে বলল বেকভ।

হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে কম্যাণ্ডার। এখন কমিটি কারখানা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। কিন্তু গাশ্‌দিবানের বর্তমান জীবন সম্পর্কে বেকভ কিছু জানে না তাই বুঝতে পারছে না কারখানাকে যৌথখামারের সঙ্গে জুড়ে দেবার যে প্রস্তাব নুরভ করেছে তার বিকল্পে কি প্রস্তাব করবে।

‘এসব সম্বন্ধে তোমার কি মত?’ বেকভের পাশে বাক্সের ওপর বসতে বসতে সতর্ক প্রশ্ন করল নুরভ।

হতাশা জাগানো উঠোনটার দিকে তাকিয়ে রইল দু’জনেই।

‘আমাদের সবকিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই,’ বলল নুরভ। ‘লোকেরা অপেক্ষায় আছে... তোমার কোন পরিকল্পনা আছে নাকি ইসখাক?’

একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এগামভের শরীর টানটান হয়ে গেল। সব থেকে বেশী প্রত্যাশা আর দুশ্চিন্তায় ভুগছিল সে। যে গাশ্‌দিবানে কেটেছে তার যৌবন, বীরত্ব, কম্যাণ্ডারের প্রতি ভালবাসা আর বিশ্বাসেভরা দিনগুলি, সেই গাশ্‌দিবানের এমন পরিবর্তন হোক তা সে চায় না।

প্রাক্তন এডজুট্যাণ্টের আর তর সইছিল না কম্যাণ্ডারের মুখ থেকে নুরভের প্রস্তাবের থেকে আরও বেশী মানবতাপূর্ণ কোন পরিকল্পনার কথা শোনার। কত বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনাই তো ছিল কম্যাণ্ডারের মাথায়, কতবার সে গাশ্‌দিবানের প্রকল্প অদলবদল করেছে আর এগামভের মতে আরও বেশী নিখুঁত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বত্রিশ সালের সে দিনগুলি ছিল আরও অনেক বেশী কঠিন। ন্যাড়া মরুভূমিতে সবকিছু একেবারে গোড়া থেকে শুরু করার দরকার। সে পরিস্থিতি ছিল আরও হাজারগুণ বেশী কঠিন কিন্তু এগামভের কম্যাণ্ডার সসম্মানে সে পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

কিন্তু এখন কম্যাণ্ডার চুপ করে আছেন কেন? কেন তিনি দিশাহারা?

‘কম্যাণ্ডার!’ চীৎকার করে উঠল এগামভ কম্যাণ্ডারের ভেতরে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য। ‘গাশ্‌দিবানের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করার অধিকার আপনার ছাড়া আর কারুর নেই! কারুর না!’

তার বুকের ভেতরে যত কথা ফুটছিল সব সে বলে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু এমন সময় শপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কমিটির লোকেরা আর তাদের পিছনে কৌতূহলী জনতা, কমিটি এবার শেষ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এগিয়ে চলল অফিসঘরের দিকে।

‘বেকভের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই,’ কম্যাণ্ডারের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে এসে বলল নুরভ।

‘কমরেড বেকভ কি করেন?’ কমিটির প্রধান পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্নটা ধারাল ছুরির মত বিঁধে গেল প্রাক্তন এডজুট্যাণ্টের বুকে।

'কমরেড বেকভ — গাশ্‌দিবানের প্রতিষ্ঠাতা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা শুনেছি,' এমনভাবে তারা লক্ষ্য করতে লাগল বেকভকে, বোঝা গেল তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে।

এই যুবকেরা তাদের কল্পনায় গাশ্‌দিবানের প্রতিষ্ঠাতার বীরত্বপূর্ণ ও রোমান্টিক চেহারার ছবি এঁকেছিল আর তার জায়গায় এখন দেখছে এই বৃদ্ধ, অসহায় লোকটিকে।

কমিটির লোকেরা আর ঐ চারজন গাশ্‌দিবানবাসী ভ্যাপসা, হলুদ অফিসঘরটায় ঢুকে কোনরকমে নিজেদের জায়গা করে নিল।

কমিটির লোকেরা টেবিলের কাছে বসে নথিপত্র দেখতে লাগল। নানা হিসাব, আবেদনপত্র, চিঠিপত্র, নির্দেশনামা, দলিলের চার-পাঁচটা মোটা মোটা ফাইল উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। সেগুলোর পাতাগুলি জরজর হয়ে গেছে তাতে যা লেখা আছে তা খুঁজে পড়ে দেখার আর কোন মানে হয় না।

যারা কমিটির পিছনে হাঁটছিল এর আগে পর্যন্ত, তারা রয়ে গেছে উঠোনে। চারদিক থেকে অফিসঘরটা ঘিরে বসে তারা অপেক্ষা করতে লাগল কিছু শোনাবার আশায় আর মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল জানলার ভিতর দিয়ে।

মারুফও ছিল তাদের সঙ্গে। মারুফ ভাবছিল বাবা এই চিন্তাভাবনায় বিছানায় না পড়ে।

কারখানাটা বহুদিন আগেই পচে ধসে গেছে বলে অবশেষে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কমিটির লোকেরা আধঘণ্টা ধরে লোকসানের হিসাব করল। গাশ্‌দিবানের লোকেরা এত বড় টাকার অঙ্ক জীবনে কখনও শোনে নি, দুঃখে তাদের চোখ চকচক করে উঠল।

গাশ্‌দিবানকে নতুন করে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা নুরভের ছিল তা সে জানাল, অনুরোধ করল, গাশ্‌দিবানের খেটে খাওয়া লোকদের যৌথখামারে আসতে দেওয়া হোক। যখন নুরভ ড্রিলিং মেশিন কিনে মাটিতে ফুটো করে লুকিয়ে থাকা জল বের করে শুকিয়ে যাওয়া নদী গাশ্‌দিবানকা দিয়ে ছেড়ে দেবে পাইপে করে সে জল টিনের খাবার তৈরীর শপ আর মদ তৈরীর শপে গিয়ে কাজে লাগবে।

এ ঘরে যা কিছু বলা হচ্ছে এগামভ সুস্থভাবে কিছুই গ্রহণ করতে পারছিল না। কম্যাণ্ডারের অদ্ভুত ব্যবহারে ক্লান্ত, হতাশ হয়ে সে ক্রমশঃ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলছে।

কিন্তু কম্যাণ্ডারের পদবী শুনে তার যেন নতুন করে জন্ম হল:

'কম্যাণ্ডার বেকভ!' ব্যথা যন্ত্রণায় সে গুটিয়ে যাচ্ছিল যখন বেশ স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করা হল:

'গাশ্‌দিবান তৈরীর কথা প্রথম কখন আসে আপনার মনে?'

'আমি এখানে লড়াই করেছি,' মনে করতে আরম্ভ করল বেকভ। 'যখন আমরা বাসমাচদের পরাস্ত করলাম, আমি আমার সৈন্যদের বললাম: 'সেই হল আসল যোদ্ধা যে কেবল শত্রু মারতেই পারে না, গাছ বসাতেও পারে...'

গাশ্‌দিবানের লোকেরা এতক্ষণ অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে নোনাধরা দেয়ালগুলোতে ধাক্কা দিতে, ঘুষি মারতে লাগল, তারা ভুলে গেল যে ঘরটা কোনরকমে খাড়া হয়ে আছে, এমনিতেই ঘরের ছাদ থেকে চুনবালি খসে পড়ছে টেবিলে।

এগামভ ছুটে বেরোল তাদের কাছে। গাশ্‌দিবানের লোকেরা ধাক্কা দেওয়া বন্ধ করল, জিজ্ঞাসা করল তারা:

'কুলিখান, আমাদের কথা হবে কিছু?'

এগামভ হাত নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল যাতে তারা আর বোকামি না করে চুপ করে বসে, যাতে তারা জানলা খুলে দেখে আর শোনে কম্যাণ্ডার কি বলছেন আর প্রয়োজন হলে তাঁকে সমর্থন করে।

যখন সে এসে ঘরে ঢুকল, বুড়োরা ইতিমধ্যেই চুপ করে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে ঘরের মধ্যের কাণ্ডকারখানা।

'কমরেড বেকভ, এত বছর বিদেশে কাটানর পর আপনি গাশ্‌দিবানে ফিরে এলেন কি জন্য?'

এ প্রশ্নে বেকভ একেবারে চুপসে গেল, মাথা নীচু করে ভাবল সত্যিই এখানে ফিরে আসা উচিত ছিল না তার। সবকিছু আরও ভাল করে করার ক্ষমতা ও বুদ্ধি দুই-ই আছে নুরুভের। বেকভ এসে কেবল ঝামেলা বাড়িয়েছে।

এগামভের বুকটা আবার ব্যথা করে উঠল। তার মাথায় কিছুতেই আসছে না তার সাহসী বীর কম্যাণ্ডারের এমন অদ্ভুত ইতস্ততভাব কেন, আর যখন এই কমিটির সদস্যরা সবাই যুবক, জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই তাদের নেই তাই কম্যাণ্ডারের বিচার করার অধিকারও তাদের নেই।

যতক্ষণ তার ধৈর্যের বাঁধ অটুট রইল ততক্ষণ অপেক্ষা করল সে, কিন্তু — বাজ পড়ুক তোর মাথায়, কুলিখান — কম্যাণ্ডার চুপ করেই রইল, তখন এগামভ আর সহ্য করতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে কমিটিকে উদ্দেশ্য করে বলল:

'এই ভয়ংকর মরুভূমিতে কম্যাণ্ডার আর আমরা সাপ, বিছে আরও ভয়ংকর সব জীবের কামড় সহ্য করেছি! কিন্তু আমরা ভয় পাই নি, কারণ জীবনে আমরা আরও ভয়াবহ জীব দেখেছি — তা হল বাসমাচ। কি ঠিক বলছি, কমরেড নুরভ, কমরেড তুরসুনভ? আর কমিটির মহোদয়েরা, আপনারা আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন উনি ফিরে এসেছেন নিজের দেশে উষ্ণ আরামের আশায় আর নিজের সৈন্যদের পবিত্র সমাধির কাছে? আমি দুঃখে, লজ্জায় মরে যাচ্ছি!' গলা ভেঙে গেল তার। এক মুহূর্ত চুপ করে সে লক্ষ্য করল কমিটির লোকেরা চোখে অনুকম্পা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে আর ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে। দেখল জানলায় তার দেশবাসী গাশ্‌দিবানের লোকেদের মুখের দিকে, ছেলে মারুফের মুখের দিকে। মারুফ আকারে ইঙ্গিতে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। বলে চলল সে:

'মনে আছে, কম্যাণ্ডার চলে যাবার সময় বলেছিলেন: 'কুলিখান তোমার আর সব সৈন্যদের হাতে রেখে যাচ্ছি এই শহর, তোমাদেরই গড়ে তুলতে হবে এই শহর যাতে তোমরা সুখে থাকতে পার...' সেই শহর এখন কেমন হয়েছে দেখুন আপনারা! কম্যাণ্ডার বলেছেন: 'আমার ভাল লেগেছে শহর।' গাশ্‌দিবানের লোকেরা!' জানলার কাছে ছুটে গিয়ে সে তাদের হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল, কাঁধ চাপড়াতে লাগল... 'তোমরা তো তোমাদের শহরকে ভালবাস তাই না?'

অলস গাশ্‌দিবানবাসীরা, একমুহূর্ত চুপ করে ভেবে নিয়ে বলাবলি আরম্ভ করল নিজেদের মধ্যে, কমিটিকে উদ্দেশ্য করে যদিও কিছু বলল না:

'শহরটা বড় বটে... আমার জামাই কাজ করে হোটেলে।'

'তিনটে হোটেল আছে।'

'চুলকাটবার, দাড়িকামাবার জায়গা আছে। এগারটা সেলুন...'

'শহরের স্নানঘরের কথা ভুলে যেও না...'

'কেবল নদীটাই যা ভোগাচ্ছে...'

'এক কথায়,' বলে এগামভ গাশ্‌দিবানবাসীদের চুপ করতে ইঙ্গিত করল, 'সবকিছুই আছে আমাদের যা প্রয়োজন...'

কিন্তু বেকভ তাকে বাধা দিল। শক্তি সঞ্চয় করে বেকভ বলল:

'কুলিখান থাম এবার।'

ক্লান্ত চোখগুলি তার মাঝে মাঝে একেবারেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ কম্যাণ্ডার,' তাড়াতাড়ি বসে পড়ল এগামভ। 'বলুন আপনি বলুন।'

'কেন আমি ফিরে এলাম এখানে?' বলতে আরম্ভ করল বেকভ অত্যন্ত ধীরে ধীরে, একান্ত অনিচ্ছা নিয়ে। 'আপনারা আমাকে ঠিক বুঝবেন কিনা জানি না, আপনারা তো সেদিনের ছেলে... জীবনের শেষ দিনক'টা কাটাতে চেয়েছিলাম তাদের মধ্যেই যারা আমাকে মনে রেখেছে। মনে হয়েছিল, গাশ্‌দিবানই সেই জায়গা। এখানে আমার সৈন্যদের রেখে গিয়েছিলাম আমি — তাদের একজনের কথা আপনারা এখুনি শুনলেন... যতগুলি দিন আমি গাশ্‌দিবানে কাটিয়েছি, তা আর কোথাও কাটাই নি। সাত-আট মাস অন্তর অন্তরই আমাকে নতুন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হত, যে কাজ আরম্ভ করতাম, কোথাওই তা শেষ করে উঠতে পারি নি।'

চুপ করে গেল বেকভ, সবাই মাথা নীচু করে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সবাই যেন এই নিস্তব্ধতারই অপেক্ষা করছিল যাতে একটু আগে যে সব কথা বলা হল সে সম্বন্ধে ভাল করে ভেবে দেখার জন্য।

জানলার বাইরে ওরাও চুপ করে রইল। মারুফ ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

তুরসুনভ উঠে একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা পথ ছেড়ে দিল, সে গিয়ে একটা লোহার টুকরোর ওপর বসল মাথায় হাত দিয়ে।

'ইসখাক,' আস্তে করে বলল নুরভ, 'তুমি তো খালি কুলিখানের কাছেই আস নি। আমরা সবাই, আমি, তুরসুনভ, গোটা যৌথখামার তোমায় ভুলি নি কেউ, তোমায় ভালবাসি আমরাও।'

বেকভ তার কথার কোন উত্তর দিল না।

মারুফ জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে অতি কষ্টে বেকভের কাঁধ ছুঁল:

'ইসখাকচাচা, চলুন বাড়ী যাই। আর কিছু বলার দরকার নেই।'

উঠে দাঁড়াল বেকভ, এগামভ তাকে সাহায্য করল বাইরে বেরিয়ে আসতে।

যখন তারা তুরসুনভের পাশ কাটিয়ে গেল, তুরসুনভ জলে ভেজা চোখ নিয়ে তার প্রাক্তন কম্যান্ডারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

এমন সময় নুরভের গলা শোনা গেল:

'এই গাশ্‌দিবানের লোকেরা, তুরসুনভের বাড়ীতে সবার নিমন্ত্রণ! যথেষ্ট খাবার আছে সবার মত!'

'খাওয়াদাওয়া হবে কি মজা!' উঠোনে যারা ছিল তারা উল্লাসে চীৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল, বেকভের পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল। ছুটতে ছুটতে আলখাল্লার তলাটা তুলে কোমরে টান টান করে বেঁধে নিল তারা,

রাস্তার কলের থেকে পড়া গাশ্‌দিবানের হলুদরঙের জলধারার নীচে মাথা ভিজিয়ে নিতে লাগল আর হাহা হিহি করতে লাগল...

ওদিকে বেকভ, এগামভ আর মারুফ শহরের অন্ধকার গলিঘুঁজি পেরিয়ে বাড়ী চলল। প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট যতই চেষ্টা করুক না কেন আওয়াজ না করে চলতে, তার হাইবুটগুলো যেন বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যই মচমচ করে আওয়াজ তুলছিল যেন তাদের সঙ্গে আছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত চতুর্থ এক ব্যক্তি।

একটু পরেই বাড়ীর ফটকের বাইরে থেকে গাশ্‌দিবানের লোকেরা কম্যাণ্ডারকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল:

'কমরেড বেকভ! চলুন আমাদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে।'

ডাকাডাকি করল অনেকক্ষণ ধরে, কণ্ঠস্বরে ভালবাসা মমতা নিয়ে:

'আপনি না গেলে আমাদের ভাল লাগবে না...'

'আপনি যদি বলেন, আমরাও যাব না, বলুন কেবল একবার...'

'আপনি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কমরেড বেকভ। কিন্তু আমরা সত্যি সত্যি আপনার পক্ষে...'

বেকভের কানে যাচ্ছিল না গাশ্‌দিবানবাসীদের কথা। বেকভ নিজের ঘরে একা শুয়ে মাথায় ভিজে তোয়ালে চেপে ধরে ভাবছিল তার বন্ধু নুরভের কথা। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে সে, বোঝা গেল। সেই বহু পুরোন দিনের কথা মনে পড়ল বেকভের, যখন সভাপতি ভয় পেয়েছিল তাড়াতাড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে, গাশ্‌দিবান তৈরীর আগে নদীটা নিয়ে ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিল। নদীটা নিয়ে একবার একটা বেশ বড় রকমের ঝগড়াও হয়ে গিয়েছিল মনে পড়ল বেকভের, যখন সে নুরভকে সাময়িকভাবে সরিয়ে দিয়েছিল কাজ থেকে।

আর হঠাৎ স্বীকার করল সেই সত্যটা যা তার প্রাণ গত কয়েক দিন ধরে স্বীকার করতে চাচ্ছিল না কিছুতেই, যদিও যুক্তি বলছিল মেনে নিতে: 'ও তো ঠিক কথাই বলেছিল দেখা গেল... জীবনই প্রমাণ করে দিল যে এভাবে কেবলমাত্র প্রচণ্ড ইচ্ছা আর আবদার দিয়েই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করা যায় না। জ্ঞান ছাড়া, শিক্ষা ছাড়া, পরিস্থিতির বিশেষ অধ্যয়ন ছাড়া...'

কিন্তু এবারে নুরভ কি করবে?

'যাক, ওর বিরোধিতা করতে যাব না আমি,' ভাবল বেকভ, 'তা নাহলে আবার শরীর খারাপ হয়ে পড়বে...'

৪

এখন কম্যাণ্ডার একা থাকতে চায়। ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, এগামভ, মারুফ উৎকণ্ঠিত হয়ে গাশ্‌দিবানের অলিতেগলিতে তাকে খুঁজে বেড়ায়।

বেকভকে দেখতে পেয়ে, এগামভ ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি তার পেছন পেছন চলতে লাগল, বিরক্ত করতে সাহস হচ্ছে না তার। বুঝতে পারছে এগামভ, পথ হারিয়েছে কম্যাণ্ডার। দুপুরবেলা নুনে সাদা হয়ে যাওয়া বাড়ীগুলোর ধারে কাছে কেউ নেই। গাশ্‌দিবানের লোকেরা সব বাড়ীর মধ্যে বসে কল্পনায় ঝর্নার ঠাণ্ডা জল খাচ্ছে আরাম করে।

একটা বাড়ীর কাছে বেকভ দেখল একটা লম্বা লাঠির আগায় উটের মাথার খুলি লাগান, খুব মজা লাগল বেকভের। গাশ্‌দিবানের লোকেরা বিশ্বাস করে যে এইভাবে অশুভ আত্মাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল বেকভ খুলিটার দিকে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার জন্য। তারপর যেদিকে বেড়াটা ভেঙে পড়েছে সেদিকে গেল, বাড়ীগুলোকে পাশ কাটিয়ে আবার এসে পড়ল লাঠির মাথায় লাগান উটের খুলির কাছে।

মারুফও ওদিকে শহরের অন্য প্রান্ত থেকে বেকভের খোঁজে বেরিয়েছে। এগামভের ভয় হল যে মারুফ এবার বেকভের চোখে পড়ে যাবে।

বেকভকে দেখতে পেয়ে মারুফ ভাবল পালিয়ে যাবে, কিন্তু বুঝল বোকার মত পালানর দরকার নেই, তাই উল্টো দিকের বাড়ীর দেয়ালের কাছে দাঁড়াল।

'তুই এখানে কি করছিস ?'

'হাওয়া খেতে বেরোলাম একটু। চুলার কাছে এত গরম। গাশ্‌দিবানে ভ্যাপসা গন্ধ।'

'এই ভ্যাপসাভাবটা এল কোথা থেকে ?' জিজ্ঞাসা করল বেকভ রাগরাগভাবে লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে। গাশ্‌দিবানের মাটিটা এমন বিশ্রী বলে রাগ হতে লাগল তার।

'বাবা বলেন খালিপায়ে চলা লোকেদের ঘাম থেকেই এই ভ্যাপসাভাবটা... ভাল বলেছেন, তাই না ? বেশ জ্ঞান আছে আমার বাবার...'

'হ্যাঁ, লোকের সম্বন্ধে জানে সে বটে।' মন্তব্য করল বেকভ। তার পেছনে ছায়ার মত লেপটে থাকা এগামভেরও ভাল লাগল সে কথা শুনে।

আবার একটুখানি যাবার পরে মারুফ ডানদিকের বাড়ীটা দেখাল:

'ইসখাকচাচা দেখুন, প্যাঁচা...'

বেকভ থেমে চশমার কাঁচের আড়ালে চোখদুটো পিটপিট করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল একটা বাড়ীর দিকে যার ফটকের ওপরে দুটো মার্বেল পাথরের গোলা লাগান বাহারের জন্য। কম্যাণ্ডারের মনে পড়ল, ফ্রুঞ্জে* যখন বুখারার প্রাসাদ আক্রমণ করেন তখন আমীরের গোলন্দাজ বাহিনী এইরকম গোলা ছুঁড়েছিল ফ্রুঞ্জের সৈন্যদলের দিকে।

'আর এই যে বাঘের হাঁ।' পরের বাড়ীটার ফটক দেখিয়ে মারুফ বলল।

'মিল আছে,' সায় দিল বেকভ।

'এখানটা যেন একেবারে চিড়িয়াখানা,' একমনে বলে যেতে লাগল মারুফ। 'তিনশ' সাতান্নটা বাড়ী, প্রত্যেকটাই উদ্ভট উদ্ভট ভাবে তৈরী। পৃথিবীতে আর কোথাও বোধহয় এমন শহর আর নেই।'

তাদের পেছনে পা' দশেক দূরে যেতে যেতে এগামভ তাদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল আর অবাক হয়ে ভাবছিল। তার ছেলে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস লক্ষ্য করে কি করে। ঐ সব বাঘ প্যাঁচা। এগামভের চোখে তো এসব কখনও পড়ে না।

এরপর মারুফ এমন একটা কথা বলল যা শুনে তার বাবার আরও আনন্দ হল। মারুফ বলল:

'আমার জ্ঞানীবাবা ভয় পায় যে আমিও আমার দাদার মত পালিয়ে যাব বুখারাতে কাজ খুঁজতে। কিন্তু আমার এখানেই বেশী ভাল লাগে। শহরে থাকে দাদা, ঘরে ওর রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, অফিস থেকে ফিরে বসে বসে দেখে। স্ত্রী থাকে কাছেই। ছেলে এসে বসে কোলে। চারবার খায় দিনে, মাংস খায় প্রচুর। প্রচণ্ড মোটা হয়ে গেছে, মাসখানেক আগে দেখেছি ওর হাঁফের টান... সচ্ছলতা মানেই সুখ নয়, তাই না ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল বেকভ, গাশ্‌দিবানের অবস্থা দেখে সে হতাশ হয়ে গেছে। এরপর আরম্ভ হল নীচু নীচু বাড়ীর সারি, এত নীচু যে মারুফ ডিঙি মেরে দাঁড়ালেই দেখতে পায় বাড়ীগুলোর ছাতের ওপর কি আছে।

'খরমুজ শুকোচ্ছে, খুবানী...' বলল সে।

আর এগামভ তাদের পেছনে যেতে যেতে ভাবছিল মারুফ ওকথা বলেছে

---

* ফ্রুঞ্জে মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ — গৃহযুদ্ধের সময়ের সোভিয়েত সৈন্যাধ্যক্ষ — সম্পাঃ

হয়ত অমনি অমনি কম্যাণ্ডারকে আশ্বস্ত করার জন্য? গাশ্‌দিবানের ছেলেরা ভীষণ চালাক — হঠাৎ কোনদিন পালিয়ে যাবে বুখারায়, সচ্ছলতায় যে সুখ নেই তা ভুলেই যাবে।

ছেলে মানুষ করে তোলা তার পক্ষে কণ্টকর, ভাবল এগামভ।

এই সব ভাবনাচিন্তায় এগামভ লক্ষ্যই করে নি কখন গলিপথটা শেষ হয়ে গিয়ে তারা খোলা মাঠে এসে পড়েছে।

কম্যাণ্ডার পিছন ফিরে তাকে দেখে ফেলতে পারে, তাই থেমে গেল সে।

এগামভ ঠিক করল মরানদী গাশ্‌দিবানকার দিক থেকে এসে পড়বে খোলা মাঠটার দিকে।

নদীর দিকে যেতে যেতে এগামভ তখনও ভাবছিল মারুফ ঐ কথাটা কি সত্যি সত্যি মন থেকেই বলেছে।

কয়েকদিন আগে বড় ছেলে আনোয়ারকে নিয়ে তাদের ঝগড়া হয়ে গেছে।

'তুমি এমনি শিক্ষাই দিয়েছ, বাবা,' বলেছিল মারুফ। 'আনোয়ারের সঙ্গে তুমি ভীষণ খারাপ ব্যবহার করেছ, তাই জন্যই ও পালিয়েছে বুখারায়।'

'আঃ শিক্ষা!' এগামভ ছেলের হাতটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল কম্যাণ্ডারের ঘরে, তার নিশ্চিত ধারণা ছিল কম্যাণ্ডার সেখানে নেই। প্রচণ্ড রাগে চীৎকার করতে লাগল:

'দেখছিস, দেখছিস কম্যাণ্ডার কেমনভাবে থাকেন!'

টেবিলে ঘুঁষি মেরে বলল:

'এই টেবিল!'

মারুফের নাকের সামনে কম্যাণ্ডারের হাতব্যাগটা দুলিয়ে বলল:

'এই-ই সব জিনিস ওঁর!'

ছেলেটা তার হাত থেকে পালাতে চাইছে বুঝতে পেরে তাকে ঠেলতে থাকে দেয়ালের দিকে।

তারপর আলো জেলে বেকভকে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখে থতমত খেয়ে যায় এগামভ।

'এই তো কম্যাণ্ডার এখানেই আছেন,' বলল এগামভ। 'ভগবানের দোহাই, কিছু মনে করবেন না। এই মাথামোটা ছেলেটাকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।'

বেকভ উঠে বসে প্রতিবাদ করবে ভাবল, এগামভ সব সময় ছেলের সামনে তাকে তুলে ধরে আদর্শ হিসাবে, এতে তার বিরক্তি লাগে। কিন্তু

কিছু না বলে সে বাধ্য ছেলের মত দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলল।

মারুফ টেবিলে হাত রেখে বসে রইল, সে বুঝতে পারছিল বেকভের অবস্থা, মায়া লাগল তার জন্য।

আর তার বাবা নিজেকে সংবরণ করছে যাতে চীৎকার না করে ওঠে।

'শুনছিস রে নিষ্কর্মার ধাড়ী,' বলে চলল সে, 'বুখারার সব থেকে ভাল আমীরের প্রাসাদও কম্যাণ্ডারের মত এমন লোকের থাকার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তোর বা তোর ভাইয়ের মত হামবড়া নন কম্যাণ্ডার। তোরা মনে করিস, কম্যাণ্ডার কি গাড়ী, টেলিভিশন কেনার মত টাকা রোজগার করেন নি — ভাবলেও হাসি পায় !'

'ইসখাকচাচাকে ঘুমোতে দিচ্ছি না আমরা।' আস্তে করে বলল মারুফ।

চলে যাবে বলে উঠল এগামভ, কিন্তু ভাবল যে কম্যাণ্ডারের অনুপস্থিতিতে এই সব কথার গুরুত্ব এতটা থাকবে না।

'কিন্তু কম্যাণ্ডার আর তাঁর অধীন সব সৈন্যরা কেউ স্বাচ্ছল্যের কথা ভাবে নি, ভেবেছে কেবল অন্যের সুখের কথা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসবই আমি জানি বাবা।' রেগে গেলে মারুফের মুখে সব সময়ই একটা বিদ্রূপের হাসি দেখা দেয়।

কথা বলতে বলতে এগামভ কিন্তু কম্যাণ্ডারের থেকে চোখ সরাচ্ছিল না, তার ভয় হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে কম্যাণ্ডার উঠে এর প্রতিবাদ করবে। বিনয়ী লোক কম্যাণ্ডার, সম্মান প্রশংসা এসবে অস্বস্তি বোধ করেন তিনি।

কিন্তু প্রাক্তন এডজুট্যাণ্ট যে সব কথা বলছিল, তা সত্যি, মনটা পরিষ্কার করে দেয় সে সব কথা। এগামভের মনে এত বিষ জমে উঠেছে, গাশ্-দিবানে এই ছল, চাতুরী, ফাটকাবাজির মধ্যে। সে অপেক্ষা করেছে কম্যাণ্ডারের ফিরে আসার, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তায়, তাঁর সম্বন্ধে কথা বলার মধ্যে দিয়ে তার মনটা পরিষ্কার হয়ে যায়, সেই সততা, দয়া আর নির্ভীকতার উৎসে যাতে ডুব দেওয়া যায়...

এগামভ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠল:

'তোরা লোকদের জন্য কি করেছিস ? বিবেক আছে তোদের ?'

ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিল এগামভ। দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক কম্যাণ্ডারের বিছানার কাছে।

বেকভ সেই একভাবেই শুয়েছিল চুপ করে। ছোটখাট মানুষটি, শক্ত

মরচে পড়া খাটটির আধখানামাত্র দখল করেছে তার দেহ। এগামভ যেই বসল খাটে সেটা বিশ্রীভাবে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল।

'কিছু মনে করবেন না, কম্যাণ্ডার,' করুণ স্বরে বলল সে। 'ছেলেটাকে নিয়ে পাগল হয়ে গেলাম একেবারে। আমার ছেলেগুলোর গায়েও গাশ্‌দিবানের হাওয়া লেগেছে দেখে কান্না পাচ্ছে...'

কম্যাণ্ডারের কথা বলার ইচ্ছা নেই দেখে এগামভ মাফ চাইতে চাইতে হতাশ মন নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ভাবল বাগানে গিয়ে বসবে খানিক যাতে মনটা সুস্থির হয়।

এখন ঘুরপথে খোলা মাঠে বেকভ আর মারুফের কাছে গিয়ে পড়ার সময় এগামভ কারখানার কাছে এসে পড়ল।

কমিটির সিদ্ধান্তে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এক সপ্তাহ হল। দুটি শপেরই জানলা দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা কিছু দামী জিনিস উঠোনে পড়েছিল নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ইলেকট্রিকের তারগুলো কেটে দেওয়া হয়েছে।

ভাবা হয়েছিল: আর কিছু নেবার মত নেই এখানে। কিন্তু গাশ্‌দিবানের লোকেরা একটা ছোটখাট ভাণ্ডার আবিষ্কার করছে, যেটার কথা তাড়াহুড়োয় ভুলে গিয়েছে কমিটি, লিস্টে লেখা হয় নি সে কথা; সেটার দরজা ভেঙে তার ভেতর থেকে গাশ্‌দিবানের লোকেরা বাক্সের পর বাক্স বের করে নিয়ে যেতে লাগল।

আনন্দে মত্ত হয়ে আলখাল্লার নীচে ঢেকে নিয়ে তারা সেগুলিকে যে যার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে। ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি করছে, বাক্সগুলো এর ফলে পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে, সেগুলোকে মাড়িয়েই চলে যাচ্ছে কেউ।

এইসব দেখে এগামভ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ছুটোছুটি চলছে যেন তারই দেহের ওপর দিয়ে, আর কম্যাণ্ডারের পবিত্র দেহের ওপর দিয়েও।

'দাঁড়া!' গুদামের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের দিকে দৌড়ে গেল এগামভ। 'কম্যাণ্ডার এখনও মরেন নি!'

লোকটি একটুও আশা করে নি যে এগামভকে দেখবে, তার হাত থেকে বাক্সটা পড়ে গেল, সে বসে পড়ল। এগামভ তার দাড়ি ধরে টান দিল, তার আলখাল্লার বুকের কাছটা ছিঁড়ে দিল — এমনি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল সে।

'আমরা রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছি, আর তোমরা কেবল পার চুরি, ডাকাতি করতে !'

লোকগুলি কোন কথা না বলে ফিরে এসে আবার গুদামে রেখে যেতে লাগল বাক্সগুলি।

কে যেন ভীরু স্বরে বলল:

'আমাদের মাফ করে দিন, কুলিখানচাচা...'

চলে যেতে যেতে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল:

'আমরা ভেবেছিলাম কম্যাণ্ডার বেকভ আসবেন... এসে পেঁছিলেন আর উল্টো হল, সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হল।'

'উনি কেমন যেন ক্লান্ত, উদাসীন। এমন লোকের পক্ষে বেশী কিছু দায়িত্ব মাথায় নেওয়া সম্ভব নয়।'

'তাছাড়া, ওঁর পরিবারও নেই। সন্তানহীন মানুষ নিষ্ফল গাছের মতই।'

'নামটাও কেমন অদ্ভুত। খুব কম লোকেরই অমন নাম শোনা যায়...'

'যাক, এখন ভরসা সভাপতি নুরভ। শুনছি, সে নাকি আমাদের সাহায্য করতে চায়...'

'হ্যাঁ রাখ ভরসা ওর ওপর !' ভাবল এগামভ তাদের পিছনে ছুটে গিয়ে বলে, কিন্তু বেকভ আর মারুফের কথা মনে পড়ায় গেল না শেষ পর্যন্ত।

এগামভ দেখল বেকভ আর মারুফ ইতিমধ্যে ফিরে চলেছে বাড়ীর দিকে। কম্যাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল আধঘণ্টা আগে বলা বুড়োদের কথাগুলো। হ্যাঁ, বেকভের চেহারাটা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। গত ক'দিন ধরে বড় বেশী কাশছে, রক্ত ওঠান কাশিটা তার শরীরের সব শক্তি খেয়ে নিচ্ছে ক্রমশঃ।

গতকাল এগামভ টেবিলে কম্যাণ্ডারের হাতটা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

'মরা লোকের হাত,' এই ভয়ঙ্কর কথাটা খেলে গিয়েছিল তার মাথায়, তারপরে সারারাত সেকথাটা মাথা থেকে তাড়াতে চেষ্টা করেছে।

'জানেন,' বলে চলল মারুফ, 'প্রথম প্রথম আপনার সঙ্গে খুব সতর্কভাবে কথা বলতাম। বাবা আপনাকে একেবারে ভগবান বানিয়ে ফেলেছে, আমার ভাল লাগত না ব্যাপারটা। আপনি আর সবারই মতন মানুষ। আপনারও

দুঃখকষ্ট আছে। আপনি মোটেই ভগবান নন। আর আমার ঈর্ষা হয়ে আপনার প্রতি।'

'ঈর্ষা ?' সতর্ক প্রশ্ন করল বেকভ।

'আমি জানি না আমার ভবিষ্যতে কি আছে। আর আপনি সে পথ পেরিয়ে এসেছেন, ভালভাবেই পেরিয়ে এসেছেন। শত্রুর বিনাশ করেছেন। আপনি আর নুরভ মিলে অমন চমৎকার যৌথখামারটা গড়ে তুলেছেন — ঠাট্টা নয়!.. আমি অনেক ভেবেছি ইসখাকচাচা আপনার কথা, আপনার জীবনের কথা। অনেক কিছুই বুঝি না আমি। কিন্তু একটা কথাই কেবল বুঝি পৃথিবীটা বড় কঠিন জায়গা...'

'ঠিক,' সায় দিল বেকভ। এই ছেলেটির অকপটতা তাকে বশ করে ফেলেছে, 'যত দিন যাচ্ছে, একথা বেশী করেই বুঝছি আমি।'

'আমি যে আপনাকে বলছিলাম দাদার কথা। আমি মনে করি, ও ভীরুর মত পালিয়ে গেছে এখান থেকে। আর আমি এখানে থেকে গাশ্‌দিবানের লোকদের সাহায্য করতে চাই। আমার বিশ্বাস, এখানে সবকিছুই বদলে যাবে। সভাপতি নুরভের ওপরও আমি আশা রাখি, আর...' বলে চলল মারুফ, 'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি এজন্য যে আপনি সোজাসুজি কথা বলতে ভয় পান না। ইসখাকচাচা, আপনাদের মত লোকেদের আমাদের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলা ভীষণ দরকার। আমরা আপনাদের সন্তান, আমাদের থাকতে হবে গাশ্‌দিবানে। বাবা কিন্তু একথাটা বুঝতে পারেন না।'

উদ্বেগ নিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল এগামভ। অনেক কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। কিন্তু মারুফ ভগবান নিয়ে যে সব কথা বলছিল তাতে তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।

'যে ছেলের জন্ম আমি দিয়েছি সে হয়ত ভগবান সম্পর্কে আমার থেকে বেশীই জানে,' ভাবল এগামভ, 'কিন্তু আমি ওর বাবা, আমার ধারণা অন্যরকম। মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন ভগবানের। দয়ালু, সাহসী ভগবান, সেই ভগবান হলেন কম্যাণ্ডার, আর তিনিই পিতার মত। যদি সেই ভগবান না থাকে তো মানুষ বুদ্ধিহীন, একাকী জীবন যাপন করে।'

সেই অনেক দিন আগে যখন এগামভ সৈন্যদলে যোগ দেয়, সে মন থেকে তাড়িয়ে দেয় সেই মিথ্যা ভগবানকে, ধর্মবিশ্বাস যার কথা বলে। তখন থেকেই সে কম্যাণ্ডারকে ভালবাসতে আরম্ভ করল, কারণ তার ধারণা ছিল ওইরকম হতে পারলেই সে জনহিতকর কাজ করতে পারবে।

মারুফ আর বেকভ গল্প করতে করতে চলছিল রাস্তা দিয়ে।

অন্ধকার হয়ে এলো। এগামভের ফটকের কাছে অপেক্ষা করে থাকা নুরভ আর তুরসুনভকে গাড়ীর আলোটা জ্বালাতে হল তাদের দেখতে পাবার জন্য।

'ইসখাক,' বেকভকে আস্তে করে ডাকল তুরসুনভ।

তাদের কথাবার্তায় বাধা দেবে না বলে নুরভ গাড়ীতেই বসে রইল।

তুরসুনভের দিকে তাকাল বেকভ, প্রথমটা বুঝতে পারল না কে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

'বিদায় নিতে এলাম।' বলল তুরসুনভ।

'চলে যাচ্ছ?' বেকভের গলাটা একটু কেঁপে গেল।

'হ্যাঁ। নুরভের ওখানে জমাখরচ লেখার কাজ করব।' মনে রাগ নিয়ে তাড়াতাড়ি করে কথা বলছিল তুরসুনভ। 'অবসর নিতে আর একটা বছর বাকী আছে, কোথাও একটা কাজ করতেই হবে এ ক'টা দিন। ছেলেটা বড় হচ্ছে।'

নীচু হয়ে বেকভের দিকে ঝুঁকে তুরসুনভ বলতে লাগল, মনে হল যেন সে চাইছে যে বেকভ তাকে সমর্থন করুক।

'যখন গাশ্দিবানকে যৌথখামারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে, তখন এখানে টিনের খাবার তৈরীর কাজ আরম্ভ করতে চায় নুরভ। কতবার বললাম, আমাকে এখানেই রেখে দিক ডিরেকটর হিসেবে কিন্তু শয়তান কি বোঝে কারুর মনের কথা? নুরভ বলল: "আমার দরকার কাজজানা লোক — আগে তুমি কি করেছ না করেছ তা আমার দেখার দরকার নেই!" হ্যাঁ, বলল একথাই! তার মানে আমরা আর কোন কাজেরই যোগ্য নই...' তারপর অন্য সুরে নুরভকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, 'ইসখাক তুমিও তো চলে আসতে পার নুরভের কাছে, ওখানে বেশ ভালই থাকব আমরা।'

'বিদায়!' তাড়াতাড়ি করে বলে বেকভ হাত বাড়িয়ে দিল।

তুরসুনভ দু'হাতে চেপে ধরল হাতটা, বন্ধুকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হল, কিন্তু বেকভ ফটক খুলে ভেতরে চলে গেল, তুরসুনভ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল...

৫

অনেকক্ষণ শুয়ে রইল বেকভ বিছানায়। তারপর কি যেন গোলমাল চেঁচামেচি শুনে উঠে বসল সে। খুব কাছেই কোথায় যেন অনেক লোক হৈচৈ চেঁচামেচি করছে। বেকভ বাইরে বেরনো মাত্রই হৈচৈ থেমে গেল।

প্রথমটায় সে কিছুই বুঝল না, দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল দেয়াল বরাবর বিরাট বিরাট আকারের অক্ষরগুলোর দিকে। লোকেরা বসে আছে ঐ দেয়ালের কাছে।

তারপরে অনেক কষ্টে বুঝল যে অক্ষরগুলো লেখা আছে আসলে টিনের আর পিজবোর্ডের সাইনবোর্ডের ওপর — "সেলুন", "স্টোভ সারাই", "গাড়ী সারাই", "চাখানা"...

লোকেরা এই সাইনবোর্ডগুলো সামনে ধরে চুপ করে বসেছিল আর যেই বেকভ রাস্তা পার হয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল একজন লোক ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল বেকভের দিকে। ঘোড়াটাকে এমনভাবে ঘোরাল যাতে বেকভের সুবিধা হয় ঘোড়ায় উঠতে আর এগামভের . হাতে ধরিয়ে দিল লাগামটা।

বেকভ ঘোড়ায় উঠতে লাগল, সাহায্যের জন্য ছুটে আসা এগামভকে সরিয়ে দিল সে।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল এগামভ যে কিছু একটা কারসাজি আছে। বুড়োদের ভীষণ রাগ বেকভের ওপরে, এখন তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে চায়।

বেকভ শেষ পর্যন্ত উঠে বসল ঘোড়ায়, কিন্তু ঘোড়াটা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, নড়তে চাচ্ছে না।

এগামভ লাগামে টান দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল, হতাশভাবে হাত নাড়তে নাড়তে, ঘোড়াটাকে টানতে আরম্ভ করল কারণ ঐ বুড়োগুলোর সামনে তার লজ্জা হচ্ছে কম্যাণ্ডারের জন্য।

লোকেরাও উঠে সাইনবোর্ডগুলোকে ঢালের মত করে সামনে বাগিয়ে ধরে বেকভের পেছন পেছন চলল। তার চোখের সামনে যা পড়ল তা এমন দুর্বোধ্য...

যে বড় রাস্তাটায় গতকালও লোকেরা কাজে ব্যস্ত ছিল — কামার হাপর টানছিল, নাপিত চুল কাটছিল, রুটি তৈরীর কারখানায় রুটি তৈরী হচ্ছিল, ফিটার মিস্ত্রী স্টোভ সারাচ্ছিল — আজ সেখানে মৃত্যুর স্তব্ধতা।

দোকানপাটগুলির দরজা জানলাগুলো তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে চিরকালের মত, আর দেয়ালে দেয়ালে লেখা রয়েছে ভয়ংকর একটা কথা "বন্ধ"।

বুড়োরা ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি আরম্ভ করে দিল, ঘোড়ায় চড়া বেকভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দল বেঁধে যেন সে আকাশ থেকে প্রেরিত দূত অত্যাচারিতদের সাহায্য করবার জন্য এসেছে।

এই ক'দিন ধরে এমন সব ঘটনা ঘটছে...

'কম্যাণ্ডার, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। বুঝিয়ে বলুন, ভগবানের দোহাই!'

একটা বাড়ীর কাছে থেকে গিয়েছিল একটা সাইনবোর্ড "এক মিনিটে ফটো", বেকভ সেখানে ঘোড়া থামাল। বুড়োরা তাকে পেরিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, জানলার রকটার ওপর লাফালাফি করতে লাগল। কয়েকজন জানলা গলে ভেতরে ঢুকে গেল।

ফটোগ্রাফলাগানো একটা প্লাইউডের বোর্ড টেনে বার করল, ছুঁড়ে দিল যারা বাইরে ছিল তাদের পায়ের কাছে, তারা সেগুলো ছিঁড়তে লাগল, আলখাল্লার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

একটু দূরে গাছের নীচে রাখা ছিল সাইনবোর্ডগুলো, সেগুলোর মালিকরা তখনও সেগুলো নিয়ে যেতে পারে নি।

পেন্সিল আর প্যাড হাতে নিয়ে ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে গুণছে একজন লোক দেখে মনে হয় সরকারপক্ষের লোক।

বেকভ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিনের ওপর সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল এ সব কি হচ্ছে।

'অন্তুত এই গাশ্‌দিবানের লোকেরা,' মাথা না তুলেই ঘোড়ার ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল। 'সাইনবোর্ডটা নিয়ে ছুটোছুটি করলেই ভাবছে দোকান বন্ধ করার আদেশ ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'

'কি হচ্ছে এসব?' প্রচণ্ড রেগে গেছে এগামভ বেকভের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি বলে।

'কমিটির এই নতুন সিদ্ধান্ত এখন আর কেউ রদ করতে পারবে না। গাশ্‌দিবানকে পাকাপাকিভাবে নুরভের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে... আর আমাকে যৌথখামারে একটা অন্য কাজ দেওয়া হয়েছে। জমাখরচ হিসাবের কাজ... আমি করব জমাখরচ হিসাব রাখার কাজ... নিজেই বোঝেন... আগে ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে কাজ করতাম, এখন বলা হচ্ছে যে জমাখরচ হিসাবের কাজের উন্নতি করা দরকার...'

গ্রাম কমিটির ঐ লোকটি প্রলাপ বকছে যেন, এগামভ বলল:

'ছেড়ে দিন কম্যাণ্ডার, এ একটা ফালতু লোক...'

বেকভের ঘোড়াটা চিঁহি করে পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে গলির মধ্যে দিয়ে দৌড় লাগাল।

এগামভও ধাওয়া করল বেকভের পিছনে, এত আনন্দ হচ্ছে তার— কম্যাণ্ডারকে আবার ঘোড়ায় চেপে ছুটতে দেখে।

'কম্যাণ্ডার,' ফিসফিস করে বলল এগামভ, 'আমি আপনার সঙ্গেই যেন মরি। আমাকে গাশ্দিবানে একা ফেলে রেখে যাবেন না, আপনার পায়ে পড়ি...'

ভোরবেলায় কম্যাণ্ডার স্মারকস্তম্ভের চত্বরের দিকে রওনা দিল শহরে যাবার বাস ধরার জন্য। কম্যাণ্ডারকে একা থাকতে না দেওয়ার জন্য এগামভও চুপিচুপি চলল তার পিছনে, দেখল বেকভ বাসে উঠল। এগামভ শহরের দিকে যাওয়া একটা গাড়ীতে উঠে বাসটাকে ধরে ফেলল। মনে হচ্ছিল যেন বাসটা কোনদিনই বুখারা গিয়ে পেঁছিবে না এমন ক্যাঁচক্যাঁচ ঝরঝর করছিল সেটা। সামনের দিকে বসেছিল বেকভ, মাথা নীচু করে নিজের এডজুট্যাণ্টকে লক্ষ্য করে নি সে।

শহরে যাবার গোটা রাস্তাটাই এগামভের পরিচিত, পরিচিত প্রতিটি ঢিপি। বাসমাচগুলো ঐ ন্যাড়া ন্যাড়া ঢিপিগুলো বেয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, আর বেকভের দলের সৈন্যরা তাদের পিছন দিকে গুলি করছিল, তাদের মরাদেহগুলো গড়িয়ে পড়ছিল নীচে।

এগামভ ভাল করেই জানে যে এখানে একটু বেশী খুঁড়লেই হাড়গোড় বেরিয়ে পড়বে।

মরা লোকগুলোকে দেখে কখনই তার কিছু মনে হয় নি, কারণ ওরা শত্রু কিন্তু আজ কেন কে জানে বুকটা টনটন করে উঠল। না, ওদের জন্য মায়া নয়। তার মনে হল সে নিজে বা তার অত্যন্ত প্রিয় আর কেউ মৃত্যুর মুখোমুখি, তাই আজ সে এমনভাবে অনুভব করছে মৃত্যু, সেই তাদের যাদের সে হত্যা করেছে...

যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!.. বারবার নিজেকে বলল এগামভ। কম্যাণ্ডারের যত্ন নিতে হবে, সান্ত্বনা দিতে হবে, ঘুমোবার সময় কাছে বসে থাকতে হবে, পাগুলো ভাল করে ঢেকে দিতে হবে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। এমনি সেবা করতে চায় এগামভ, যদিও কম্যাণ্ডারকে সক্রিয় দেখলে তার খুবই আনন্দ হয়। কম্যাণ্ডারকে সে থুরথুরে বুড়ো, চাখানা বা চত্বরের বেঞ্চিতে বসে বকবক করছে এভাবে কল্পনা করতে পারে না, ভাবতে পারে না তাদের একজন বলে যারা কেবল আজকের দিনটা নিয়েই বাঁচে, জীবন মৃত্যু সব কিছু সম্পর্কেই তারা উদাসীন।

না, তার কম্যাণ্ডার এমন নন বলেই তিনি সম্মানের যোগ্য।

প্রচণ্ড গুমোট গরমে চত্বরটা আর স্টেশনের গোটা বাড়ীটা এমন তেতে উঠেছে যে এগামভের চোখমাথা ঝাঁঝাঁ করছে। গাড়ী থেকে নামবার সময় এগামভের পাগুলো আর বশ মানছিল না, সে একটা চাঁদোয়ার নীচে গিয়ে বসল বেকভের অপেক্ষা করার জন্য।

কে একজন পরিচিত লোক, গাশ্‌দিবানের না যৌথখামারের কে জানে, এগামভকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল টেনে টেনে, 'তোমার এ কি চেহারা কুলিখান — রোগা, ফ্যাকাশে, পিঠ কুঁজো, গালবসা, চোখগুলোয় জেল্লা নেই, কখনও তো তোমায় এমন দেখি নি!

তাকে হঠিয়ে দিল এগামভ, কিন্তু তারপর আরও একজনের সঙ্গে দেখা হল, সেও সহানুভূতি জানাল। লোকটি বলল:

'নুরভের হাতে এবার সবকিছু ভালভাবে চলবে।'

'দাঁড়াও, তুমি কোথাকার লোক?' জিজ্ঞাসা করল এগামভ।

জানা গেল, সে গাশ্‌দিবানের লোক।

'হ্যাঁ,' বলল এগামভ। 'সত্যিই তোমাদের কিছুই এসে যায় না।'

বলল শান্তভাবেই, গালাগালি ছাড়াই, হঠাৎ বুঝল ভীষণ ক্লান্ত সে, এসব কিছুই ভাল লাগছে না আর, কম্যাণ্ডার যদি বেঁচে থাকেন, তাঁর সঙ্গে চলে যাবে এই সব হাঙ্গামা, কমিটি, খামার গাশ্‌দিবান, এই সব সমস্যা যার কোনো শেষ নেই, এ সবের থেকে অনেক দূরে, মাঠের মধ্যে গাছপালার মধ্যে, শান্তিতে নিঃশ্বাস নিয়ে, বাঁচতে। অন্যেরা এখন মাথা খাটাক, তৈরী করুক লড়াই করুক, আর তারা বাঁচবে স্মৃতি নিয়ে, চমৎকার, স্বচ্ছ আর কল্পনাময় সব স্মৃতি। তার আর কম্যাণ্ডারের এ অধিকার আছে, তারা এত করেছে, মানুষের একটা জীবনে যা করা সম্ভব তার থেকে বেশীই করেছে। ক্ষুধায়, শীতে কষ্ট পেয়েছে, যুদ্ধের সময় তাদের মেরেছে, গুলি চলেছে তাদের ওপর, ক্ষত আর ঘায়ে ভরে গেছে তাদের দেহ, মুখ, হাত কাটা পড়েছে...

'তুমি এখানে কি করছ?' পিছন দিক থেকে বেকভের গলা শুনল সে।

'কম্যাণ্ডার!' মুখে বিস্ময়ের ভাব নিয়ে চীৎকার করে উঠল এগামভ। 'আপনিও এসেছেন?.. কেমন যেন মনে হল শহরে যাই একবার...'

'শোন?!' হঠাৎ ভীষণ রেগে বেকভ বলল। 'যথেষ্ট হয়েছে! তোমার গার্জেনিতে ঘেন্না ধরে গেছে আমার!'

'আপনার শরীর যে খারাপ, কম্যাণ্ডার। আপনার একা থাকা উচিত নয়। আপনি আমার ওপর রাগ করলে মরে যাব আমি। ঐ হতচ্ছাড়া

কারখানাটা! সবকিছু এমন চমৎকার ছিল যখন আপনি এলেন, আমি এত সুখী ছিলাম! কিন্তু আমার সুখের ওপর যেন সাপের নজর লেগেছে। আপনি যেন কি কারণে অভিমান করেছেন আমার ওপর, খুব কমই কথা বলেন আমার সঙ্গে। আমার এমন কষ্ট হচ্ছে... এত বছর ধরে অপেক্ষা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি আপনি ফিরে আসবেন আর যৌবন ফিরে পাব আমি। কত কষ্ট দিয়েছে আমায় সবাই, আপনি যদি জানতেন কম্যাণ্ডার, হাসাহাসি করেছে আমায় নিয়ে, বুকটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে...' বলেই চলেছিল এগামভ, তার চারপাশে লোক জড় হয়ে যে শুনছে তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। তার বুকের মধ্যে রক্ত ঝরছে যেন, ব্যথায়, কষ্টে, সহানুভূতি আর ভালবাসায়।

শান্ত করার জন্য তাকে জড়িয়ে ধরে বেকভ বলতে লাগল: 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

এগামভ তার বুকে মুখ গুঁজল, সবকিছু থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল তার, ইচ্ছে হল যাতে কম্যাণ্ডার সবসময় তার কাছে কাছে থাকেন।

এক গেলাস ঠাণ্ডা জল কে যেন এগিয়ে দিল তার দিকে, অনেকক্ষণ ধরে খেতে পারছিল না সে, এমন কাঁপছিল তার ঠোঁটগুলো। জলটা খেয়ে একটু শান্ত হলে পর সে আর কম্যাণ্ডার আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

'এখানকার লোকদের ভাল লাগে না আমার।' বলল এগামভ। 'অপরিচিত। কেউ সালাম জানায় না।'

যখন তারা বড় রাস্তায় এসে পড়ল হঠাৎ মনে পড়ল বড় ছেলে আনোয়ারের কথা, মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল তার।

'না, যাব না ওর কাছে। কে বয়সে বড়, ও না আমি?'

দাঁড়িয়ে পড়ল বেকভ।

'কার কথা বলছ?'

'যদি আমি আনোয়ারের কাছে যাই, ও ভাববে বাবা ওকে ক্ষমা করে দিয়েছে। ওকে আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারব না গাশ্‌দিবান ছেড়ে চলে যাবার জন্য।'

'আমি হলে যেতাম... সব থেকে খারাপ ছেলেটার কাছেও যেতাম।'

'আপনার ছেলে নিশ্চয়ই এমন নিষ্কর্মা হত না কম্যাণ্ডার! সে নিশ্চয়ই আপনার উপযুক্ত ছেলেই হত!'

কোন উত্তর দিল না বেকভ। ভীষণ ঝুঁকে পড়ে চলতে লাগল।

এমন সময় এগামভের চোখে পড়ল সেই পরিচিত বাড়ীটি। প্রাদেশিক পার্টি কমিটির অফিস... ঐ গাড়ীগুলো, ফটক, পতাকাগুলো, প্রধান প্রবেশদ্বারের ওপরে প্রতীকচিহ্নটা — এসব কিছু দেখে এগামভের দেহটা আপনা থেকেই টানটান হয়ে গেল।

'কম্যাণ্ডার, সে রাতে এখানে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আর এইখানে মিলিশিয়ার লোকটা দাঁড়িয়েছিল, বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু পাহারাদারটাকে বেরিয়ে আসতে দেখে তখুনি চুপ করে গেল...

মিলিশিয়ার লোকটি জানাল যে সম্পাদক মার্ভালিয়ানভের মিটিং আছে, তারা অপেক্ষা করতে লাগল। প্রথমে তারা পায়চারী করতে লাগল গ্রানাইট পাথরের সিঁড়ির ধাপগুলিতে, কিন্তু দেখা গেল ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে, ব্যস্তভাবে যাতায়াত করতে গিয়ে লোকেরা তাদের ধাক্কা দিচ্ছে।

মিলিশিয়ার লোকটি বলল:

'যেদিন উনি সবার সঙ্গে দেখা করেন সেদিন এলেই ভাল হয়।'

তারা সেখান থেকে চলে গিয়ে চত্বরে এসে বসল। চুপ করে রইল দু'জনেই। সেই বহু বছর আগে সবকিছু যেমন ছিল, এখন আর তেমনটি নেই।

এগামভের মনে পড়ল, তখন প্রাদেশিক কমিটির প্রত্যেকেই বেকভকে গ্রহণ করত হাসিমুখে। এমন কি, যদি মিটিংও চলতে থাকত তো যুবক মার্ভালিয়ানভ বেরিয়ে এসে কম্যাণ্ডারকে অভ্যর্থনা জানাত, ঘরে বসাত, চা খাওয়াত, বেকভ রাজী হলে তাকে নিয়েই মিটিংএ যেত। যদি এমন কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত যার সঙ্গে গাশ্‌দিবানের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলেও তাকে কিছু বলতে অনুরোধ করত আর মিটিংএ উপস্থিত সবাইকে বলত কম্যাণ্ডারের উপদেশ মন দিয়ে শুনতে, তার বুদ্ধি, জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাকে খুব মূল্য দিত মার্ভালিয়ানভ।

এককথায় প্রাদেশিক কমিটির দরজা বেকভের জন্য সবসময় খোলা ছিল। তাই বেকভ যে কোন সময় কোন খবর না দিয়েই চলে আসত সম্পাদকের কাছে।

যতক্ষণ তারা অপেক্ষা করছিল এগামভ কয়েকবার চা এনে খাইয়েছে কম্যাণ্ডারকে। তারপর বেকভ ঠাণ্ডা জল চাইল। এগামভ তাকে অনেক বোঝাল যে ঠাণ্ডা লেগে যাবে কিন্তু বেকভের ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে।

... যখন মার্ভালিয়ানভ বেরিয়ে এল বেকভ হতভম্ব ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কুর্তাটা টেনেটুনে ঠিক করে নিয়ে গাড়ীর কাছে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে ইতিমধ্যেই বসা সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে বলল:

'শুভসন্ধ্যা কমরেড মার্ভালিয়ানভ... আমি বেকভ।'

ক্লান্ত লাল চোখে মার্ভালিয়ানভ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বেকভের দিকে।

'আপনি আমার কাছে?'

একথায় বেকভের মুখচোখের চেহারা পাল্টে গেল, জোরে কেশে উঠে সে গাড়ীর দরজাটা আঁকড়ে ধরল।

'চিনলেন না আমাকে?..'

আরও একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল মার্ভালিয়ানভ; মাথা নাড়ল চিনতে পারে নি, একটু অস্বস্তি বোধ করল সে।

ড্রাইভার ধৈর্য হারিয়ে হর্ণ বাজাল।

'আমি বেকভ... গাশ্‌দিবান থেকে আসছি।'

'ও, গাশ্‌দিবান থেকে! নুরভের কাছ থেকে।' আশ্বস্ত হয়ে বলল মার্ভালিয়ানভ আর ভাবল সোজাসুজি সেকথা বললেই পারত, এতক্ষণ ধরে সেকথা বোঝাতে হয় নাকি? 'বলবেন যে গাশ্‌দিবানের ব্যাপারটা অর্থনৈতিক কমিটি বিচার করে দেখছে, কিন্তু এখনও কতকগুলি ছোটখাট ব্যাপার...' বেকভের মুখেচোখে একটা অদ্ভুত ভাব দেখে থেমে গেল মার্ভালিয়ানভ।

'মাফ করবেন, আপনি অন্য কোন ব্যাপারে নাকি?'

'এই ব্যাপারটাই। গাশ্‌দিবানের,' হঠাৎ সব আগ্রহ হারিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল বেকভ।

'তার মানে নুরভের থেকে আলাদাভাবে। তাই তো?.. তাহলে এক কাজ করা যাক: কাল সকাল ন'টায় আমার কাছে আসুন। আজ মিটিংএর পরে ভীষণ ক্লান্ত আমি।'

সম্পাদক কি বলছে তা শুনবার জন্য এগামভ এগিয়ে এল গাড়ীর দিকে, তা লক্ষ্য করল মার্ভালিয়ানভ।

'আপনারা দু'জন?' জিজ্ঞাসা করল সে।

'হ্যাঁ, কমরেড...' ভয়ে ভয়ে বলল এগামভ।

'তাহলে চলুন।' গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল সে। 'দু'জন অপেক্ষা করবে না একজনের জন্য...'

পার্টি কমিটি অফিসের দিকে যেতে যেতে মাভলিয়ানভ বলল:

'আপনারা এসে ভালই করেছেন। নুরভ বলছিল যে গাশ্‌দিবানের লোকদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি যৌথখামারের সঙ্গে শহর জুড়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। হয়ত সত্যিই এদের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। আপনারা বলুন কি বলতে চান।'

থতমত খেয়ে গেল এগামভ, লক্ষ্যই করে নি কখন বেকভ পিছনে পড়ে গেছে। মিটিং ভাঙার পরে পার্টি কমিটির অফিস থেকে বেরিয়ে আসা লোকের স্রোতের পিছনে পড়ে গেছে।

'কমরেড,' বেকভকে দেখিয়ে করুণস্বরে বলল এগামভ।

মাভলিয়ানভ সব থেকে উঁচু ধাপটার ওপর উঠে হাতে ফাইল ধরা লোকগুলিকে উদ্দেশ্য করে বলল:

'কমরেড! গাশ্‌দিবানের ঐ লোকটিকে আসতে দিন... হ্যাঁ হ্যাঁ, কুর্তাপরা ওনাকেই।'

আদেশ বুঝে লোকেরা পথ ছেড়ে দিল আর বেকভ বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে পেরিয়ে গেল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের সারি।

দেয়ালের একটা সুইচ টিপল মাভলিয়ানভ, পর্দাটা সরে গিয়ে দেখা গেল একটা বড় চৌকোণা বোর্ড, তাতে নদী, রাস্তা, মাঠ আঁকা রয়েছে।

খুবই সুন্দর বোর্ডটা, নানান রঙের সমাবেশ তাতে। একটু সাহস করে ছুঁয়ে দেখল এগামভ, হয় গ্রানাইট না হয় গ্রানাইটের নকল।

প্রথমে জ্বলে উঠল বড় বড় করে লেখা: 'প্রাদেশিক ম্যাপ-মডেল'। তারপর ছোট ছোট করে লেখা: 'প্রাদেশিক পার্টি পরিষদের পায়োনীয়ার হাউসের 'কর্মী' চক্রের সভ্যদের প্রদত্ত উপহার।'

আরও বিস্মিত হয়ে গেল এগামভ, যখন মাভলিয়ানভ অন্য একটা সুইচ টিপল আর মডেলের মধ্যে জ্বলে নিভে উঠল ছোট বড় অনেকগুলো বাল্ব।

সব থেকে বড়টা মাঝখানে একজায়গায় জ্বলে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে উজ্জ্বল আলোয়। এগামভ বুঝল যে ওটা হল প্রধান শহর। আর তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলো সেগুলো সব ছোট ছোট শহর, আঞ্চলিক কেন্দ্র আর শ্রমিকবসতি।

'কি চমৎকার, পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে দেশকে আমাদের

পায়োনীয়াররা! শিশুদের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখা সত্যিই চমৎকার! আমাদের ছেলেদের চোখে এমনি করেই ধরা দিক এই পৃথিবীটা! আমাদের এই শিশু নাগরিকদের যেন দুঃখ দেয় না কোন কিছুই।' ভাবল এগামভ।

বেকভ কিন্তু হতাশ, উদাসীনভাবে বসেছিল। ক্লান্তিতে ছলছল করছিল চোখ।

'দেখুন এই যে।' আরম্ভ করল মার্ভালিয়ানভ। স্কেল তুলে নিয়ে মিটমিট করে জ্বলা একটা ছোট্ট আলো দেখাল সে। 'এই হল সেই জায়গা, যেখানে আপনারা থাকেন — গাশ্‌দিবান।'

দেখাবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল সে জায়গাটা।

খুব ব্যস্ত সে, তাড়াতাড়ি করছিল। অনেকবার টেলিফোনটা বাজল। মার্ভালিয়ানভ কথা বলছিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, অনেক দপ্তরের, লোকের নাম বলছিল।

মাথা ঘুরছে এগামভের। কেমন করে মার্ভালিয়ানভের মত এমন একজন বড়সড় লোক, তাও বয়স অল্প নয়, এত কাজ একসঙ্গে করতে পারে...

'দেখুন শ্রদ্ধেয় গাশ্‌দিবানের পিতারা, যে জায়গায় আপনারা থাকেন তা শহর নয়, পল্লীও নয়, শ্রমিকবসতিও নয়।'

তাদের দু'জনের মধ্যে এগামভকে বেশী সক্রিয় দেখে মার্ভালিয়ানভ তাকে ম্যাপের কাছে ডেকে বলল:

'কোন প্রশাসনিক বিভাগ লেখা রয়েছে পড়ুন তো।'

আলোর নীচে লেখা রয়েছে, এগামভ পড়ল:

'ছো-ট জ-ন-ব-স-তি অ-ঞ্চ-ল...'

একটু অপেক্ষা করল মার্ভালিয়ানভ, যা পড়া হল তা তাদের বুঝতে দেবার জন্য।

'বুঝলেন তো? গাশ্‌দিবান — ছোট জনবসতি অঞ্চল... অর্থনীতিকের ভাষায় তার মানে হল ওখানে কৃষি বা শিল্প কিছুই নেই... কিন্তু লোক বাস করে। এই লোকেরা কোন কিছুই করে না। বহুবছর ধরে গাশ্‌দিবান ব্যবহার করে আসছে সেই সব জিনিস যা তৈরী করে অন্যান্য শহরগুলি... এ ছাড়া অন্যান্য অনেক সমস্যা আছে যা আপনারা আমার থেকে ভালই জানেন... এবার আমি আপনাদের কথা শুনতে চাই, আপনাদের মনের কথা, প্রস্তাব।'

মার্ভালিয়ানভ এগামভের দিকে তাকাল। এগামভ থতমত খেয়ে বেকভের কাছে গিয়ে বসল।

'আপনারা অভিজ্ঞ লোক। বলুন...'

'আমাদের কম্যাণ্ডার জানেন,' বলল এগামভ এই ভেবে যে মার্ভালিয়ানভ শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারবে কার সঙ্গে কথা বলছে।

'কম্যাণ্ডার?' অবাক হল মার্ভালিয়ানভ, বেকভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে কম্যাণ্ডার বলে ডাকে কেন?'

এগামভ ভাবল এবার কম্যাণ্ডার সবকিছু মনে করিয়ে দেবে, কিন্তু—হায়! কম্যাণ্ডার মাথা নীচু করে বসে রইল, কোন কথা বলল না।

'যাক,' আবার ব্যস্তভাবে বলল মার্ভালিয়ানভ, 'আমার মনে হয়, গ্রামের লোকেরা ঠাট্টা করে কাকে কি নামে ডাকে সে সব আলোচনা করার সময় নেই এখন। আমি শুনতে চাই আপনাদের কি প্রস্তাব আছে।'

কিন্তু এগামভ আর কম্যাণ্ডার চুপ করে বসেই রইল। তারা বুঝল যে তাদের করার আর কিছুই নেই। এগামভও হঠাৎ সবকিছুর প্রতি গভীর অনাগ্রহ বোধ করল। মার্ভালিয়ানভ যে সব কথা বলছিল তা তাদের কাছে মনে হল যেন অনেক দূরের ব্যাপার, তাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।

'তাহলে আমার অনুরোধ আমি যা বলি ভাল করে শুনুন আর সে-কথাগুলো গাশ্‌দিবানে ফিরে গিয়ে যাদের মনে সন্দেহ আছে তাদের বলবেন... আর কি পথ খোলা আছে আমাদের সামনে? কারখানাটাকে নতুন করে তৈরী করা?' মার্ভালিয়ানভ সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি করছিল, তাদের কাছ থেকে উত্তর বা প্রতিবাদের আশায়। 'কিন্তু কি ভাবে চলবে কারখানাটা? কাঁচামাল নেই ধারেকাছে, বুঝলেন কিনা? না আকরিক, না বাড়তি তুলো। নুরভের খামারে যা তুলো হয় তার সবটাই এসে পৌঁছায় বুখারার শোধন কেন্দ্রে, শেষ কণাটা পর্যন্ত। কুটীর শিল্প? কিন্তু গাশ্‌দিবানের বয়স চল্লিশ বছরও নয়। সেখানকার লোকেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, মূল বা ঐতিহ্য বলতে তাদের কিছুই নেই। আপনাদের ওখানে কার্পেট তৈরীর কারিগর নেই, জরির কাজ জানা লোক বা কুমোরও নেই। তার মানে এ কথাও ওঠে না...

'নুরভের প্রস্তাবটাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সব থেকে যুক্তিযুক্ত। ওর যৌথখামার যথেষ্ট উন্নত, গাশ্‌দিবান খামারের অন্তর্ভুক্ত বসতি হলে তারও দ্রুত উন্নতি হবে টিনের খাবার তৈরীর কাজের মাধ্যমে। এই সমস্ত পরিকল্পনা যদি কার্যকর হয় তাহলে খুব ভাল হবে। পরিকল্পনা এখনও

পুরোপুরি খসড়া করা হয় নি কিছুকিছু দোষত্রুটি আছে এখনও। আরও অনেক ভাবা দরকার, দরকার বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে পরামর্শ করা। যাতে আবার ভুল না হয়...

'আমার অনুরোধ, নুরভের ওপর বিশ্বাস রাখুন। ওর কাঁধে অসম্ভব কঠিন কাজের দায়িত্ব। আপনাদের সাহায্য না পেলে ও পারবে না... আপনারা গাশ্‌দিবানের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যাক্তি, আপনাদের জ্ঞানকে কাজে লাগান... আবার অনুরোধ করছি...'

মার্ভালিয়ানভ তাদেরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল, আর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল বেকভের দিকে, ভীষণ চেষ্টা করতে লাগল, কোথায় যে এই বৃদ্ধকে এর আগে দেখেছে তা মনে করার। একবার তার মনে হল ক্লান্তি, ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বেকভকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে এর আগে কখনও তাদের দেখা হয়েছে কিনা।

কিন্তু তা করল না মার্ভালিয়ানভ। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে শীগ্‌গির, মাস দুয়েক বাদেই সে গাশ্‌দিবান যাবে সেখানকার সবকিছু দেখবার জন্য। তখনই সে সামরিক কুর্তা পরা বৃদ্ধটির সঙ্গে কথা বলতে পারবে ভাল করে।

ওদিকে বেকভ আর এগামভ প্রাদেশিক কমিটি অফিস থেকে আবার চলল চত্বরের দিকে, সেখানে বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করার জন্য।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছে তারা এই ঘটনায়।

আর এগামভ কম্যাণ্ডারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল:

'মন খারাপ করবেন না, কম্যাণ্ডার। মার্ভালিয়ানভ ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্যই এমনটা হল। আমরা যদি সকালবেলায় আসতাম তো ও আপনাকে ঠিক চিনতে পারত...'

'হ্যাঁ সে তো ঠিকই, কত বছর হল... মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হল না। কি হবে?'

বেকভ উঠে দাঁড়াল, তারপর তারা আস্তে আস্তে চলল স্টেশনের দিকে।

'গাড়ীটা থামাও এখানে,' বেকভ ড্রাইভারকে বলল।

যে মাঠটার কাছে তারা গাড়ী থেকে নামল সেটা অনেক দূরে নীচে সাদা বাড়ীগুলির আর পেস্তাবাগানের কাছে গিয়ে পেঁৗছেছে।

এই শান্তি, নিস্তব্ধতায় আত্মহারা হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বেকভ রাস্তার ধারে আর তাকিয়ে রইল সবুজ জগতের দিকে, গাশ্‌দিবানের গলির মধ্যে থেকে যার কথা সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, যাকে তার মনে হচ্ছে স্বপ্নের জগতের মত। মাঠের মাঝখানটায় যেখানে অনেক ঝোপ আছে সেখানে কৃষকরা তুলো সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিল। ঝুঁকে পড়ে সারি বেঁধে তারা বেকভের দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু কাজে এত মগ্ন তারা যে তাকে কেউ লক্ষ্যই করে নি।

অনেকক্ষণ ধরে বেকভ ইতস্ততঃ করতে লাগল রাস্তার ধার থেকে মাঠের মধ্যে নামতে, তার মনে হতে লাগল সে একটু নড়লেই যে দৃশ্য এখন দেখছে তা উধাও হয়ে যাবে।

'গত বছর এই মাঠে রাফিকার ছেলে হয়েছে,' ওপর দিকে কোথা থেকে যেন ভেসে এল প্রতিধ্বনিত বিকৃত হয়ে যাওয়া কার কণ্ঠস্বর।

'এই মাঠে যার জন্ম সে সুখী হবে,' উত্তর শোনা গেল।

একেবারেই সাধারণ কথাবার্তা, কিন্তু এই মাঠের মধ্যে, এই আদিম স্তব্ধতার মধ্যে তা যেন বাজল অতি মধুর হয়ে।

শেষ পর্যন্ত দ্বিধা জয় করে বেকভ মাঠে নামল। সাবধানে ঝোপগুলো সরিয়ে সরিয়ে সে কৃষকদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

তাকে দেখে কাজ থামিয়ে দিল কৃষকেরা, তারা কিসব বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে, তাকে চিনতে পারে নি।

'ভগবান তোমাদের সহায় হোন,' দূর থেকেই বলল বেকভ।

'তিনি আপনারও সহায় হোন গো, ভালমানুষের ছেলে!' তারাও উত্তর দিল।

তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ ছুটে এসে বেকভের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল আর আনন্দে চীৎকার করে উঠল:

'আরে এ যে কমরেড বেকভ! সুস্বাগতম!'

'বোবো-নাজার...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমরা প্রতিদিন আপনার অপেক্ষা করেছি, আমার গোটা পরিবার আর ছেলেরাও জিজ্ঞাসা করে, কমরেড বেকভ কবে আসবেন,' তাড়াহুড়ো করে বলছিল বৃদ্ধ।

যারা তার পিছনে ছিল তারাও তুলো নামিয়ে রেখে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে শুনছিল আর সমর্থনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছিল।

বেকভ তাদের দিকে ফিরে সালাম জানাল, বোবো-নাজার বেকভকে তুলোর গাদার ওপর বসতে আমন্ত্রণ জানাল।

বেকভ বসলে কৃষকরাও তার চারদিক ঘিরে বসল, তারাও বোবো-নাজারের থেকে কিছু কম উত্তেজিত নয়।

বোবো-নাজার মাঠের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল:

'এই মাকসুম!'

'হে-হে! শুনতে পেয়েছি, বাবা!'

চুপ করে আছে সবাই। প্রথম সৃষ্টির দিনের মত পরিচ্ছন্ন বাতাসে আরামে বেকভের মাথা ঝিমঝিম করছে।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখতে এলেন নিজের মাঠ।' বেকভকে বলল বোবো-নাজার, 'এবছর ফসল ভালই হয়েছে। এবছর আমাদের ঘরে আর কোনো কিছুরই অভাব হবে না।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল বুড়োরা, 'শরৎকালে অনেক বিয়ে লাগবে...'

কোথা থেকে যেন কেটলি আর কতকগুলো পেয়ালা আনা হল। বোবো-নাজার বেকভকে চা ঢেলে দিল।

'বসন্তকালে অনেক বিষ্টি হয়েছে, তাই না?' বলে বোবো-নাজার অন্যান্যদের দিকে তাকাল সমর্থন পাবার আশায়।

'আমাদের ছাতটাই খারাপ হয়ে গেছিল।' বলল একজন মহিলা।

'হয়েছে সে কথা আর মনে করতে হবে না!' সেই মহিলার কাছেই বসে থাকা আর একজন মহিলাকে জড়িয়ে ধরে মজা পেয়ে হেসে উঠল।

লজ্জা পেল মহিলা, তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেকভকে বলল:

'এ আমার স্বামী, ইসখাকচাচা...'

কোদালহাতে একটি যুবক এসে মাটি পর্যন্ত প্রায় ছুঁয়ে সালাম জানাল বেকভকে।

'এ আমার ছেলে মাকসুম,' পরিচয় করিয়ে দিল বোবো-নাজার, 'ওকেই ডাকলাম তখন। ও তুলোগাছে জল দেয়।'

যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বেকভ।

'পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।'

'ছেলেকেও কাজ শিখিয়ে দিয়েছি, আমি এখন তুলো সংগ্রহ করি। আর এই হল ওর ভাবী বউ,' সবার পিছনে বসে থাকা একটি মেয়ের দিকে দেখাল বোবো-নাজার।

মাথায় সাদাকাপড় চাপা দেওয়া এক বৃদ্ধ বেকভের দিকে এগিয়ে এসে বলল:

'মাকসুম আমার জামাই।'

'তোমরা এক পরিবার, দেখছি।'

'সব মানুষই এক পরিবার,' বৃদ্ধটি বলল, 'এই পরিবারে বিভিন্ন ধরণের লোক আছে, কিন্তু আমরা জানি যে আপনি সবার থেকে ভাল...'

বৃদ্ধের এই কথায় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বোবো-নাজার লাফিয়ে উঠে দূরে মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগল:

'ঐ ওখানে, যেখানে চারটি পপলার গাছ দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে কম্যাণ্ডার বেকভের সৈন্যদল বিশ্রাম নিচ্ছিল...'

'মনে আছে...' ঘাড় নাড়িয়ে জানাল বেকভ।

'সাপ ছাড়া আর কিছুই এখানে বাঁচতে পারত না। আর এই জমি এখন আমাদের খাওয়াচ্ছে!.. আর ঐ চারটি পপলারের কাছেই আমি প্রথম দেখি কমরেড বেকভকে... আপনি বেরিয়ে এলেন, কে যেন আপনাকে ঘোড়া এগিয়ে দিল, লাফিয়ে উঠলেন আপনি, আর তখনই আমি...'

'থাক,' থামিয়ে দিল তাকে বেকভ, হঠাৎ মনে হল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।

'এখনও পর্যন্ত রাতে ঘুমোতে পারি না আমি। কি করে আমার অমন স্পর্দ্ধা হল?! আপনি ভাল করতে এসেছিলেন আর আমি নির্বোধ গাধা...'

মাথা নীচু করে নীরবে বসেছিল সবাই।

মাকসুম বাবাকে জড়িয়ে ধরে একধারে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি যেন বোঝাতে লাগল।

'কিছুতেই ভুলতে পারছে না ও।' বলল মাথায় কাপড় ঢাকা দেওয়া বৃদ্ধটি। 'বলে — আপনাকে গুলি করা মানেই পয়গম্বরকে গুলি করা।'

'আমি অনেকদিনই ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অনেক দিনই ভুলে গিয়েছি এসব কথা,' বলল বেকভ, কিন্তু হঠাৎ মনে হল বোবো-নাজারের গুলিতে আহত বাঁহাতটা যেন ব্যথা করে উঠল। সবার অগোচরে কনুয়ের ওপরটায় হাত বুলিয়ে নিল।

বোবো-নাজার আর তার ছেলে ফিরে এসে বেকভের কাছে বসল।

'কি শান্তি!' ফিসফিস করে বলল বেকভ...

শুয়ে পড়ল সে, বোবো-নাজার তার মাথার তলায় তুলোর গাদা গুঁজে দিল।

'এমন শান্তি আর চমৎকার জায়গা,' আবার বলল বেকভ আর তুলোচাষীদের মায়াভরা দৃষ্টির সামনেই ঘুমিয়ে পড়ল...

যখন তার ঘুম ভাঙল, সূর্য তখন সাদা গ্রামটার পেছনে পাটে বসেছে। যেখানে বেকভ শুয়েছিল জমির সেই অংশটায় তুলো সব তোলা হয়ে গেছে। অনেক দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে তুলোচাষীদের।

কেবল এগামভ একা কম্যাণ্ডারের কাছে বসে আছে, যাতে কেউ তার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়। এগামভের হাতে একটা ভিজে টাটকা মাটির ডেলা, যখন বেকভ জেগে উঠল মাটির ডেলাটা তাকে দেখাল খুশী করার জন্য:

'কেমন মাটি দেখুন, কম্যাণ্ডার! যেন শক্তিময়ী, স্বাস্থ্যবতী রমণী, একই সঙ্গে চারটি যমজ সন্তানের জন্ম দিতে পারে!.. চলুন ওদিকে যাই, আপনার সেই প্রিয় জায়গাটায়।'

ইঙ্গিতে সে দেখাল দূরের সাদা বাড়ীগুলো, পেস্তাগাছের বাগানের দিকে, যেখানে সবুজ গাছপালার মধ্যে বেড়ান যায়। স্যাঁতসেঁতে, দারিদ্র্যর গন্ধ বেরিয়ে যাওয়া এই গাশ্‌দিবান এখন এগামভের মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে।

'ওখানে একটা পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, কম্যাণ্ডার। ওদের বাড়ী রাতটা কাটান যাবে...'

'না, না,' প্রতিবাদ জানাল বেকভ, 'ওখানে নুরভ আছে। ওর কাছে যাব না আমি। ও জানে। ভাল করেই জানে সেই যুবক বয়সেই ওকে ভাল লাগত না আমার। তবু ওই তো শেষ পর্যন্ত খামারটা দাঁড় করাল, আমাদের তিনজনের মধ্যে ওই কেবল পারল। ওকে সভাপতি করে ঠিকই করেছিলাম...'

গাশ্‌দিবানের অন্ধ গলির মধ্যে যেই এসে ঢুকল তারা বেকভের শরীর আবার খারাপ হয়ে পড়ল। গুমোট গরমে, হাওয়ায় নোনা ভ্যাপসা গন্ধে তার বমি উঠতে লাগল।

স্মারকস্তম্ভের কাছে এসে ভয়ানক বিশ্রী কাশি আরম্ভ হল তার, স্মারকস্তম্ভের পাদদেশে বসল সে।

কম্যাণ্ডার চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে চীৎকার করে উঠল এগামভ।

স্মারকস্তম্ভটার ওপর উজ্জ্বল আলো পড়ে সাদা আলো ঠিকরোচ্ছে, এত সাদা দেখাচ্ছে স্মারকস্তম্ভটা অদ্ভুত সাদা, ধপধপে সাদা, চোখ কেটে বসছে যেন একেবারে।

চীৎকার করে উঠল বেকভ। কিন্তু চীৎকারটা শোনা গেল না। তার ভেতরে কি যেন উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। পড়ে গেল সে, সাদা আলোর নীচে চাপা পড়ল।

সারা রাত কোনো জ্ঞান ছিল না তার, নীরবে শুয়ে ছিল। যখন জ্ঞান ফিরল দেখল এগামভ আর মারুফ তার মাথার কাছে বসে আছে। তাকে চোখ মেলতে দেখে লাফিয়ে উঠে এগামভ গায়ের থেকে আলখাল্লাটা খুলে দলা পাকিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। কি বলবে বুঝতে পারছে না, দোষী মনে হচ্ছে যেন নিজেকে।

মারুফ কিন্তু বিষণ্ণ চোখে বেকভের দিকে তাকিয়ে বসেই রইল যেন তার মুখের ভাবটা চিরকালের মত মনে ধরে নিতে চাইছে।

বেকভের মুখটা শান্ত, সুন্দর দেখাচ্ছে। মুখে জরার চিহ্ন আর একটুও নেই, তার জায়গায় নতুন একটা কি ভাব যেন, যেন সে জীবনের একটা নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে যার ফলে দেহ মন দুইই সুন্দর হয়ে উঠেছে...

দেয়ালের ওপার থেকে কাদের সব গলা শোনা গেল।

'শুনুন... লোকেরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, কম্যাণ্ডার।' তারপর এগামভ আবার ছেলের পাশে গিয়ে বসল টুলের ওপর।

বেকভ তার দিকে তাকিয়ে রইল শান্ত স্থির দৃষ্টিতে। এতে এগামভ আরও দিশাহারা হয়ে পড়তে লাগল।

'আপনার সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছে সবাই, কম্যাণ্ডার। আপনি শুনতে পাচ্ছেন ওদের গলা?'

কম্যাণ্ডারের চোখে আবার একটা চিন্তার ঝলক খেলে গেল, কিন্তু পর মুহূর্তেই সেটা মিলিয়ে গেল। আবার আগের সেই শান্ত দৃষ্টি ফিরে এল চোখে।

'আমার ভয় লাগছে, আপনি কথা বলছেন না কেন, কম্যাণ্ডার। লোকেদের কিছু বলতে চান?'

এবারে খিঁচুনির ধাক্কায় বেকভের মুখের রেখাগুলি ভেঙে চুরে যেতে লাগল কিন্তু তবুও সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে সে উচ্চারণ করল:

'আমি ভাল করতে চেয়েছিলাম... সবার... তোমারও...'

এগামভ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বেকভের হাতটা ধরতে চাইল।

'এত ভাল কাজ করেছেন আপনি! সত্যি বলছি! এবার... দেখবেন সবকিছু পাল্টে যাবে...'

কিন্তু আর কিছু শুনছে না বেকভ।

'আমাদের ফেলে যাবেন না, কম্যাণ্ডার!'

দরজার কাছে দেখা দিল ডাক্তার।

এগামভ উঠে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মারুফ ঝুঁকে পড়ে বেকভের হাতে চুম্বন করল।

তাদের পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তা থেকে কে যেন চীৎকার করল:

'কমরেড বেকভ দীর্ঘজীবি হোন!..'

...বেকভের মনে হল যেন সে দেখছে একটা দরজা, যেন সে উঠে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল, ধাক্কা দিয়ে খুলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দরজাটা ভারী, গ্রানাইটপাথরের, খোলা যাচ্ছে না কিছুতেই।

ঘুষি মারছে দরজাটার উপর, কিন্তু কোনও আওয়াজও উঠছে না, এমন চেপে সব বন্ধ...

তখন সে শরীরে যতটুকু শক্তি আরও ছিল, সব সঞ্চয় করে দু'হাত ছড়িয়ে দরজাটার উপর পড়ে গেল। দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল আর বেকভ পড়ে গেল সাদা মত একটা কিছুর ওপর, চিরকালের মত তার মধ্যে মিলিয়ে যাবার জন্য...

৬

গাশ্‌দিবানে এখন অনেক কাজ। অনেক কিছু ভেঙে ফেলা হচ্ছে, অনেক কিছু নতুন করে তৈরী হচ্ছে।

বুখারা থেকে ইঁট, কাঠের পাটা নিয়ে আসা হচ্ছে। ঐ পাটাগুলো দিয়ে গাশ্‌দিবানের লোকেরা টিনের খাবার তৈরীর কারখানার জানলা দরজা তৈরী করছে, পরিখা খুঁড়ে হলুদ মাটি মিশাচ্ছে।

আরও একটা প্রতিযোগিতা লেগে গেল গাশ্‌দিবানের লোকদের মধ্যে কে কত তাড়াতাড়ি পাঁচিলের ওপর থেকে তুলে ফেলতে পারে কাঁচের টুকরোগুলো, যেগুলো পোঁতা হয়েছিল প্রতিবেশী ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলে যাতে হাত কাটে সেই উদ্দেশ্যে।

এগামভও কাজে লেগেছে।

একটা কোদাল তৈরী করে নিয়ে সে সেই মাটিটা খুঁড়ছে যেখানে যৌবনে তার উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হয়েছে। সে শোণিতপ্রবাহ যে ব্যর্থ হয়ে যায় নি তা জানে সে।

প্রাক্তন এডজুট্যান্টের ছেলে মারুফও তাকে সাহায্য করে। কোথাও চলে যায় নি সে, বাবার কাছেই রয়ে গেছে। সেও বুঝেছে সুখ গড়ে তুলতে কত পরিশ্রম করতে হয়। সেই সুখের পথ যতই কঠিন হোক না কেন, সে সুখ প্রকৃত সুখ।

...সন্ধ্যার মুখে জল এসে পেঁছিল গাশ্‌দিবানে। প্রথমে শোনা গেল একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ — স্লুইসগেট খুলে দেওয়া হয়েছে, ড্রিলিং মেশিন যে জলটা খুঁড়ে বার করেছে তা হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল পাথর ডিঙিয়ে, এত বছর ধরে মরানদীর গর্ভে যতকিছু জমা হয়েছিল সব ভাসিয়ে দিয়ে।

তারপর গাশ্‌দিবানবাসীরা সেই জলটাকে দেখতে পেল, সূর্যের আলো পড়ে হলুদ দেখাচ্ছে।

জলটা এগোচ্ছে যেন সতর্কভাবে, যেন অজানা জায়গা দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে, যেন সেই সব লোকেদের বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না, যারা এক-সময় অত্যন্ত অমিতব্যয়ীভাবে তাকে খরচ করে ফেলেছে।

গাশ্‌দিবানে যারা কাজ করছিল, সবাই নদীর মধ্যে নেমে পড়ল। হাসিতে, আনন্দে ফেটে পড়ছে, একে অন্যের গায়ে জল ছিটাচ্ছে আর জল খাচ্ছে...

'জল, জল! এত দেরী করে তুই এলি আমাদের কাছে।' গুণগুণিয়ে বলছিল বুড়োরা। 'নদীগর্ভে পড়ে থাকা পাথরে, কাঁচে মুখ ঘষে আঘাত পেয়েছিস, বেচারা জল...'

সূর্য অস্ত যাবার ঠিক আগেই এগামভ উবু হয়ে বসে কম্যান্ডারের সমাধির ঢিপির ওপর রুটির টুকরো ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

পাখীগুলো তার অপেক্ষাতেই ছিল। ডানা ঝটপট করতে করতে আর বকবকম করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুটির টুকরোগুলোর ওপর। এই রকম গান তারা গায় প্রতিদিনই কম্যান্ডারের সমাধির কাছে যাতে তাদের গলা শুনে কম্যান্ডার তার চিরনিদ্রায় আত্মার অপ্রীতিকর কোন স্বপ্ন না দেখেন...

পাখীগুলো দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

এই সমাধিক্ষেত্রে কম্যান্ডারের অন্যান্য সৈন্যদের সমাধি-ঢিপিগুলির মতই কম্যান্ডারের ঢিপিটাও অত্যন্ত সাধারণ; ইতিমধ্যে গাশ্‌দিবানের মাটিতে যে নুন আছে তা ঢেকে ফেলেছে ঢিপিটা।

'নদীটা ফিরে এসেছে,' প্রাক্তন এডজুট্যান্ট তার কম্যান্ডারকে জানাল ফিসফিসিয়ে।

তারপরে সারা গাশ্‌্দিবানময় আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে লাগল সে।

স্মারকস্তম্ভের কাছে এসে থেমে পড়ল।

'যা দেখি,' বলল মারুফকে।

'আমি তোমায় সাহায্য করব, বাবা।'

'না, আমি নিজে...'

এগামভ বসে রইল, যতক্ষণ না মারুফ বাড়ীর মধ্যে গেল, তারপর উঠে গেল ফুলের কেয়ারীর দিকে।

প্রতিদিনের মতই সবকিছু সুশৃংখল এখানে — গাছগুলির ডগাকাটা, মাটিতে জল দেওয়া হয়েছে।

ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বালতিটা উঠিয়ে নিয়ে এগামভ স্মারকস্তম্ভের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে মর্মর পাথরের ফলকটা ধুতে লাগল...

ডাক দাও মা

11—54

আমার বয়সী লোকেরা ভাবতে ভালবাসেন যে তাঁরা যুদ্ধের সময়ের লোক। এমন ভাবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল যুদ্ধ শুরুর দিনটি তাঁদের মনে আছে।

কিন্তু যদিও তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তটির মুখোমুখি হয়েছে ভেজা কাঁথায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে বা হামাগুড়ি দিতে দিতে। কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার নয়, আসলে মা-ঠাকুমার মুখ থেকে গল্প শুনে শুনে ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার ১৯৪১ সালের ২২শে জুনের সেই দিনটিতে তুমি কি করছিলে, নিজেকে যুদ্ধের সময়ের লোকদের দলে ফেলার পক্ষে এটাই যথেষ্ট...

এই সব লোকদের নামে যদি পেন্সন নির্ধারিত হত তো আমি এক কানাকড়িও পেতাম না, এই কারণে যে আমি যুদ্ধের প্রথম দিনটির কথা কিছুই মনে করতে পারি না। জানি না কেন, সেই দিনটি আমার বাচ্চাবয়সের স্মৃতিতে কোন ছাপ রেখে যায় নি। পেন্সন নির্ধারণ কমিটির সামনে আমি যতই বাকচাতুর্য দেখাই না কেন, তারা আমার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিত ঠিকই।

যুদ্ধ আমি মনে করতে পারি তার একচল্লিশতম দিনটি থেকে, কিন্তু তার জন্য কোন বিশেষ পেন্সন পাওয়া যেত না হয়ত... যুদ্ধের একচল্লিশতম দিন...

আমার নাম মেহ্দি। পয়লা সেপ্টেম্বর, আমার সাত বছর পূর্ণ হতে আর দিন দশেক বাকী তখনও, এর জন্য বোধহয় আমাকে স্কুলে নেওয়া হবে না। এই আমার জীবনে সব থেকে বড় দুঃখের কারণ।

আমার মা ডাক্তার। সব সময়েই তার এমন হাবভাব যেন পৃথিবীতে

সবকিছুই অপূর্ব চমৎকার। হয়ত তার কারণ এই যে আশেপাশে সবাই কেবল বলে যে আমার মা আমাদের পাড়ায় সব থেকে সুন্দরী আর সব থেকে মিষ্টি মহিলা।

আমার বাবা একজন ছোটখাট উপরওয়ালা। তার অধীনে দশজন লোক, যারা সারাদিন কেবল ল্যাম্প-পোস্টগুলির ওপর উঠে বাল্‌বগুলো নিয়ে হিমসিম খায়।

আমার দাদুর বিশেষ কোন গুণ বা যোগ্যতা নেই। গ্রামে থাকে, সুস্বাদু খরমুজের চাষ করে। দাদু খুব হাস্যকর লোক আর একটু ধূর্ত ধরণের। তার সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু তা পরের বারের জন্য থাক।

আমার দিদিমা মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি অনুরোধ করে-ছিলেন, তাঁর কথা যত কম স্মরণ করা হয় ততই ভাল, তাতে তিনি শান্তিতে কবরে শুয়ে থাকতে পারবেন।

আমার আরো আছেন এক মামা, যাকে নিয়ে আমার খুব গর্ব। তিনি এখন অনেক দূরে, যুদ্ধে। যখন তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবেন তখন আমরা দু'জনে মিলে আবার গান লিখব... 'আমোদভরা সবুজ আজর দ্বীপগুলিতে...'

আমাদের বাড়ী। তিনটি ছোট ছোট ঘর আছে আমাদের, যেগুলিতে আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ঘুমোই, এছাড়া আছে একটা বড় ঘর, শীতকালে ভীষণ ঠাণ্ডা আর খালি খালি লাগে। গরমকালে মা ঐ ঘরটার দেয়ালে একটা কার্পেট টাঙিয়ে দেয়, যেটার বয়স দু'শো বছর; পূর্বপুরুষের কার থেকে যেন এটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি আমরা। কার্পেটটায় দু'শোটা ফুটো যেন কেউ ইচ্ছে করেই প্রতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর কার্পেটটাতে একটা করে ফুটো করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরে কার্পেটটা টাঙালে বেশ ভাল লাগে আর সুন্দর দেখায়।

এছাড়া গরমকালে এই ঘরটাতে এক কোণায় রাখা থাকে একটা সিন্দুক যার ওপর ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু করে রাখা থাকে গোটা ত্রিশেক তোসক। সেখান থেকে কেউ কখনও সেগুলো নেয় না, অমনিই ওগুলো রাখা আছে সেখানে আর অপেক্ষা করে আছে যদি হঠাৎ কখনও ত্রিশজন অতিথি এসে উপস্থিত হয়, তো তারা ওগুলোর ওপর ঘুমোবে।

এবাড়ীর একটাই কেবল খারাপ দিক — আমাদের সব জানলাগুলোই উঠোনের দিকে — রাস্তায় যে কি ঘটেছে, কিছু দেখবার উপায় নেই।

আমাদের উঠোনটা যেন 'আলিবাবা ও চল্লিশ ডাকাত' গল্পের দুর্গের মত — অপরিচিতের চোখের আড়াল করার জন্য চারদিকে শক্ত করে দেয়াল তোলা: নাক গলাবার চেষ্টা করে দেখ, নাকই ভাঙবে! কেবল আমাদেরই না, আশপাশের সব বাড়ীই এইরকম অন্ধকার, চাপা। আমাদের শহরে যতই খুঁজে বেড়াও না কেন জানলাওয়ালা বাড়ী তুমি একটাও পাবে না, বাজী রেখে বলতে পারি।

আমাদের পাড়ার কথা আর বলব না, কেমন? যা আমার ভাল লাগে না সে সম্বন্ধে আমি কখনও গল্প করি না। আর সবকিছুর কথা একের পর এক বলতেই বা যাব কেন? ভাবলে হাসি পায়!

প্রতিবেশীদের সম্বন্ধেও আমি কিছু বলব না, এরা সব বয়স্ক লোক, বাড়ী দেখাশোনা করার জন্য কেয়ারটেকারই তাদের কথা বলতে পারবে। সে বলবে, নিশ্চিত হতে পার। বলবে পরচর্চার কথা, ঝগড়ার কথা, কে কাকে বিয়ে করেছে, কে কাকে বুখারার বুদ্ধু বলে গাল দিয়েছে।

আমি বরং আমার সমবয়সীদের কথা বলব। আমাদের পাড়ায় আমার বয়সী ছ'জন... না, সাতজন মেয়ে আর আমাকে না গুণলে দু'জন ছেলে। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মেশে না, বাবা-মা বারণ করে দিয়েছেন। কোরানে নাকি তাই লেখা আছে... পুরুষমানুষ যেন মেয়েমানুষের সঙ্গে না মেশে, খেলাধুলো দুষ্টুমি না করে তাদের সঙ্গে আর যেহেতু আমরা ছোট ছোট পুরুষমানুষ, তাই আমাদের সঙ্গে ছোট ছোট মেয়েমানুষদের খেলা করতে মানা।

এর আগেই বলেছি যে আমাকে ছাড়া ছেলে দু'জন। তাদের মধ্যে একজন বাহরামকে আমি দেখেছি মাত্র দু'বার। ওর হার্ণিয়া আছে, খুব অল্পই রাস্তায় বার হয়। আর অন্যজন কাদিরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু ঝগড়া হয়ে গেছে। ও আমার বাবাকে বলেছে ভীরু, যুদ্ধে যেতে ভয় পায়, পালিয়ে বেড়ায় আর ওর নিজের বাবা নাকি বীর, তরোয়াল দিয়ে জার্মানদের মাথা কাটছে ঘচঘচ করে। আমি ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে গেলাম কিন্তু বোকাটা কেবল এক কথাই বলে যেতে লাগল। আমি আর পারলাম না, এমন এক ঝেড়ে দিলাম যে চোখে সর্ষেফুল দেখল। ও আমার নাক আঁচড়ে দিল মেয়েদের মত। এরপরেও কি করে আর ওকে বন্ধু বলি, মারপিটও করতে জানে না মানুষের মত!

যুদ্ধ। যুদ্ধ আমার কাছে একটা গহীন অরণ্যের মত। চারদিকে কেবল শুনি — যুদ্ধ, যুদ্ধ, কিন্তু কেউ ঠিক করে বলতে পারে না আসলে সেটা কি।

সবকিছু এত ভাল, এত সহজ ছিল, হঠাৎ এই মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হল। সবার জীবন, মনমেজাজ খারাপ করে দিল। লোকেরা রাগী, বদমেজাজী হয়ে উঠল। কেউ হাসে না, একটা মিষ্টি কথা বলে না। যুদ্ধ যেন সবাইকে খেপিয়ে তুলেছে।

এবারে বড়দের কথা একটু বলি। আমি তাদের পুরোপুরি বুঝতে পারি না কিন্তু মনে হয় তারা ভালই লোক। তাদের একটাই কেবল দোষ যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে।

... তাহলে, আজ যুদ্ধের একচল্লিশতম দিন...

যেই রোদের একটা টুকরো আমার বাঁ চোখে সুড়সুড়ি দিল অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল। সাবধানে মুখের কাছে হাত এনে, রোদের টুকরোটাকে হাতের মুঠোয় ধরলাম, তারপর হাতের আঙুলগুলোকে পাকিয়ে চোঙ্গার মত করে সূর্যকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। নীল, লাল, হলুদ সূর্যরশ্মির ঝলক আমার মুঠোর মধ্যে লাফালাফি করতে লাগল।

হঠাৎ চোঙ্গার মধ্যে কালোমত কি একটা যেন দেখা গেল, ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলাম। কি একটা আওয়াজ হল খট্ করে বিছানায়, তারপরে ঘরে আর আঙ্গুরলতায় লাগান ছোট লাউডস্পীকারটা থেকে বেজে উঠল বাবার আদেশ:

'ব্যায়াম আরম্ভ কর! হাত কোমরে, পা জোড়া কর, চালিয়ে যাও...'

'কোথায় চললি?' মা'র গলা শুনতে পেলাম। 'ব্যায়ামে ফাঁকি দিতে হবে না।'

আমি লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনে দরজাটা এঁটে বন্ধ করে দিলাম।

কালো বিন্দুটা বোঝা গেল পিয়নের মাথা। চিঠি! চিঠি! আমাদের নামে চিঠি এসেছে। কি মজা! পিয়ন যখন ভাল ভাল খবরভরা চিঠি নিয়ে আসে আমার ভীষণ আনন্দ হয়!

...তখনই মারাত্, আমি তোর বাবাকে প্রথমবার দেখলাম। থলিটা মাটিতে রেখে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, মুখেচোখে এমন বিষণ্ণভাব...

'তোর মামা কোথায়?' কেমন এক অদ্ভুত হেসে তোর বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'যুদ্ধে... মামার চিঠি? দিন আমায়, আমি হারাব না।'

কোন উত্তর না দিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আমি সরে গেলাম—এ আবার কি?

'বাছা,' তাঁর গলা আমি আজও মনে করতে পারি, 'মাকে বলবি, বুঝলি কিনা, সব ঘরেই এখন অনেকেরই দুর্ভাগ্যের দিন — যুদ্ধ, যুদ্ধ... কাঁদিস নে বাছা, মনে জোর আন্। এ কি দুঃখের বোঝাই নেমে এল আমাদের মাথায়, পোড়া কপাল!' তারপর তিনি আমার হাতে দিলেন সেই ধরণের একটা কাগজের টুকরো, যেগুলোকে মারাত্, আমরা পরে 'কালো কাগজ' বলতাম।

তখন অবশ্য আমি বুঝতাম না, ওটা কালো কাগজ। তখন মনে হয়েছিল যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে লেখা একটা সাধারণ চিঠি ওটা, যাতে: 'আমার প্রিয়জনেরা, খবর সব ভালই। আমরা চলেছি, চলেছি রাশিয়ার পথ আর বনের মধ্যে দিয়ে। আমি দেখছি আকাশের দিকে, গাছগুলির আর গ্রামগুলির দিকে — সেগুলি ঠিক তেমনই আছে, যেমন ছিল পাঁচ বছর আগে যখন আমি সেনাদলে ট্রেনিংয়ে ছিলাম। রাশিয়ার আকাশ যুদ্ধের কাছে পরাজয় স্বীকার করে না। যতই তাকে আগুনে জ্বালাক না কেন সে তেমনি পরিষ্কার আর নীল থেকে যাবে...' মামা এইরকম লিখেছিলেন আগের চিঠিতে।

আমি কাগজের টুকরোটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে ফিরে এলাম উঠোনে। লাউডস্পীকারে ভেসে আসছিল শেষ নির্দেশগুলি:

'এবার গভীর করে বিশ্বাস নাও, ছাড় — এক, দুই, তিন...'

'তুই কোথায় গিয়েছিলি, মেহ্দি?' কঠোর স্বরে মা জিজ্ঞাসা করলেন। মা মইয়ের ওপর উঠে আঙ্গুরলতা থেকে নীল নীল আঙ্গুর কেটে থালায় রাখছিলেন।

'আমি... এই এমনি একটু...'

আঙ্গুরলতার চারদিকে একটু ঘোরাফেরা করলাম, যখন বিরক্তি ধরে গেল তখন মা'র দিকে এগিয়ে দিলাম কাগজটা।

'মামার চিঠি। আমিই প্রথমে নিয়েছি এটা। তুমি আমাকে ক্যামেরা কেনার জন্যে কিছু পয়সা, অল্প কয়েকটা পয়সা দেবে তো?'

মা কাগজটা মেলে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'ও!' যেন বাগানের কাজ করার ছুরিটা দিয়ে হাত কেটে ফেলেছেন, 'আনোয়ার! আনোয়ার!' মইটা তার পায়ের নীচে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল।

'এই যে, আমি। কি হল?' বাবা অন্তর্বাসপরা অবস্থাতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন কান্নায় ভেঙে পড়া মাকে ধরলেন।

কি হল? মা হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ করলেন কেন?

‘ফারহাদ! ফারহাদ, হায়!’

বাবা মা’র হাতের মুঠি খুলে কাগজটা নিলেন আর তাতে লেখা অক্ষরগুলির উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে চললেন।

‘বীরের মৃত্যু,’ শুনতে পেলাম, ‘মৃত্যু...’

বাবাও হঠাৎ যেন গুটিয়ে ছোট আর দুঃখী হয়ে গেলেন।

‘মারা গেছে? ফারহাদ মারা গেছে?’ মা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

‘বীরের মৃত্যু,’ আবার শুনতে পেলাম বাবার গলা আর তখনই কেবল বুঝতে পারলাম যে আমার মামার ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটেছে, এমনই ভয়ঙ্কর যে মা-বাবার মুখ দিয়ে কথা সরছে না, মা-বাবা পরস্পরের দিকে, আমার দিকে তাকাতে পারছেন না যেন আমরা তিনজনে মিলে মেরে ফেলেছি আমার মামাকে...

... তার মানে আমার মামা—যাঁর চোখ, হাত, মুখ সবকিছু এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যেন তিনি কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন, বরাবরের মতই সুন্দর, ছেলেমানুষ, আমুদে আর ভীষণ ভাল; যেন তিনি আমাকে কোলে নিয়ে আঙ্গুরলতার একেবারে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে হাসছেন, আর আমি ভয় পেয়ে কাঁদছি; যেন উনি আর আমি মাছ ধরতে গিয়েছি, মাছ কিছুতেই ধরা পড়ছে না, চুপ করে মামা বসে আছেন, একটুও নড়াচড়া করছেন না। কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ জোরে শিস দিয়ে উঠে ছিপ ছুঁড়ে ফেলে দেন কোন চুলোয়, আমাকে খপ করে ধরে জলে ছুঁড়ে ফেলে তারপর নিজেও ডুব দিলেন, আমরা জলে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগলাম, খুশী, সুখী আর এত আপন; যার সঙ্গে আমি বানিয়েছি হাজার হাজার হাসির আর ভয়ের গল্প মানুষের মাথাওয়ালা বেড়াল আর সাপ-গাছের সম্বন্ধে, গান গেয়েছি: “আমোদভরা সবুজ আজর দ্বীপগুলিতে, সবাই মাথায় হাঁটে, বিজ্ঞানীদের মতে। সেখানে আছে তিনমাথাওয়ালা তিমি, শোনা যায় যে নিজে গীটার বাজায়, নাচে আর গান গায়...” উনি, আমার ঐ মামা, আমার আপন মামা আর কখনও আসবেন না, আমার সঙ্গে খেলা করবেন না, গাইবেন না, নাচবেন না, হাসবেনও না। চিরকালের মত তিনি চলে গেছেন ঐখানে, ঐ বনে, সেখানে, সেই গল্পের মত, অদৃশ্য হয়ে ঘুরে বেড়াবেন আর লাঠি দিয়ে পাইন গাছগুলির গায়ে টোকা দিয়ে দিয়ে শুনবেন কেমন করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে আওয়াজ নেমে যায় আকাশ থেকে মাটিতে; আমার মামা ঐ দেশ রাশিয়াকে ভীষণ ভালবাসত, ওখানেই সে চলে গেল আমাদের

সবাইকে ছেড়ে — আমাকে, মাকে... আর যতই আমি ডাকি না কেন, 'ফারহাদমামা আমার কাছে এস, চল মাছ ধরতে যাই, লাফাব, মজা করব।' সে কখনই, কোনদিনও আর ফিরবে না... আমি কি ওর মনে কোন কষ্ট দিয়েছি, আমরা কি এমন খারাপ কাজ করেছি যে আমার মামা, আমার ভালবাসার মামা চলে গেল আমাদের ছেড়ে ?

'কাঁদিস নে বাছা, কাঁদিস নে,' মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন আর তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল আমার মাথায়।

২

তোর বাবাকে যে আমি কি ভয়ংকর ঘৃণা করতাম মারাত্, কি ভয় যে করতাম, তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। পরপর কয়েকরাত্রি ধরে স্বপ্ন দেখেছি তোর বাবাকে যতরকম সব ভয়ংকর জীবজন্তুর রূপে। আমি স্বপ্নে তাঁকে অভিশাপ দিতাম, মারপিট করতাম, তাঁর মুখ, দাড়ি আঁচড়ে দিতাম।

মৃত্যুর খবর বয়ে নিয়ে আসা ঐ কালো কাগজ যাদেরই এনে দিয়েছেন তোর বাবা, তাদের সবাই, বোধহয়, বেচারীর সম্বন্ধে এমন ধারণাই পোষণ করত। এখন বুঝতে পারি কেন কিছুদিনের মধ্যেই তোর বাবা এমন কঠিন অসুখে পড়লেন...

...তিনদিন বাদে আবার তোর বাবা আমাদের গেটের ফাঁকে মাথা গলালেন, আমি একা আঙ্গুরলতার নিচে বসে পোলাওয়ের জন্য কিশমিশ পরিষ্কার করছিলাম — আজ মামার কুলখানি হবে। আস্তে মুখে চুকচুক্ আওয়াজ করে তোর বাবা আমায় কাছে ডাকলেন।

'কিরে তুই ? ভয় পাস না, এটা কোন মরার খবর নয়... নে!' আবার আমায় একটা কাগজ দিলেন, খামছাড়াই কেবল একটা কাগজ, চিঠি নয়।

যখন আমি কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম, তিনি রেগে উত্তেজিত হয়ে আমাকে ঠেলে বাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমি এগোতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল যেন আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নিজের বাড়ীতে নয়, পরের বাড়ীতে, যেখানে আমার জন্যে ভয়ংকর কিছু একটা অপেক্ষা করে আছে।

এমন সময় বাবা হঠাৎ কোথা থেকে যেন এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

‘কিসের ভয় পেলি রে, ছেলে ?’

আমি তার দিকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলাম বাগানে আঙ্গুরলতার আড়ালে। চারদিক নিস্তব্ধ, রাত্রির মত আর ভয়ংকর।

বাবা পড়ল কাগজে কি লেখা, হাতে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিল যেন বোলতা কামড়েছে, তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমাকে কাছে ডাকল:

‘মেহ্দি !’ যখন আমি কাছে গেলাম, ফিসফিস করে বলল, ‘ভয়ের কিছু নেই।’ তারপর আরও নীচু স্বরে বলল, ‘এটা আমার... যুদ্ধে যাবার ডাক এসেছে... কিন্তু মাকে আপাততঃ কিছু বলার দরকার নেই।’

‘হ্যাঁ, বাবা।’

‘চালাক ছেলে।’

‘হ্যাঁ, বাবা।’

‘আরে, অমনি করে না এই ছেলে। নাক তোল, মেঘেরও ওপরে, মনে আছে তো বুরাতিনোর* কথা ?’

‘হ্যাঁ, বাবা’।

‘ঠিক আছে, চল একসঙ্গে কিশমিশ বাছি গিয়ে।’

বসলাম আমরা দু’জনে, আমাদের মাঝখানে কিশমিশের থালাটা।

‘ফারহাদমামার মত তোমাকে মেরে ফেলবে না তো ? তুমি ফিরে আসবে তো জঙ্গল থেকে ?’

‘এত জোরে কথা বলিস না !.. চেষ্টা করব, বাবা...’

‘আর তুমি কাউকে মেরে ফেলবে, সেও জঙ্গল থেকে তার আপনজনদের কাছে আর ফিরে যাবে না। তাই না ?’

‘যুদ্ধে সাধারণত দুই দলের একটি জঙ্গলেই থেকে যায়,’ বললেন বাবা, আমি কিছুই বুঝলাম না।

তখন আমি অনেক কিছুই বুঝতাম না, মারাত্, তাই আমাকে কেউ কিছু বলত না।

মামার কুলখানির পরে তৃতীয়দিন আর সহ্য করতে পারলাম না। এই উদ্দাম কান্নাকাটির আওয়াজে মামা নিজেই বোধহয় কবরে নড়েচড়ে উঠেছে। আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাই আমাকে খোলা হাওয়ায় বের করে নিয়ে এসে আঙ্গুরলতার কাছে শুইয়ে দেওয়া হল।

---

* বুরাতিনো — ছোটদের জন্য লেখা আ. তলস্তয়ের ‘সোনার চাবি’ গল্পের জনপ্রিয় নায়ক — সম্পাঃ

আমি জানি, মা'র এসব কিছুরই প্রয়োজন নেই, এই আচার-অনুষ্ঠান, এই প্রচণ্ড কান্নাকাটি, চীৎকার। কিন্তু যদি, আল্লাহ্ না করুন, তোমার বাড়ীতে কেউ মরে, তো মৃতব্যক্তির ওপর তোমার আর কোন অধিকার নেই। সে পুরোপুরি গিয়ে পড়ে বুড়ীদের হাতে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে হুড়মুড় করে তারা তোমার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে হাউমাউ করে কান্না আরম্ভ করবে আর চোখে যা পড়বে তাই গিলতে থাকবে। তাদের দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকালেও — সর্বনাশ! তোমাকে শাপ-শাপান্ত করবে আর গালাগাল দেবে কাফের বলে, এ হল সব থেকে খারাপ অপবাদ, তার থেকে কিছু বলার দরকার নেই।

...কান্নাকাটির আওয়াজ যখন সপ্তমে চড়েছে, ঠিক সেই সময় দাদু এসে পেঁৗছাল। আমি দুর্বল অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম আঙ্গুরলতার নীচে, এমনসময় দাদুর চীৎকার শুনতে পেলাম:

'নোরা, তোর মাথায় কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই! গাধীগুলোর কান্নাকাটির কি দরকার?'

'আস্তে, তোমার পায়ে পড়ি, ওদের তাড়িয়ে দিতে তো আর পারি না।'

'আর আনোয়ার? ভীতু উটপাখীর মত লুকিয়ে পড়েছে? তোরা না পারিস তো — আমি নিজে তাড়াব। কোথায় সে মরেছে, আমরা তাকে এখনও চোখে দেখলাম না। হয়ত ফারহাদ মরেই নি আর এরা হাউমাউ আরম্ভ করে দিল। দূর করে দাও সব!'

'পায়ে পড়ি, বাবা, দরকার নেই, তারপরে কি হবে?'

'জানি কি হবে।' তিনি বুড়ীদের কাছে এসে বললেন, 'এই যে সম্মানিত অতিথিরা, এতক্ষণ ধরে এখানে বসে থাকার কারণ কি? একবার খাওয়া হয়েছে — তাই যথেষ্ট। কোরানে কোথায়, কোন পাতায় লেখা আছে যে মৃতব্যক্তির জন্য কুলখানি করতে হয় তাকে চোখে না দেখেই?'

তারপর দাদু আমার কাছে এগিয়ে এল, লম্বাদাড়ি দিয়ে আমাকে ঢেকে ফেলে আমায় চুমু খেলেন। দাদুর গা থেকে খরমুজের, ঘামের আর টকদুধের মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে।

'হায়! আমার বাছার কি হাল করেছে! মুখ চোখের অবস্থা দেখ!'

'এই যে দাদু কি খবর?' যতটা সম্ভব খুশীখুশী ভাব দেখিয়ে বললাম।

'আর তোর কি খবর?'

'যেমন দেখছ, শুয়ে আছি... তুমি এমন মজার, দাদুমণি। এমন মজার লোক আর কখনও, কোথাও দেখি নি। ওদিকে কি খবর?'

'পা ছাড়াই দৌড়েছে রে, নাতি। পাগুলোকে কাঁধে ফেলেই দৌড়। হা-হা!'

'হো-হো।'

'হি-হি!'

'তোমার কানেকানে একটা কথা বলব: বাবার যুদ্ধে যাবার ডাক এসেছে।'

'জানি রে। ও আমাকে গ্রামে ফোন করেছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে গাধা হাঁকিয়ে চলে এলাম। মন খারাপ করিস না। পুরুষমানুষ হয়ে ফিরে আসবে।'

'লজ্জা করে না তোমার?'

'তোর লজ্জা করে না? সবার বাবা লড়াই করছে, কেবল তোর বাবা তোর মা'র আঁচলের আড়ালে বসে বাদাম ভেঙে খাচ্ছে।'

'আর যদি... যদি তাকে...'

'যদি, যদি! ওঠ, আর শুয়ে থাকতে হবে না!'

'চেঁচিও না আমার সঙ্গে, আমার অসুখ। আর তুমি ভাল না, বদমাস লোক।'

'তুই ওই গাধীগুলোর জন্য বলছিস?'

'না, এমনিতেই...'

'তাহলে, তুই বলছিস দাড়ি ছিঁড়তে হবে নাকি? ওকে একাকে তো ডাকে নি। আমাদের গ্রামে পড়ে আছে কেবল মেয়েরা, তারাও কেঁদে কেঁদে পাগল হল। প্রতিদিন দু'জন তিনজন করে বিধবা আর দশ-বিশজন অনাথ হচ্ছে। যুদ্ধে প্রাণবলি হবেই রে, ভাই!'

তারপর আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলা হল। ঘুমিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু রাতে অনেকবার ঘুম ভাঙল, ঘামে ভিজে এপাশ ওপাশ করছিলাম, দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলাম, ছায়াগুলি দেখে ভয় পাচ্ছিলাম, তারপর আবার তন্দ্রায় ঢুলে পড়ছিলাম। আধোঘুমে আধোজাগা অবস্থায় শুনলাম মা কাঁদছেন, বাবার আর দাদুর চাপা স্বর আবার কান্না। এমনি চলল সারা রাত। আরো কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, আমি ঘুমিয়ে না জেগে সব সময় দেখছিলাম যেন গাছে গাছে কালো পাখী

বসে আছে, কেমন সব দুর্বোধ্য ছায়া, লাল, নীল আঁকাবাঁকা দাগ আর তাদের মাঝে মাঝে উজ্জল জ্বলন্ত ফোঁটা।

সকালবেলায় আমি বুঝতে পারলাম যে এসবই ঘটেছে স্বপ্নে তবে মা'র কান্না, বাবার ও দাদুর গলা সত্যি সত্যি শুনেছি। যখন আমার ঘুম ভাঙল, মা তখনও ঘুমোচ্ছেন; বাবা বলল যে মা মাত্র আধঘণ্টা আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবা আর দাদু মোটে ঘুমোনই নি।

আমি মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, মা'র এখন কি অবস্থা হবে? মা যদিও লুকোবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমি তো জানি, বাবাকে ছেড়ে মা একদিনও থাকতে পারেন না। বাবা তাঁর কাছে সবকিছু। বাবা মা'র জন্য যত কিছু করেন, তা অন্য কোন পুরুষমানুষ নিজের স্ত্রীর জন্য করেন না, অন্তত পক্ষে আমাদের পাড়ায়। মা যখন অনেক কাচাকাচি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন বাবা রাগ করেন, মা কোথাও কাজে আটকে গেলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যখন বরফ পড়ে বাবার ভয় হয় যে মা পিছলে পড়ে যাবেন। বাবার ভয় — আমার সরল, জীবন, লোকজন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মাকে কেউ ঠকাবে, মনে কষ্ট দেবে।

তাদের দু'জনেরই ভাল লাগে এমন অবস্থা — মা'র ভাল লাগে ব্যস্ততা আর দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে মেঘে মেঘে ভেসে বেড়াতে আর বাবার ভাল লাগে নিজেকে শক্তিশালী, দৃঢ়চিত্ত, বাস্তববাদী ভাবতে, নিজেকে মা'র চোখ আর হাত বলে ভাবতে।

আমি কিছু ভাবতে পারছি না, আমার এমন মিষ্টি মা'র কি হবে এখন। বেচারী...

সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি আর সহজভাবে ঘটে গেল — বাবা যেন কাজে কোথাও বাইরে যাবার তোড়জোড় করছেন। বাবার সহকর্মীরা এল, চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল, খাওয়াদাওয়া করল। আমি উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, সবাই আমার কথা ভুলেই গেল, তখন আমার মাথায় কি চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তা এখন আর আমার মনে নেই। মনে আছে কেবল যে মা'র জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল, কি যে হবে আমাদের ভেবে পাচ্ছিলাম না। তারপর সবাই উঠোনে বেরিয়ে এল; বাবাকে পুরনো পোশাকপরা অবস্থায় দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তাঁকে বিশ্রী দেখাচ্ছিল। মা'র দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল আমার... বাবা আমাকে তুলে নিয়ে বলল:

'এই ছেলে, নাক আকাশে তোল বুরাতিনোর মত! আমি যখন ফিরে আসব তখন আমরা আবার হাসব, ভাল থাকিস!'

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার গালের ওপর যেন কিসের চাপ পড়ছিল। বাবা তাড়াতাড়ি আমার কপালে চুমু খেয়ে, কাঁধে চাপড় মেরে কি যেন বললেন, তারপর সবাই মিলে গেটের বাইরে বেরিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

গাড়ীতে চড়ে চলে গেল সবাই। আমি বাবার পিছন পিছন দৌড়তে গেলাম কিন্তু ধুলোয় বিষম খেয়ে কাশতে কাশতে পিছিয়ে পড়লাম।

আরে ব্যাস, ব্যাস, নাকেকান্না কাঁদার দরকার নেই, তাতে কোন কাজ হবে না, আর বুরাতিনোর মত নাক উঁচু কর। এবার পুরুষমানুষ হতে হবে — বয়স তো সাত বছর হল, আরও বেশী, এখন তোমার দায়িত্বে রইল মা। আরে, ও কিছু না, বাবা ফিরে আসবেন, আমরা আবার হাসব, এমন হাসব যে পেটে ব্যথা ধরে যাবে; একটু মন খারাপ লাগছে যে তোমায় স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গেল না, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়, বিশেষ করে তোমাকে যখন সবকিছুর জন্য, এমন কি বাড়ীর জন্যও কৈফিয়ৎ দিতে হবে...

উঠোনে ফিরে এলাম, সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, যেখানে বাবা আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাছেই কি একটা আওয়াজ হল খট্ করে — আর আঙ্গুরলতায় লাগান ছোট লাউড্স্পীকারটা থেকে ভেসে এল আমার বাবার গলা:

'ব্যায়াম আরম্ভ কর! হাত কোমরে, পা ফাঁক করে কাঁধের সঙ্গে এক লাইনে রাখ, আরম্ভ কর — এক, দুই, তিন... সাবাস, ছেলে, এইভাবে চালিয়ে যা...'

'বাবা!' চীৎকার করে উঠলাম আমি, 'বাবা, এ সবকিছু ঠাট্টা, তুমি চলে যাও নি, না, না... যাক চলে,' নিজেকে বললাম, 'আমি আর মা কিন্তু প্রতিদিন সকালে বাবার গলা শুনব, ভাল লাগবে আমাদের। বাবা যা বলবেন আমি তাই করব, দৌড়ব, লাফাব, নুয়ে পড়ব, বাবাকে আমি মনে রাখব আর ভালবাসব...'

৩

দু'দিন মা কিছুই করতে পারলেন না, কেমন যেন দিশাহারা, অন্যমনস্কভাব। মুখচোখের চেহারা বদলে গেল, আগের মত আর তত সুন্দরী নেই, তার কারণ মা ভুলে গেছেন যে তিনি মেয়েমানুষ, যে নিজের একটু যতন নিতে হয়, চুলটা আঁচড়ান, মুখে একটু ক্রীম মাখা দরকার। সারাদিন লম্বা কালো পোশাকটা পরেই কেবল ঘুরে বেড়ান

আগে যেমন দিনে দশবার পোশাক বদলাতেন এখন আর তা বদলাচ্ছেন না।

বাবার জিনিসগুলো হাতে নিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন, সেগুলোকে চুমু খাচ্ছেন আর কাঁদছেন।

আমি আর দাদু দিশাহারা হয়ে গেলাম — মা অসুখে পড়ল নাকি?

দাদুকে বললাম, 'কিছু বল না তুমি মাকে, তোমার মেয়ে তো।'

দাদু কাঁধ ঝাঁকালেন দিশাহারাভাবে কি যেন বিড়বিড় করলেন, তারপর মা'র ঘরে গিয়ে ঢুকলেন কিন্তু ঠিক এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন আমার কাছে আরও মনমরা হয়ে।

'তোর পাগল মাকে নিয়ে কি করি বল তো? তুই যা' দেখি, তুই তো ওর ছেলে...'

এবার আমার পালা।

'মামণি কাঁদে না আর... আমি তোমার সব কথা শুনব, তোমার মনে কষ্ট দেব না, দেখো।'

মা কেমন যেন ম্লান হেসে, আমাকে বুকে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগলেন।

রাতের বেলায় শেষ পর্যন্ত মা যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, আমি লুকিয়ে ফেলতাম বাবার জিনিসগুলো, প্যাণ্ট, পাজামা, টুপি, আঙ্গুরলতার আড়ালে সেগুলোকে রেখে দিতাম।

তারপর সেদিন যখন পাড়ার সব মেয়েরা, যাদের স্বামী আর ছেলেরা যুদ্ধে গেছে, জড় হল এক প্রতিবেশীর ঘরে, মাও সেখানে গেলেন, প্রাণভরে কাঁদলেন তারপর ফিরে এসে বললেন:

'কাল আরও একটা হাসপাতাল খোলা হচ্ছে, আমি সেখানে কাজ করতে যাব।'

'ঠিক।' বললেন দাদু, 'বুদ্ধির কথা। কিছুদিন কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়া, তারপর ছেলেকে মানুষ করবি। ও ততদিন অপেক্ষা করবে।'

'না গো, বাবা। বোকাসোকা, ছিমছাম, সুন্দরী বউ সেজে থাকলে আর চলবে না। ভাবতাম, আনোয়ার কয়েক মাসের জন্য কোথাও চলে যাক, আমি যাতে নিজের ওপর নির্ভর করতে শিখি। সবকিছু নিজে হাতে করতে, নিজে চিন্তা করতে, পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে... সেই চলে গেল...'

ওঃ আমার দাদু! কারুর সঙ্গে ঝগড়া না বাধিয়ে এক মিনিটও থাকতে পারেন না! উদ্যম, শক্তি অনেক, কিন্তু কাজে লাগাবার কোন জায়গা নেই।

আজ শুক্রবার, বড় নামাজের দিন। মসজিদে ভীষণ ভীড়।

দাদুর খুব খারাপ অবস্থা, একটুখানি গোলমালও দাদু সহ্য করতে পারেন না আর এই হাজার কণ্ঠের একঘেয়ে চীৎকার, বাস্কারভিলের কুকুরের গল্পের মত।

দাদুর মুখের চেহারা ম্লান হয়ে যায়, রাগে ঠোঁট কামড়ে ধরে তারপর আর থাকতে না পেরে ছুটে বেরিয়ে যান রাস্তায়।

আমার দাদু যখন রাস্তায়, তখন আশপাশের বাড়ীর লোকেদের মুখ না দেখানই ভাল, দাদু তাদের জটিল প্রশ্ন করে এমন ধাঁধায় ফেলে দেবেন আর তাদের ব্যাখ্যা না শুনে নিজেই বকবক করেই যাবেন। আমার নির্ভীক সমালোচক দাদু, আর ঠিক কথায় কাফের দাদুর নামে রাত্রিবেলায় যেসব বাচ্চারা বায়না করে, তাদের ভয় দেখান হয়। যেই বলে, মেহ্দির দাদুকে ডাকব তোদের খেয়ে নেবে, অমনি সব বাচ্চারা ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে...

তুই আমার দাদুকে তো অল্পই জানিস মারাত্। দাদুর স্বভাব ছিল বৈপরীত্য আর হেঁয়ালিতে ভরা। তাঁর মধ্যে ছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় নাসিরুদ্দিনের জ্ঞান আর সরলতা।

'খোদা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন,' বলতেন দাদু, 'খোদার সম্বন্ধে বলা দরকার নীচুস্বরে অথবা কিছু বলারই দরকার নেই। খোদাকে নিজের দেহের মধ্যে সব সময় বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় প্রাণের মত।'

সেইজন্যই তো প্রতিবেশীরা ভাবত দাদু পাগল, নাস্তিক, দাদুকে নিয়ে তারা হাসাহাসি করত, ভয় পেত তাঁকে। আর মোল্লা কালান্তর এমনকি হুমকি দিয়েছে যে মুসলমানদের কবরখানায় দাদুকে কবর দিতে দেবে না।

...যখন মারা গেলেন আমার দাদু, তাঁকে কবর দেওয়া হল একেবারে আলাদাভাবে, যেখানে তুলোর ফুল ফুটেছিল, সেই মাঠের এক প্রান্তে, যেখানে দাদু শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন।

অল্প কিছুদিন আগে যখন বাবা আর আমি গ্রামে গিয়েছিলাম, দাদুর কবরের ওপরের ঢিপিটা আর খুঁজে পেলাম না, সে জায়গাটা সমান করে ফেলে বেদানাগাছের সারি বসান হয়েছে। প্রতিবছর শরৎকালে বেদানাগুলি যখন পেকে মাটিতে পড়ে, তারা দাদুর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তখন দাদু আমাদের সবার স্বপ্নে দেখা দেন...

সকালবেলায় মা চলে গেছেন হাসপাতালের কাজে, সারা বাড়ীতে আমি একা পড়ে রইলাম। প্রথমে আমি এঘর-ওঘর করে বেড়ালাম, তারপর জানি

না কেন বাবার টেবিল ঘাঁটাঘাঁটি করলাম কিছুক্ষণ, আমাদের ছবির এলবামের পাতা উল্টাতে লাগলাম, দেখতে পেলাম ফারহাদমামাকে, প্রায় প্রতি পাতাতেই মামা, মামা আর মামা। একটা ছবি আমার খুব ভাল লাগল। মামা আঙ্গুরলতার নীচে চেয়ারে বসে আছেন, আর আমি তাঁর কোলে।

'কি গো, মামা... তোমার কি এখনও মন কেমন করে না আমাদের জন্য?'

'এই ছেলে... আয় আমরা আমাদের সেই গানটা গাই।'

'আজ আমার কেমন যেন গাইতে ইচ্ছে করছে না, রাগ কোর না।'

'গা, আমি বলছি।'

'ঠিক আছে... "সবুজ, আজর..." তুমি বল, মামা! মামা! বাবা যুদ্ধে চলে গেছে...'

'তুই আমোদভরা কথাটা বাদ দিয়েছিস, আবার শুরু কর: "আমোদভরা, আমোদভরা, আমোদভরা..."'

এলবামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম উঠোনে তারপর আঙ্গুরলতার কাছে ডালপালা আর পাতা দিয়ে তৈরী আমার ছোট্ট বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে রইলাম... আর ঠিক তখন তোকে প্রথম দেখলাম, মারাত্...

নোংরা, এলোমেলোচুল, আঢাকা হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসা বাবার কোটপরা আর পিঠে পিয়নের বিরাট ব্যাগটা ঝুলিয়ে তুই আমাদের গেটের মধ্যে মাথা গলিয়ে চীৎকার করলি:

'চিঠি আছে!'

সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম তোর বাবার ব্যাগটা, ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম লুকিয়ে বসে অপেক্ষা করব।

'এই যে, চিঠি আছে!' বলে তুই সত্যি সত্যি ব্যাগের থেকে একটা চিঠি বার করলি, কালো কাগজ নয়, খামে ভরা চিঠি।

আমি লাফিয়ে নীচে নামলাম, কিন্তু তাহলেও হাতের মুঠিটা পাকিয়ে এগিয়ে গেলাম তোর দিকে।

'দে।'

তুই কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলি:

'পদবী?'

'তাতে তোর দরকার কি?'

'তাহলে পাবি না। তোর পদবী হয়ত নুরভ নয়, বুরভ।'

প্রচণ্ড রেগে গেলাম আমি। তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মারতে, কামড়ে দিতে চাইলাম — তোর বাবার ওপর রাগে, কালো কাগজগুলোর জন্য, তুই এমন বুদ্ধু সেই রাগে, কিন্তু শক্তিতে আমি তোর সঙ্গে পারব না। তুই আমার চেয়ে একহাত লম্বা, কাঁধ চওড়া, আর দেখে মনে হয় মারপিটও মন্দ করিস না।

'আমি কে তাহলে? না হয় তোর বাপকে গিয়ে জিজ্ঞাস কর, কিছুদিন আগে আমাদের যে কাগজটা এনে দিয়েছেন তাতে কি পদবী লেখা ছিল।'

একথায় তোর মুখচোখের ভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল, দেমাক মিলিয়ে গেল একেবারে; দেখে বোঝা যায়, বাবার কাজের জন্য তোর লজ্জা হল যে তিনি ফারহাদমামার সম্বন্ধে এমন খবর আমাদের এনে দিয়েছেন।

'রাগ করিস না,' তুই বললি। 'নে, এটা বোধহয় তোর বাবার চিঠি। বোধহয় সব খবর ভালই।'

'ঠিক বলছিস?'

'নিশ্চয়ই। এই মাথার দিব্যি। আমি তো জানি, যখন নিজে চিঠি লিখেছেন, তার মানে বেঁচে আছেন আর অক্ষতও। দে, আমি পড়ে দেব তোকে।'

'পড়্... না, না দরকার নেই।'

মাকে জিজ্ঞাসা না করে চিঠি খুললে রাগ হবে মা'র।

'না,' বললাম আমি, 'আমি তোর থেকে ভালই পড়তে পারি।'

তুই চলে না গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলি, হাতে ফুঁ দিলি যেন সেগুলো জমে গেছে, তারপর হঠাৎ বললি:

'আয়, আমরা বন্ধু হই কেমন? আমার সঙ্গে তোর একঘেয়ে লাগবে না। আমি অনেক ডাইনী জাদুকরের গল্প জানি, তাছাড়া আমি অনেক ভাল ভাল স্ট্যাম্পও পাই।'

তোর মুখেচোখে এমন দুঃখ আর মিনতির ভাব ছিল যেন আমাদের এই বন্ধুত্বের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

'তোর কি একা একা ভাল লাগে না?'

'না, তা নয়। তোকে প্রথম থেকেই কেন জানি আমার ভাল লেগে গেছে।'

আমি ভাবলাম, 'পিয়নের বন্ধু হওয়া বেশ মজারই ব্যাপার। ও আমাকেই প্রথম এনে দেবে আমার বাবার চিঠি, কোথায় কি ঘটছে বলবে।' কিন্তু হঠাৎ আমার ভয় হল, আর যদি ও বাবার মৃত্যুর খবর লেখা কালো

কাগজ নিয়ে আসে তাহলে... তাহলে কি হবে, মারাত্‌? তোকে তখন আমি কি চোখে দেখব? তোকে মেরে ফেলতে তো আমার তখন কষ্ট হবে— তুই যে আমার বন্ধু। কি করব তখন?

তুই বুঝতে পারলি আমার মনের কথা:

'ভয় পাচ্ছিস যে আমি?..'

'না, ভয় পাচ্ছি না, তা হবে না কখনো, তাই না?'

'এই জন্যেই কেউ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় না... পুরনো সব বন্ধুরা আমার শত্রু হয়ে গেছে... কারণ আমি তাদের ঐ কাগজ এনে দিয়েছি... কিন্তু আমার তো কোন দোষ নেই! বড়রা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে তা'হলে আমি কি করতে পারি? আমাদের কি দোষ?'

'না, আমি ভয় পাই না,' বললাম আমি, 'আমরা বন্ধু হব। যাই ঘটুক না কেন আমরা বন্ধুই থাকব।'

এইভাবেই তোর আর আমার বন্ধুত্ব শুরু হল, মারাত্‌...

সারাদিন গেল, সন্ধ্যা পর্যন্তও মা বাড়ীতে নেই। পেটে খিদে নিয়ে বাড়ীময় ঘুরে বেড়ালাম, এত আঙ্গুর খেয়েছি যে বমি পাচ্ছে, পেটের ব্যথায় কয়েকবার মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছি। এইভাবে আমার জন্য কাটল মা'র নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রথম দিন।

আমি অধীর হয়ে পড়ছিলাম— মা আমাকে একেবারেই ভুলে গেছে, নিজে বোধহয় হাসপাতালে সুস্বাদু সুপ আর কাটলেট খাচ্ছে আর এদিকে টক আঙ্গুর খেয়ে আমার পেট ফেঁপে উঠেছে, এবার মনের দুঃখে ফেটেই যাবে পেটটা।

অনেকবার ভাবলাম প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে বাবার চিঠিটা পড়িয়ে নেব, তারপর চিঠিটা মাকে না দেখিয়েই ছিঁড়ে ফেলে দেব। বাবা বোধহয় আন্দাজ করেছে যে মা আমায় খিদেয় কষ্ট দিয়ে মারছে, সেইজন্য চিঠি ছেঁড়বার জন্য বাবা রাগ করবে না। আর সোজা কথায় বাবা আমাকে লিখেছে, মাকে তো লেখে নি। যদি বাবার চিঠিতে মা'র প্রয়োজন থাকত তা'হলে বুঝতে পারত যে চিঠি এসেছে আর ছুটে আসত।

আমি মা'র ওপর রাগে ইচ্ছে করেই ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রথমে ঘুমোচ্ছিলাম একটা কান খুলে রেখে, মা আসছে কিনা শোনার জন্য, কিন্তু

মা'র জোরে হেঁটে আসার তুক-তুক শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, তারপরে আমি আর শুনছিলাম না মোটেই।

বাবাকে দেখলাম স্বপ্নে। দেখলাম তাঁর মুখটা। মস্ত বড় মুখ, সিনেমায় যেমন দেখায় তেমন। খালি মুখটা, ব্যাস। বাবা কিছু বলছিলেন না, আমার দিকে তাকিয়েছিলেন কেবল। বাবা চুপ করে আছেন, আমিও চুপ করে আছি।

'কি হয়েছে তোর, বাছা?' শুনলাম মা'র গলা, 'কিসের ভয় পেলি, সারা শরীর কাঁপছে?'

চোখ খুললাম! মা এসেছেন!

'না, আমি কাঁপছি না, বাবা তো খারাপ কিছু করে নি।'

'বাবাকে স্বপ্নে দেখেছিস? তুই এমন চেঁচাচ্ছিল যেন তোকে কেউ মারছে।'

'না, কেউ আমাকে মারে নি।'

আশ্চর্য: আমি ঘুমের ঘোরে চেঁচাচ্ছিলাম কেন?

'তুমি অনেকক্ষণ এসেছ?'

'এই তো পোশাক ছাড়লাম... ওঃ কি কাণ্ড, জানি না কি করব। সবই প্রায় ভুলে গেছি!'

'তোমার খিদে পেয়েছে মা?'

'ভীষণ, লাইব্রেরী বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসেছিলাম, অনেক বই পড়েছি, তবুও ভয় করছে... যাই কিছু আঙ্গুর ছিঁড়ে আনি, এখন আমরা খাব।'

ওঃ! আঙ্গুরের কথা শুনে আর একটু হলে চীৎকার করে উঠতাম। কিন্তু মাও তো সারাদিন কিছু খান নি, মাকেও কিছু বলা যায় না।

আমি ঘুমের মধ্যে চেঁচাচ্ছিলাম, বোধহয় এই কারণে যে, বাবাকে আমার খিদে নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছিলাম। বোকা আমি, বোকা।

মা একথালা আঙ্গুর খেল আর আমি একটা আঙ্গুর মুখে দিলাম তাতেই প্রায় বমি ঠেলে এল।

'চিঠি, বাবা লিখেছে,' বললাম আমি।

'বাবার? এতক্ষণ চুপ করেছিলি কেন?' মা খামটা হাতে নিয়ে এপাশ ওপাশ দেখলেন। তারপর একটু শান্ত হয়ে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন, "প্রিয় নোরা আর সবাই..."

'নোরা মানে তুমি বুঝলাম,' থামিয়ে দিলাম মাকে, 'আর 'আর সবাইটা' কে ?'

'তুই আর দাদু।'

'আচ্ছা !'

'কাজালিনস্ক স্টেশন থেকে লিখছি, এখানে আমাদের ট্রেন আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। কাল সকালে আমরা পেঁছে যাব রাশিয়াতে, সেই মাটিতে যাকে রক্ষার জন্য আমাদের লড়তে হবে। আমার সঙ্গে চলেছে আমারই মত সাদাসিধে, মরনশীল কিছু মানুষ যারা কিছু দিনের জন্য, হয়ত বা বরাবরের জন্যই বাড়ী ছেড়ে এসেছে। তারা একথাও না ভাবার চেষ্টা করে, যে তাদেরও কখনও মানুষ মারতে হবে। করার কিছু নেই — যুদ্ধ !

'সবকিছু এমন অপ্রত্যাশিত। এই নতুন পেশায় অভ্যস্ত হতে তাদের আরো অনেক সময় লাগবে। আর অনেকে হয়ত অভ্যস্ত না হয়েই চলে যাবে। এরা হল সেই দলের লোক যারা সারা জীবন তুলো আর আঙুরের চাষই করেছে, একটা গুলির আওয়াজও শোনে নি। আর এখন পৃথিবীতে সব থেকে কঠিন কাজ করতে যাচ্ছে...'

তারপরে একশবার 'প্রিয়তমা নোরা', 'ভালবাসি' আর হাজার উপদেশ — কেমন করে থাকতে হবে, কি খেতে হবে, কেমন করে রাস্তা দিয়ে চলতে হবে — তিন বছরের মত উপদেশ।

'কি মিষ্টি পাগল তোর বাবা,' বললেন মা। 'ভালবাসার কথা এমন খাপছাড়াভাবে লেখে।'

৪

আজকের দিন যে মা'র জীবনে এক বিশেষ দিন, তা বুঝি।

এর বহুবছর পরে যেদিন জীবনে প্রথমে শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলাম আমিও এমনিই উদ্বেগ বোধ করেছিলাম। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, মারাত্ ? ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে বেরনোর পর আমাদের একটা স্কুলে পড়াতে পাঠানো হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যের ক্লাস নেবার কথা। তোর মনে আছে, আমার প্রথম ক্লাস নেবার দিনে তোর কোন কাজ ছিল না আর আমি যাতে দুশ্চিন্তায় না পড়ি সেই জন্য তুই আমার ক্লাসে বসেছিলি। শেষ বেঞ্চিতে বসে উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে তুই আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছিলি। কয়েক মিনিট আমি দাঁড়িয়েছিলাম ছাত্রদের সামনে আর একটা কথাও বলতে পারি নি, যদিও খুব ভাল করেই জানতাম কি বলতে হবে।

ছাত্রেরা হাসাহাসি আরম্ভ করল, তাতে আমার আরও ভয় ধরে গেল। আমি সবকিছু ছেড়ে ছুটে পালাব ভাবছিলাম। এমন সময় তুই হঠাৎ উঠে বললি:

'চিন্তা কোরো না, ছেলেরা! তোমাদের মাস্টারমশাই তাড়াহুড়ায় আমার নোটগুলো নিয়ে চলে এসেছেন। আর এখন আমার বিশ্রী হাতের লেখা পড়তে পারছেন না।'

ছেলেরা হেসে উঠল, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার শিক্ষকজীবনের প্রথম কথাটা বললাম, 'খাতা বার কর সবাই।' সেই মুহূর্ত থেকে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল।

মা'রও এখন সেই অবস্থা।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, মা। আহতরা তোমাকে ভালবাসবে আমি জানি, খালি ভয় পেও না,' ভাবছিলাম আমি আঙ্গুরলতার মাচার ওপর বসে। সপ্তাহে একবার আমি এখানে উঠে আসি বিনাপয়সায় সিনেমা দেখবার জন্য। আমাদের রাস্তাটা যেন একটা বিরাট রঙ্গমঞ্চ আর অভিনেতা অভিনেত্রীও অঢেল। কোথাও লুকিয়ে বসে সবকিছু লক্ষ্য কর, কেবল তোমায় কেউ যেন দেখতে না পায়, অনেক অনেক মজার জিনিস দেখতে পাবে।

এই যেমন প্রতিদিন সকালবেলায় উল্টোদিকের বাড়ীর গেট থেকে বেরিয়ে আসে বুড়ো সিরাজ-বোবো। বেরিয়ে আসে, তারপর মাথাটা ওপর দিকে তুলে একমনে আকাশ দেখে যেন আকাশে একটা উড়ন্ত গাধাকে দেখতে পেয়েছে। দেখে আর খালি খালি বিনা প্রয়োজনে প্যাণ্টটাকে টেনে টেনে ওপরে তোলে।

প্যাণ্ট পরতে আরম্ভ করেছে সে কিছুদিন মাত্র হল যখন থেকে সে সেমই ফ্যাক্টরীতে পাহারাদারের কাজে লেগেছে, তাই এখনও ঠিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। আগে যখন ছেলে যুদ্ধে যায় নি, বুড়ো কোথাও কাজ করত না আর সাদা পায়জামা পরে ঘুরত। তাতে গরম লাগে না আর চা-খানাতে আরাম করে বসা যায়। আর মসজিদেও যাওয়া চলে। প্যাণ্ট পরে মসজিদে গেলে তো সবাই হাসাহাসি করবে।

সিরাজ-বোবো দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দশ মিনিট, আধঘণ্টা যতক্ষণ না ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যায়। তারপর বালাপোশের পোশাকের ভিতর থেকে একটুকরো তুলো ছিঁড়ে নিয়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় আকাশে আর খুশীখুশীভাবে তুলোটার উড়ে যাওয়া দেখে, লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, হাত নাড়ে, এমনি চলে যতক্ষণ না তুলোটা গিয়ে গাছের পাতার মাঝে আটকে যায়।

বাবা বলেন যে বুড়োর এখন এমন বয়স যে ছোটবয়সে যা করেছে তা আবার করতে ইচ্ছা হয়। আমার ঐ বয়সে কি যে হবে কল্পনা করতে পারি! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বুদ্ধুর মত এই আঙ্গুরলতার মাচায় বসে দেখতে থাকব কে কোথায় গেল, কেন গেল। লোকেরা আমাকে ডাকবেও তাই বলে: মাচায় বসা বুড়ো বুদ্ধু। চমৎকার অদৃষ্ট!

কিংবা আর একটা সিনেমা। এরাও প্রতিবেশী—বুড়ো আর বুড়ী। তাদের পরস্পরের মুখেচোখের এমন মিল যে গতবছর অবধিও আমি ভাবতাম যে তারা যমজ। কিন্তু বাবা বলল যে ওরা স্বামী-স্ত্রী, আমি অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি নি যে এমন বুড়োবুড়ী আবার স্বামী-স্ত্রী হয়। আমি ভাবতাম, স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই হতে হবে অল্পবয়সী আর তারা বুটেনগট্ না হটেনগট্, ঠিক মনে নেই, দম্পতির মতো নিজেদের প্রেমের কাহিনী লিখবে।

বুড়োর নাম মক্কা আর বুড়ীর মদিনা। তারা রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তারপর আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজেদের ফটকটাকে ভাল করে দেখতে থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাঁদে, পরস্পরের প্রতি গজগজ করে। হায় কপাল, কি পুরনো হয়ে গেছে ফটকটা, ফেটে গেছে তাদের প্রিয় ফটক, তাদের যৌবনের নীরব সাক্ষী! জীবন কি নিষ্ঠুর, সেই ফটকটাকেও ছেড়ে দেয় নি। যা ছিল তাদের বংশের গর্ব, প্রতিবেশী আর দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের ঈর্ষার কারণ।

তাদের ফটকটা সত্যিই চমৎকার, বিরাট, ভারী, সব থেকে মজবুত কাঠ—কারাগাছ দিয়ে তৈরী, বুটি আর খোপের প্যাটার্ন করা যেন কার্পেট। এই ফটকের অধিকার আসে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে, এই ফটক যায় এক শহর থেকে আর এক শহরে।

দেখা গেল, মক্কা ও মদিনা অত্যন্ত অযোগ্য মালিক। তাদের চোখের সামনেই ফটকটা বিপজ্জনকভাবে শুকিয়ে ফেটে যেতে লাগল; যাতে একেবারে নষ্ট হয়ে না যায়, বুড়োবুড়ী ফটকটাকে কেরোসিন দিয়ে পরিষ্কার করে রোজ সকালে। ঘষে, ঝগড়া করে, কাঁদে, কিন্তু বৃথা। পরের দিন ফটকে আর একটা ফাটল দেখা দেয়—কাল, করার কিছুই নেই। এই সিনেমাটায় কেবল একটা জিনিস আমার উদ্বেগের কারণ: বুড়ো-বুড়ী মরে গেলে ঐ ফটকটা কে পাবে, উত্তরাধিকারী বলতে তো ওদের কেউ নেই?!

এমনি আরও অনেক ছবি আছে আমার ভাণ্ডারে, কিন্তু সবকিছু

এখনই বলে দিলে একঘেয়ে লাগবে। তাছাড়া নীচে রাস্তা দিয়ে মারাত্, তুই আসছিস। তোর মুখচোখ বিষণ্ন।

সব ভুলে যা, বুরাতিনোর মত নাক কর! কিন্তু তুই দেখছি জানিসই না সেটা আবার কে। ছেলেবেলায় তোর ছিল কেবল তোর আর তোর দাদুর বানানো ডাইনী আর জাদুকরের গল্প, একটাও ভাল গল্প শুনিস নি। ভাল, আলোভরা গল্পগুলো আমাদের খুব দরকার বন্ধু, আমাদের সাতবছরবয়সীদের আর ত্রিশবছরবয়সীদেরও, বিশেষ করে ত্রিশবছরবয়সী-দের। কারণ সেগুলো ছাড়া কবির ভাষায় "মানুষ, পশু কেউই... বাঁচতে পারে না।"

'এই, মারাত্!'

আর কেবল তখুনি আমি দেখতে পেলাম যে তোর গায়ের জামাটা ছেঁড়া।

'মারপিট করেছিস?'

'ঘেন্না ধরে গেছে, মেহ্দি! আর পারছি না। প্রতিদিন কালো কাগজ — মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু... আর আমি যেন দোষী।'

মুখ কুঁচকে তুই জামাটা খুললি আর আমি হায় হায় করে উঠলাম — সারাপিঠ ভর্তি কালশিটে।

'কে তোকে মেরেছে? বল, আমরা প্রতিশোধ নেব।'

'দূর বোকা! আমি এক বুড়োকে এনে দিয়েছি কালো কাগজ আর বুড়ো লাঠি দিয়ে আমাকে মারতে আরম্ভ করল... আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, পালাতে পারলাম না।'

'তোকে কোনদিন মেরে ফেলবে এইভাবে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমরা, তারপর আমি বললাম:

'জানিস, আমি এখন... শোন, আমার বাবা না বাড়ীতে, বুঝলি? বাবা মোটেই যুদ্ধে যায় নি। সবাই ভাবছে বাবা যুদ্ধে গেছে, এদিকে বাবা বাড়ীতে লুকিয়ে আছে।

'দিব্যি দিয়ে বল!'

'সত্যি বলছি। চল্।' তোকে বিছানায় বসালাম, তারপরে ঘরে বাবার গলা শোনা গেল:

'ব্যায়াম আরম্ভ কর! হাত কোমরে, এই ছেলে...'

তুই হতভম্ব হয়ে গেলি আর আমি হাসতে লাগলাম হা-হা করে:

'আমার বাবা, সত্যি বলছি। তোর বিশ্বাস হল এখন, বিশ্বাস হল?'

তুই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলি কি ব্যাপার, বললি:

'কে মাথা খাটিয়ে বার করেছে এটা ?'

আমি তো জানতাম যা ঘরে বাবার গলা রেকর্ড করা একটা ডিস্ক আছে; যেই আমি বিছানা থেকে উঠি অমনি ডিস্কটা চলতে আরম্ভ করে আর আঙ্গুরলতায় লাগান ছোট লাউডস্পীকারটা দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে বাবার আদেশ, কিন্তু আমি তোকে এসব বুঝিয়ে বলতে পারি নি, জানিস, পারি নি, কারণ আমি বিশ্বাস করতে চাইতাম না যে, এটা একটা সাধারণ রেকর্ড, বাবার সত্যিকারের, জীবন্ত গলা নয়, যে গলার স্বর আমাকে সব সময়ে সাহস যোগাত। পরে এমনকি আমার খুব মন খারাপ লেগেছিল যে তোকে আমার গল্পের গোপন কথাটা বলে দিয়েছি...

তুই বোধহয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পারলি, তুই বললি:

'আমি... আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছি যে, এ তোর বাবা। আমি এমন কি জানি যে তুই যদি তোর বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিস তো তিনি তার উত্তরও দেবেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি...'

৫

আমি ভাবলাম, মা কি খুশীই না হবে যদি মারাত্ আর আমি মাকে আনতে হাসপাতালে যাই — কাজের প্রথম দিন মা ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল। আমাদের দেখে মা বুঝতে পারবে যে আমরাও মা'র সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন বোধ করছি।

মারাত্ জানত, হাসপাতালটা কোথায়, চললাম আমরা সেদিকে। বাড়ীর বেশী দূরে যাবার বারণ ছিল আমার কারণ আমাদের শহরের গলি-ঘুঁজিতে পথ হারান খুব কঠিন ব্যাপার নয়। আর সেই দিনই প্রথম আমি নিষেধ ভাঙলাম।

আমার চোখের সামনে এক অদ্ভুত জগৎ খুলে গেল! আমরা একজন একজন করে চলছিলাম, আমাদের শহরের সরু সরু রাস্তাগুলি দিয়ে এইভাবেই খালি চলা যায়। প্রতিপদে একটা করে মসজিদ — মাথা তুললেই দেখা যায় সারসের বাসাভরা নীল টুপি আর ঐ টুপিগুলো থেকে বাড়ী, গাছ, লোক সবকিছুই মনে হচ্ছে নীল, যদিও রাস্তাগুলি আসলে বিষণ্ণ, বাড়ীগুলি জানলাহীন, কেউ মাথা বার করে বলবে না, 'এই যে, কি খবর!' তারপর হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সামনে মাথা

ফুঁড়ে উঠল অনেকগুলি জানলাওয়ালা একটা পাকাবাড়ী — তখনকার দিনে ইউরোপীয় ধরণের একমাত্র এই বাড়ীটাতে বহুবছর পরে আমি পড়াশোনা করেছি, এখানেই আমাদের ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

'থামলি কেন?' মারাত্ আমাকে ঐ বাড়ীটার দিকে ঠেলে দিল আর আমি জানলার দিকে তাকালাম যুদ্ধ থেকে আসা জীবন্ত সত্যিকারের আহত লোক দেখবার আশায়।

'ওদিকে যেতে পাবে না।' হাতে লাল কাপড়ের পটি বাঁধা এক মহিলা আমাদের থামিয়ে দিল।

'মা'র কাছে,' বললাম আমি, 'মা এখানে কাজ করে।'

'মা'র কাছেও যাওয়া বারণ। মা ব্যস্ত।'

'ওদের বাড়ীতে আগুন লেগেছে, মাসি।'

'মিথ্যা বলছিস না তো?' মহিলাটি মারাতের হাত ধরল।

'বাজে কথা বলছে,' তাড়াতাড়ি বললাম আমি, কারণ জানি যে যদি মাকে বলে যে বাড়ীতে আগুন জ্বলছে মা অজ্ঞান হয়ে যাবে।

'আঃ বাজে কথা!' মহিলাটি বেচারী মারাত্কে শিক্ষা দিতে লাগল, বড়রা যারা যুদ্ধে গেছে, তাদের সম্বন্ধে কিসব বলল; বলল বাচ্চা ছেলেদের কথা যারা মিথ্যাকথা বলে... ভাল কথা যে আমাদের পেছনে একটা গাড়ী টানাসুরে হর্ণ দিল, আমরা লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেলাম।

'আহত সৈন্যরা,' ফিসফিসিয়ে বলল মারাত্।

বড় লাল ক্রসআঁকা গাড়ী থেকে স্ট্রেচারগুলো বার করে নামাতে লাগল হাসপাতালের পরিচারকরা — একটা, দুটো, তিনটে, সাতটা... আমি তাদের দিকে দেখছিলাম আর শুকিয়ে যাওয়া, নীল পাগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না — সবাই অপরিচিত, অজানা। তুমি যে ওদের মধ্যে ছিলে না, বাবা, এই রক্ষে। ওদেরকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের পাশ দিয়ে — তাদের থেকে বেরোচ্ছে রক্তের গন্ধ, যুদ্ধের গন্ধ।

'ব্যাস,' লাল কাপড়ের পটি বাঁধা মহিলাটি বলল। 'একে আপাততঃ গাছের নীচে শুইয়ে দাও, জায়গা নেই।'

'কি বলছেন? এর অবস্থা খুবই খারাপ। জ্ঞান নেই।'

'সোজা কথায় বলছি তোমাদের — জায়গা নেই।'

সেই বেচারী অষ্টমজনকে, যার জন্য জায়গা কুলাল না, শুইয়ে দেওয়া হল গাছের নীচে আর আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম তার স্ট্রেচারের দিকে। হাওয়ায় চাদরের প্রান্তটা সরে গেল আর আমি দেখতে

পেলাম বাবা, রোগা, প্রাণহীন, কষ্টভোগা এক মুখ, তোমার সঙ্গে কেমন যেন মিল আছে মানুষটার — তোমার মতনই লম্বা, রোগা, কিন্তু কাঁধ চওড়া, তাই স্ট্রেচারে ভাল করে তার জায়গা হচ্ছে না।

শুয়েছিল সে আর তার ঠোঁটগুলি কাঁপছিল। যুদ্ধের ছবিগুলো সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিল না বোধহয় — সৈন্যরা ছুটছে, পড়ে যাচ্ছে, মরছে, গাছ আর আকাশ দু' ফালা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার মনে হল, ও নিশ্চয়ই তোমাকে জানে, বাবা, আর ফারহাদমামাকেও। ঐ সৈন্যটা তোমাদের সঙ্গেই চলছিল অন্ধকার, জটপাকান বনের মধ্য দিয়ে, মামাকে মেরে ফেলল আর ও আঘাত পেল, আর তুমি ওর কাছে ঝাঁপিয়ে পড়লে ওকে বাঁচাবার জন্য। আর তখন আবার একটা কামানের গোলা। তোমার তখন কি হল, বাবা ?..

'চাচা, ও চাচা !' আমি তাকে ডাকতে লাগলাম, জাগিয়ে দিতে লাগলাম যাতে সে যুদ্ধের ছবিগুলোকে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে আর আমায় বলে তোমার কি হল...

'এই ছেলে ! ওকে শান্তিতে থাকতে দে। বাড়ী যা। তোর মা ভীষণ ব্যস্ত...'

চলে গেলাম আমরা সেখান থেকে। চুপ করে পথ চলতে লাগলাম। ভুলেই গেলাম যে আমরা দু'জন আছি, কথা বলছিলাম না, পরস্পরের দিকে দেখছিলাম না।

অনেক অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলাম আমি, কোন কিছুই ভাবছিলাম না যেন আমি নেই, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছি। তারপর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, তারপর উঠোনে আর ভাবতে লাগলাম।

বোধহয়, সে এখনও গাছের নীচেই শুয়ে আছে আর যুদ্ধের ছবি ভাসছে তার চোখে, তার কষ্ট হচ্ছে আর খুব খারাপ লাগছে। তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তার চিঠির অপেক্ষায় আছে; তারা একটুও সন্দেহও করছে না যে সে এখন গাছের নীচে শুয়ে আছে। তারা জানে না, তার কাছে এসে তাকে সাহায্য করতে পারছে না।

আমি ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে রুটি কাটতে লাগলাম আর মাখন মাখাতে লাগলাম। তারপর সেগুলো সব খবরের কাগজে মুড়লাম, ঠিক করলাম, ওকে দিয়ে আসব খুশী হবে। খুব, খুব ভাল লাগবে ওর।

আরে মা এসে গেছে। মোড়কটা লুকিয়ে ফেলে মা'র দিকে এগিয়ে গেলাম।

'অভিনন্দন জানাই তোমায় মা।'

'কেন রে? বাবার চিঠি এসেছে নাকি?.. আরে হ্যাঁ, দিনটা ভালই কেটেছে। কিন্তু এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আটটা অপারেশন — আটটা!'

'আটটা বেশী না কম?'

'শান্তির সময়ে আটটা অপারেশন অসম্ভব বেশী রে, ছেলে। কিন্তু এখন... একজন ডাক্তার বারটা অপারেশন করেছে, সবকটাই সফল।'

'তোমার ক'টা সফল হয়েছে?'

'আশা করি সবগুলোই। একটা ছিল এমন শক্ত যে আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম!.. তুই হাসপাতালে কেন এসেছিলি রে, বাবা?

'এমনি, আমার একটু দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তোমায়, যাওয়া বারণ?'

'বারণ, বাবা। বুঝলি তো?'

যদিও আমি বুঝলাম না তবু বললাম:

'হ্যাঁ।'

'কাল আমাদের ঘরে অতিথি আসবে।'

'কে গো, মা?'

'হাসপাতালে জায়গা কুলাচ্ছে না। আমরা ডাক্তাররা ঠিক করেছি, নিজেদের বাড়ীতে আহতদের রাখব।'

'কেন?'

'ওখানে ওদের জায়গা হচ্ছে না।'

'আমাদের বাড়ীতে আহতরা শুয়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ, বাবা। আর তুই আমায় সাহায্য করবি।'

'করব। তুমি বেছে নিয়েছ কাউকে? তুমি ওকে জান? ওর আমাদের বাড়ী পছন্দ হবে?'

'আমি এখনও কাউকে বেছে নিই নি। জানি না, ওর ভাল লাগবে কিনা আমাদের বাড়ী। কিন্তু আমাদের সারিয়ে তুলতে হবে তাকে।'

'আমি চেষ্টা করব যাতে ও সেরে ওঠে। কেমন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। খাবি চল।'

'মা, ওকেই নাও, ও একা গাছের নীচে শুয়ে আছে! ওর জন্য জায়গা

হল না। তোমার কাছে তো একই ব্যাপার। আমি জানি, ও ভাল আর বাধ্য হবে, আবদার করবে না।'

'ঠিক আছে বাবা। আমরা একসঙ্গে যাব, তুই ওকে দেখিয়ে দিবি।'

'ও এত ভাল! এত চমৎকার! মা! মাগো! জান আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, বলব? চল এখনি আমরা যাই ওকে নিয়ে আসি। তোমার পায়ে পড়ি...'

চললাম আমরা হাসপাতাল। সে যখন জানবে যে আমরা তাকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি, তখন খুব অবাক হয়ে যাবে। আর যদি ও আসতে না চায়? তা'হলে মাকে বলব ওকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তারপর আমরা ওকে নিয়ে আসব; আর সকালে যখন ওর ঘুম ভাঙবে, তখন বলব যে এমন হয়ে গেছে, আমাদের কোন দোষ নেই। আর তারপর আমাদের বাড়ী ওর ভাল লেগে যাবে, ও রাজী হবে এখানে থাকতে।

'দাঁড়া এখানে। আমি আগে জেনে আসি কে আজ গাছের নীচে শুয়েছিল, তারপর নিয়ে নেব তাকে।'

মা গুলিয়ে ফেলেন না যেন!

আমরা ওকে খেতে দেব রুটি, মাখন আর আঙ্গুর। তারপর কি করব তাকে নিয়ে? কেমন করে চিকিৎসা করব? মা বলবেন কেমন করে। কে ও—ক্যাপ্টেন, জেনারেল, ট্যাঙ্কচালক না পাইলট? ও যদি পাইলট হয় তো খুব ভাল—আমি পাইলটদের ভালবাসি। ও কি পদক পেয়েছে? পেয়েছে, বোধহয়। ও যদি ভীরুই হত তো লুকিয়ে পড়ত আর আঘাত পেত না। এতক্ষণ ধরে আসছে না কেন ওরা। মা সব গুলিয়ে ফেললেন নাকি? ভাল মাথা খাটিয়ে বার করা গেছে আহত সৈন্যকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার কথা, বেশ মজাই হবে! স্কুলে না হয়, নাই গেলাম আর এখন—আহতের দেখাশোনা করতে হবে, মন খারাপ করার কিছু নেই। একটু খারাপ লাগে ঠিকই। কিন্তু আহত সৈন্য স্কুলের থেকে অনেক বেশী আগ্রহজনক।

'মা!'

ছুটে গেলাম স্ট্রেচারটার কাছে। দেখি—সে!

'ও, মা!'

আমি কি করব বুঝতে না পেরে স্ট্রেচারের চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। বড় লাল ক্রস-আঁকা একটা গাড়ী এগিয়ে এল; সেটার পেছনের দরজা খুলে

গেল, স্ট্রেচারটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল গাড়ীর মধ্যে, মা চেঁচিয়ে বললেন, 'গাড়ীর সামনে উঠে বোস, মেহ্দি!' তারপর গাড়ী চলতে লাগল, আমরা আহতকে বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি চিকিৎসা করব বলে, ও এখন আমাদের, আমরা দেখব যাতে ওর মনে কেউ কষ্ট দিতে না পারে। সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে গেল সহজ, স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু আমি ভয়, উদ্বেগ বোধ করছিলাম।

ড্রাইভারটা কেমন যেন বিষণ্ণ ধরণের, চুপ করে গাড়ী চালাচ্ছে, আমার ইচ্ছে করছে গাইতে, হাসতে, লাফাতে, আর ও এমন ভারিক্কী ধরণের আর অহঙ্কারী যেন একটা বিরাট কাজ করছে—চুপ করে গাড়ী চালিয়েই যাচ্ছে। পেছন ফিরে তাকালাম আমি সাদা জানলাটার দিকে, কিছু দেখতে পেলাম না। মা ওখানে আছেন, চিন্তা করার কিছু নেই, সব ঠিক আছে।

খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল আমাদের গাড়ীটা যেন ইচ্ছে করেই। কতকগুলো সব সরু সরু রাস্তায় গিয়ে ঢুকছিলাম আবার পেছনদিকে ঘুরছিলাম দেওয়ালকে ঘষড়ে দিয়ে, লোকেরা চেঁচাচ্ছিল আমাদের উদ্দেশ্যে, অভিশাপ দিচ্ছিল আর আমরা আহতকে বাড়ীতে নিয়ে চলেছি চিকিৎসা করে তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য।

গাড়ীটা যখন কোন রকমে এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ীর কাছে, প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে বেরিয়ে এল। আমি ভীষণ গর্বিতভাবে নামলাম গাড়ী থেকে, পেছনের দরজাটা খুলতে সাহায্য করলাম ড্রাইভারকে। সবাই এগিয়ে এল এবার, ঘিরে ফেলল আমাদের, আর আমরা কারুর দিকে না তাকিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে চললাম ফটকের উদ্দেশ্যে।

'জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়, নোরা লক্ষ্মীটি, এ মেহ্দির বাবা নয় তো?' জিজ্ঞাসা করল মদিনা।

'না,' মা উত্তর দিলেন।

'এ কে, নোরা?'

'হাসপাতাল থেকে একজন আহত সৈন্য।'

আমরা আহত লোকটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলাম। আর যখন আমরা ড্রাইভারকে বিদায় জানাতে বাইরে এলাম, প্রতিবেশীরা তখন এই ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে।

'আর মেহ্দির বাবা?.. যদি সে জানতে পারে, বাড়ীতে অন্য পুরুষমানুষ...'

'সে নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই।' বলে মা ছুটে ঘরে

গেলেন আহত লোকটির কাছে আর আমায় বললেন, 'আসিস না এখন এখানে...'

প্রতিবেশীদের ভাল লাগল না কেন এ ব্যাপারটা? যাক্, এখন ওসব চিন্তা করার সময় নেই। আমাদের বাড়ীতে এখন অতিথি, আহত সৈন্য।

অপরিচিত অতিথি, সুস্বাগতম আমাদের বাড়ীতে! বিশ্বাস কর, এখানে তুমি ভালই থাকবে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে আর তারপর আবার যুদ্ধে চলে যাবে। কেবল চোখ রাখবে চারদিকে যাতে তুমি আঘাত না পাও, মরে না যাও। তুমি মরে গেলে আমি কাঁদব, মাও কাঁদবেন, যারা তোমায় জানত তারা সবাই কাঁদবে। কাঁদবে সেই দোলনাটা যেখানে তুমি বড় হয়ে উঠেছ; সেই বলটা, যেটা নিয়ে তুমি খেলেছ, যেটাকে তুমি আকাশে মেঘের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছ; তোমার বইগুলো, গল্পগুলো কাঁদবে; যখন তুমি হাঁটতে শিখেছিলে তখনকার পরা সেই প্রথম জুতোজোড়া, আর যে নদীতে তুমি চান করতে ; সেই আপেল গাছটা যেটায় তুমি উঠতে, আর তোমার জানলাটা, জানলায় বসা মাকড়সাটা সবাই কাঁদবে, কাঁদবে তোমার মাও, তোমার মা'র মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবে, বুড়ী হয়ে যাবে...

মিনতি করি তোমায়, জীবন্ত, অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধ থেকে ফিরে এস।

আর এখন তুমি আমাদের অতিথি, মা আর আমি সবরকম চেষ্টা করব, যাতে তুমি একদিন উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলতে পার, 'সব ঠিক আছে।' সকালবেলায় মা যখন কাজে চলে যাবেন, আমি তোমায় দুধ খাওয়াব। যদিও দুধ খাওয়া ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়, কিন্তু খেতে হবে, কারণ দুধ ছাড়া তুমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে না। আর আমি তোমাকে ওষুধও খেতে দেব। ঠিক আছে, তাই হবে, সব থেকে তেতো ওষুধগুলো তুমি সবার অলক্ষ্যে খাটের নীচে ফেলে দিতে পার, কিন্তু অন্যগুলি অবশ্যই খেতে হবে।

আমি আর ফারহাদমামা যেসব গল্পগুলি বানিয়েছিলাম শুনবে সে-গুলি? আর যখন তুমি কথা বলতে পারবে, কোনো খানেই আর ব্যথা থাকবে না, তখন দেখা যাবে তুমি কোন গল্প বানাতে পার কিনা। যে সব লোকেরা কল্পনা করে করে গল্প বানাতে পারে, আমি তাদের ভালবাসি।

আমার মাকে তোমার ভাল লাগবে। মা যদি কখনও খুব কঠোর হন, তুমি ভয় পেও না — মা আসলে খুবই দয়ালু। মা'র হাতে পড়েছ যখন একবার, তোমাকে সারিয়ে তুলবেনই।

আমি তোমাকে আমার বাবার কথা বলব। আর যখন বাবা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবেন, তোমরা দু'জনে বন্ধু হবে তখন, দাবা খেলবে। ভাল বন্ধু খুব কমই আছে বাবার, তাই বাবা তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজী হবেন, চিন্তা কোরো না।

দাদুকে প্রথম প্রথম ভাল লাগবে না তোমার, মনে হবে, দাদু ভীষণ ভীষণ রাগী। আসলে, দাদু ঠাট্টাতামাসা করতে ভালবাসেন, কিন্তু দাদুর সামনে যেন কখনও গ্রামকে গালাগাল দিও না—তাহলেই ব্যাস, দাদু তোমার চিরকালের শত্রু।

তারপরে আমার বন্ধু মারাতের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দেব। ও তোমাকে তোমার আপনজনের কাছ থেকে চিঠি এনে দেবে আর যদি কখনও কেউ তোমার মনে ব্যথা দেয় তো নিশ্চিন্ত থেকো, ও তোমার হয়ে কথা বলবে।

যদি আমাদের এখানে তোমার ভাল লাগে, আমাদের শহর ভাল লাগে, তাহলে তুমি যুদ্ধের পরে এখানে চলে আসতে পার। তুমি আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসবে আর আমরা বসে বসে পুরনো কথা মনে করব।

এসব ভাবছিলাম আমি সেই সন্ধ্যায়, যেদিন তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। মা বললেন যে, তোমাকে ইঞ্জেকশন দেবেন, আমায় বারণ করলেন তোমার ঘরে ঢুকতে, তুমি শুয়েছিলে, জ্ঞান ছিল না তোমার।

উঠোনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বিরক্তি ধরে গেল, চুপি চুপি জানলার কাছে এসে একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালাম, মাকে দিশাহারা অবস্থায় কাঁদতে দেখে আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম। হাতে সিরিঞ্জটা নিয়ে মা ঘরময় দৌড়াদৌড়ি করছেন, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, ওষুধের শিশি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন টুলের ওপর, নিজেকে না তোমাকে কি যেন বলছেন।

আমি জানলার কাঁচে টোকা দিলাম:

'মা আমি তোমায় সাহায্য করব?'

কিন্তু মা হাত নাড়িয়ে আরও দিশাহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

বোঝা যাচ্ছিল, তোমার খুবই খারাপ অবস্থা—হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার সময় গাড়ীতে দুলুনি লেগেছে আর মা বুঝতে পারছেন না কি করবেন।

আমি রাস্তায় ছুটে গিয়ে সাহায্যের জন্য লোক ডাকব ভাবলাম কিন্তু তা' না করে আঙ্গুরলতার কাছে এক কোণায় লুকিয়ে রইলাম ভয়ে।

মনে মনে আবার দেখলাম মাকে আর মেঝেতে পড়ে থাকা তুলোর

টুকরো, তোমার পিঠ আর তোমার পিঠে মা'র হাত আর চোখ বন্ধ করে ফেললাম — এত ভয়ংকর। এরকিনচাচা, কি করেছে ওরা তোমার পিঠে? ওঃ ঐ অত্যাচারী ফ্যাসিস্টগুলো! তোমার মসৃণ, শক্তিশালী পিঠটাকে কেমন কুৎসিত করে দিয়েছে।

একটু ধৈর্য ধর, মা তোমায় সাহায্য করবেন, তোমার ভাল করবেন। একটুখানি, আর একটু সহ্য কর।

পরে আমরা এইসব কথা মনে করে হাসব। তোমার পিঠে ঘুষি মারব ঐ জায়গাটায়, যেখানে ক্ষত ছিল, একটুও ব্যথা লাগবে না তোমার।

'ব্যাস।'

মা রোয়াকে বসে হাতে মুখ ঢাকলেন। আমি কাছে এগিয়ে এসে আস্তে করে মা'র কাঁধটা ছুঁলাম। মা চোখভরা জল নিয়ে একটু হেসে বললেন:

'জানিস বাবা, আজ আমি নিজের চোখে, এতটা বড় হয়ে গেলাম,' বলে দেখালেন কতটা, 'কি অদ্ভুত!'

যদিও আমি কিছুই বুঝলাম না — এর মধ্যে অদ্ভুত কি আছে, এরকিন-চাচা যখন কষ্ট পাচ্ছে — তবুও মা'র কথার সমর্থন জানালাম:

'না না ছাত পর্যন্ত নয়, তুমি আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছ।'

মা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে হেসে চুমু খেতে শুরু করলেন; মা আর আমি পাগলের মত লাফাতে লাগলাম আর মা বারবার বলতে লাগলেন:

'কি অদ্ভুত, কি ভাল!'

মা'র কাজে যাবার সময় হয়েছে, আমায় জাগিয়ে দিলেন মা, ছোট্ট স্বপ্নটা আর আমার পুরোটা দেখা হল না যাতে রং বেরংয়ের বেলুনগুলো আকাশে একটুখানি উঠেই ফেটে যাচ্ছিল।

আগে হলে আমি বায়না-আবদার করতাম আর মা একঘণ্টা ধরে আমাকে কাতুকুতু দিতেন আমাকে পুরোপুরি জাগিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু এখন আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'এরকিনচাচা কেমন আছেন?'

'এখনো ঘুমচ্ছে...'

শ্রান্ত, ক্লান্ত মা'র গলার স্বর, গোটা চেহারাটা অবসন্ন, শীর্ণ যেন অসুখে ভুগে উঠেছেন। আমার আগেকার হাসিখুশী মা কোথায় হারিয়ে

গেছেন। আগে কখনও ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে উঠে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করতেন:

'একবার অন্তত: দেখ কেমন করে সূর্য ওঠে, কি অপূর্ব !'

আর জানলার কাছে ছুটে যেতেন নতুন দিনকে দেখবার জন্য, সূর্য, আঙ্গুরলতায় শিশিরবিন্দুকে বরণ করে নেবার জন্য।

কোথায় আমার সেই মা ? এক রাতেই যেন বুড়িয়ে গেছেন। হবে না, সারারাত ঘুম নেই, সমস্ত সময় উদ্বেগ নিয়ে এরকিনচাচার কাছে বসে থাকা, তাকে ওষুধ খাওয়ান, ঘরময় পায়চারি করে করে চিন্তা করা।

কেবল মাঝে মাঝে এসে আমার ঘরে শুচ্ছিলেন খাটের এক ধারে জামাকাপড় না বদলেই আর শুয়ে শুয়ে জানলায়, ঘরের ছাতে ছায়া দেখছিলেন।

'মন দিয়ে শোন, মেহ্দি,' মা বললেন, 'এবার তোকে বড় হতে হবে, আমাকে সবকিছুতে সাহায্য করতে হবে।'

'হ্যাঁ, মা।'

'চাচার ঘুম যেই ভাঙবে, ওকে লাল কাগজে রাখা ওষুধটা খেতে দিবি, আর তারপর ঘড়িতে যখন বারোবার ঘণ্টা বাজবে—তখন সাদা কাগজে রাখা বড়িটা দিবি। আর দুধ খাওয়াবি। দুপুরবেলায় আমি আসব একবার ওকে ইঞ্জেকশন দিতে... তোর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, বাছা। তোর ওপর আমি বিশ্বাস রাখি, বুঝলি ?'

'হ্যাঁ মা, আর এখন আমায় কি করতে হবে ?'

'ওর ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর লাল কাগজের ওষুধটা দিতে হবে... বুঝেশুনে কাজ করিস...'

মা চলে গেলেন, এরকিনচাচার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ আর গালাগালি করতে লাগলাম নিজেকে যে আমি ভীরু অকর্মা, যে আমি দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে এরকিনচাচার কাছে টুলে বসে তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করতে পারি না, আমি মজার গল্প বানাতে পারি না, যাতে এরকিনচাচা চোখ মেললে তাকে সেসব গল্প বলতে পারি।

একজন লোক ছিল... না, এক ছেলে। ঐ লোকটি, থুড়ি ছেলেটি ছোট ছিল আর লোকটি ছিল বড়, ছেলেটির দ্বিগুণ বড়। সেই লোকটির ছিল স্ত্রী আর ফুটফুটে একটা মুরগী... তারা থাকত... মজায় ভরা, সবুজ আজব দ্বীপগুলিতে, যেখানে বিজ্ঞানীদের মতে সবাই মাথায় হাঁটে, সেখানে থাকত তিনমাথাওয়ালা এক তিমি, যে নিজেই কবিতা লিখত, নিজেই পড়ত

আর নিজেই নিজেকে হাততালি দিত... আর ফুটকিফুটকি মুরগীটা ছেলেটিকে বলল, 'আমার ডিম খাও, অমনি ডিম নয়, সোনার ডিম।' আর লোকটি...

ঘুম ভেঙেছে ওর, চোখ মেলেছে, আমি ভয়ে আর একটু হলেই খাটের তলায় ঢুকে যেতাম। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। তার চোখের দৃষ্টিটা এমন যেন আমাকে ভেদ করে যাচ্ছে, সেই দৃষ্টিতে আমার ভেতরে সবকিছু যেন ব্যথা করে উঠল।

'এই যে,' বললাম আমি, 'ভয় পাবেন না, আমি মেহ্দি।'

আর সে কেবল ভয় যে পেল না তাই নয় — আমাকে তখনও দেখতেও পাচ্ছিল না, বড় অহংকারী। মুখটা তার এখন একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে, বোঝা যায় কোথায় চোখ, কোথায় ঠোঁট, ছিল তো সব এক রংয়ের।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' বললাম আমি। 'ভাববেন না যেন আমি আপনাকে ওষুধ খাওয়াতে চাচ্ছি, মা'র হুকুম।'

ওষুধ খাওয়া না খাওয়া কোন কিছুতেই তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু ও অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? চুপ করেই বা আছে কেন? ওর খুব খারাপ লাগছে বোধহয়? আর ওকে ওষুধই বা খাওয়াব কি করে যদি ও কিছুই বুঝতে না পারে আর মুখ খুলতে না চায়?'

'এই যে,' বললাম আমি, 'কেমন আছেন?'

হঠাৎ সে আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে আমায় দেখতে পেল। আমাকে দেখে সে বুঝল যে আমি তার সামনে বসে আছি আর মনে হল যেন সামান্য একটুখানি হাসল।

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, আমিও ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম, আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিলাম আর হাসছিলাম। আর অবাক কাণ্ড — আমার তাকে একটুও ভয় করছিল না, আমি এমনকি তার দিকে চোখ টিপে বললাম:

'আমি মেহ্দি। আমি আপনাকে জানি, আপনার নাম এরকিনচাচা। আপনি যুদ্ধে আঘাত পেয়েছেন, আর তারপর আমরা আপনাকে নিয়ে এসেছি। হাসপাতালে জায়গা ছিল না, আমরা আপনাকে নিয়ে এসেছি। সেখানে শুয়ে থেকে সেরে উঠবার মত একটুও জায়গা ছিল না...'

সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিল ভদ্রতার খাতিরে। আমার কথার উত্তর দিচ্ছিল কেবল ঠোঁট একটু নাড়িয়ে।

'এবার,' কড়াভাবে বললাম আমি, 'এবার ওষুধটা খেয়ে নিন। আমরা কেবল বকবকই করছি।'

আর যেই সে ঠোঁট নাড়িয়ে মুখটা একটুখানি ফাঁক করল অমনি আমি তার জিভের ওপর ওষুধের বাড়িটা ফেলে দিলাম।

'গিলে ফেলুন, গিলে ফেলুন। ছোট্ট বড়ি একটা।'

সে সাদা, একেবারে সাদা জিভটা মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল আর বড়িটা গড়িয়ে পড়ে গেল বালিশের ওপর।

'ফেলে দেবেন না,' বললাম আমি, 'যদি আমার মা রাগারাগি করুক তা না চান।'

আমি বড়িটা আবার তার মুখে ফেলে দিলাম।

'আপনি গিলে ফেলুন। আমি আপনাকে গান গেয়ে শোনাব যাতে তেতো না লাগে... আমোদভরা সবুজ আজর দ্বীপগুলিতে, যেখানে বিজ্ঞানীদের মতে সবাই মাথায় হাঁটে। তাক-তাক-তাক্।'

মুখ হাঁ করে যতক্ষণ সে আমার গান শুনছিল, বড়িটা ততক্ষণে জিভের ওপর গলে নিয়ে ভেতরের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, যেখানে যাওয়া দরকার।

'এই তো হয়ে গেল,' বললাম আমি, 'আর আপনি যদি সবসময় কথা শোনেন, তাহলে আপনি আর আমি বন্ধু হয়ে যাব...'

তারপর ঘড়িতে বারোবার ঘণ্টা বাজল — আবার ওষুধ গেলাতে হবে। ওঃ কি কষ্টকর!'

তারপর মা এলেন। আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে এরিকিনচাচাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন আর দেখলেন, সব বড়িগুলিই খাইয়েছি কিনা আমি; তারপর উঠোনে বেরিয়ে এলেন বিশ্রী লাল তুলো, ব্যাণ্ডেজ আর বিভিন্ন অ্যাম্পুলে ভরা বালতি নিয়ে, বিষণ্ন, নিস্তব্ধভাবে জঞ্জালের বাক্সে ফেলে আসতে গেলেন।

'কেমন আচার ব্যবহার দেখলি ?' বললেন তিনি।

'আমার সব কথা শুনেছে! ওষুধ খেতেও আপত্তি করে নি। মা, ও গোঙাচ্ছে!'

'শুনেছি। এখুনি থেমে যাবে।'

ভীষণ করুণভাবে গোঙাচ্ছিল সে যেন একটা ছোট্ট কুকুরছানাকে একা রেখে দেওয়া হয়েছে। মা তার কাছে গেলেন। এরিকিনচাচা একটু পরেই চুপ

করে গেল। আমার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মা কি করে ওর ব্যথা কমান, কিন্তু মা আমাকে তার কাছে যেতে দিলেন না।

যখন মা আবার হাসপাতালে চলে গেলেন, আমি তার ঘরে ঢুকে দেখি, সে ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সে... ঘুমোচ্ছে যেন কেমন রাগ-রাগ ভাবে, যেন সব সময়ে সেই একই যুদ্ধের স্বপ্নটা দেখছে, কেমন করে ওকে গুলি করেছিল, মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কেমন করে ও পড়ে গেল, তারপরে আর কিছু মনে নেই, কিছু দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না — হারিয়ে গেছে।

এমন সময়ে তুই এলি, মারাত্।

'শুনলাম তোদের বাড়ী আহত সৈন্য আছে।'

'কোথা থেকে শুনলি? কে বলল তোকে?'

'তোদের পাশের বাড়ীর লোক। সত্যি?'

'কি বলল সে?'

'ছেড়ে দে।'

'বল। আমি তোর চোখ দেখে বুঝতে পারছি...'

'আমি কথা শুনিয়ে দিয়েছি, ভাবিস না। শয়তানী বলল, 'মেহ্দির বাবা চলে যেতে না যেতেই ওর মা ঘরে পরপুরুষকে এনে ঢুকিয়েছে।'

'তাতে খারাপ কি আছে?'

'কিছুই নেই... একটুখানি দেখতে দিবি?' তুই বললি।

'চোখের কোণ দিয়ে কেবল, কেমন? ও ঘুমোচ্ছে।'

তুই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে মাথা গলালি দরজার ভেতরে, ওকে দেখলি, তাকিয়ে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললি:

'কে এ, সার্জেণ্ট?'

সার্জেণ্ট সাধারণ সৈন্যর থেকে ভাল কিনা জানতাম না, যাই হোক আমি বললাম:

'মনে হয়, জেনারেল। দুধ খায় না, ওষুধ খায় না, ঘ্যানঘ্যান করে।'

যখন আমরা উঠোনে বেরিয়ে এলাম, তুই বললি:

'তুই বোধহয় আর আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবি না?'

'কি বলছিস? আমি জেনারেলের সঙ্গেও তোর সঙ্গেও বন্ধুত্ব রাখব।'

'তুই তো জেনারেলকে জানার আগে থেকেই আমায় জানিস পুরো দশদিন আগে।'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া জেনারেলকে নিয়ে অনেক ঝামেলা। আমি জানি না, ওর সঙ্গে সত্যিকারের বন্ধুত্ব সম্ভব কিনা। আর ওর মুখের ওপর সত্যি কথা

বললে... আজ আমি কেমন করে জেনারেলকে বাঁচিয়েছি যদি তুই জানতিস। আজ ওকে হিস্টিরিয়া ধরেছিল, চেঁচাচ্ছিল আর বাসন ভাঙছিল। আমি ওকে এমন ওষুধ দিলাম যে ওর চৈতন্য হল, তারপর একঘণ্টা ধরে আমাকে কৃতজ্ঞতাই জানাচ্ছিল। বলেছে যে যখন সেরে উঠবে, আমাকে পদক দেবে।'

'মেহ্দি...' তুই আমার কথায় বাধা দিয়ে বললি, 'আমায় সাহায্য করতে পারবি ?'

'পারব,' বললাম খেই হারিয়ে।

'এই দেখছিস,' বলে তুই থলি থেকে বার করলি অনেক অনেক কালো, ভয়ংকর, বিশ্রী কাগজ। 'দেখছিস কতগুলো ?.. এগুলোর একটা লায়লা-আপাকে* দিতে হবে, আমি পারব না। তিনি আমার মায়ের মত। সবকিছু করেন আমার জন্য। এটা হাকিমের খবর — হাকিমচাচা, লায়লা-আপার ছেলে।'

'ওঁকে মেরে ফেলেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি চেষ্টা করব। দিয়ে আসব, মারাত্... কিন্তু এখন রাস্তায় ভীষণ ভীষণ গরম...'

'এক্ষুণি, মেহ্দি। আমি ওর এই কালো কাগজটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারছি না। এক্ষুণি, জেনারেল যতক্ষণ ঘুমোচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'যা বলবি... তুই কেবল দেখিস যেন জেনারেলের ঘুম না ভাঙে।'

চললাম আমি, হাকিম-চাচার কালো কাগজটা মুঠোয় চেপে ধরে; শক্তিশালী, বিরাট চেহারার হাকিমচাচা, যে চলে গিয়েছিল আর এখন বাড়ী ফিরে এসেছে কালো, বিশ্রী একটা কাগজে পরিণত হয়ে। লায়লা-আপা কান্নাকাটি করবেন, ভীষণ খারাপ লাগবে তাঁর আর ছেলে হাকিমকে ডাকবেন, যেন সে ফিরে আসে সেই বন থেকে; ভাববেন যে তিনি মা হয়ে ছেলের মনে এমন কষ্ট দিয়েছেন যে সে মাকে ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের মত... না, না, এসব তামাসা, বিশ্রী তামাসা... হাকিমচাচা নিজের মায়ের কাছে ফিরে আসবে না, এ হতেই পারে না, সে এত ভালবাসে মাকে !

ওদের বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম এক মিনিট, তারপর ফটকটা খুলে একপা' একপা' করে এগিয়ে গেলাম অন্ধকার সরু পথটা

---

* আপা — বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার প্রতি সম্বোধন। — সম্পাঃ

ধরে আর উঠোনে আঙ্গুরলতার নীচে লায়লা-আপাকে দেখতে পেয়ে রাঙিয়ে উঠলাম যেন না বলেকয়ে পরের বাড়ীতে ঢুকেছি।

'কিরে মেহ্‌দি ?' জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

'আমি...'

'কিছু শুনতে পাচ্ছি না, এই বড় গোছাটা পেড়ে নিয়ে নামব তোর কাছে... এ আমার ছেলে হাকিমের জন্য... লিখছে যে আঙ্গুরের কথা মনে পড়ে, বাছা আমার...'

হ্যাঁ, আমি ঠিকই ভেবেছি ! হাকিমচাচা বেঁচে আছে। মা ওর জন্য আঙ্গুর তুলছেন। ছেলে খুব খুশী হবে, আঙ্গুরের জন্য মন কেমন করছে খুব...

'আমার হাকিম আঙ্গুর ভালবাসে,' বললেন ওর মা, 'সে যখন তোর মত ছোট ছিল, মেহ্‌দি, সারাদিন ধরে বসে থাকত আঙ্গুরলতার মাচায়, আঙ্গুর খেয়েই যেত, আর আমি হতভাগী বকতাম, তাড়াতাম, ভয় হত যে ওর পেটটা ফেটে যাবে...'

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ও আঙ্গুরলতার উপরে বসে থাকত আর এখন বসে বসে মনে করছে, মা'র পাঠান আঙ্গুরের অপেক্ষায় আছে... না, হাকিমচাচা বেঁচে আছে !

'মারাত্ !' চীৎকার করে বললাম আমি। 'ও বেঁচে আছে, এ মিথ্যা। আমি নিজে দেখেছি। ওর মা ওর জন্য আঙ্গুর তুলছেন !'

'কি বলছিস, মেহ্‌দি ?'

'নে ! নে ! নে !' টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম কালো কাগজটাকে, তারপর পা দিয়ে দলতে লাগলাম আর চেঁচাতে লাগলাম, 'বেঁচে আছে, হাকিমচাচা ! এত সাহস কোরো না !..'

তিন রাত পরপর মা এরকিনচাচার ঘর থেকে বেরোলেন না, তিন রাত ধরেই দেয়ালের ওপাশ থেকে শোনা যেতে লাগল মা'র উদ্বিগ্ন পায়চারির আওয়াজ আর এরকিনচাচার কাতরানি। প্রায়ই বাড়ীটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যেত, আঙ্গুরলতার পাতাগুলিও সরসর করত না — এরকিনচাচা জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। তিনদিন তিনরাত ধরে মা ঐ ঘর থেকে বালতি ভর্তি ভর্তি ভয়ংকর তুলো-ব্যাণ্ডেজ ফেলে এল।

এরকিনচাচার কথা ছাড়া আর কোন কথাই বলি নি, ওর চিন্তা নিয়েই ঘুমোতে শুয়েছি আর জেগে উঠেছি। ও কেমন আছে ? কি হয়েছে ওর ?

খালি মা'র চোখ দেখে বুঝতে পারতাম, এরকিনচাচার অবস্থা ভাল না, ঐ কারণে মা'র কঠিন পরিস্থিতি। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ছোটেন হাসপাতালে, দুপুরবেলা আবার বাড়ী আসেন — ব্যাণ্ডেজ বদলান, ইঞ্জেকশন, সন্ধ্যাবেলায় আবার উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা। মা'র কিন্তু কোন অভিযোগ নেই, বরং এমন ভাব করতেন যেন সবকিছুই ঠিক আছে, ভয়ের কিছু নেই! আমি জানতামই না যে মা এত কষ্টসহিষ্ণু, এত আত্মনির্ভর, ভাবতেও পারি নি যে, বাবা, তোমাকে ছাড়া মা এত পরিণত হয়ে যাবে। আর আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে তুমি যখন যুদ্ধে চলে যাবে মা'র কি হবে!

এমন সময় আবার তোমার চিঠি পেলাম বাবা, এত ভাল এত মজার যে সঙ্গে সঙ্গে মন-মেজাজ ভাল হয়ে গেল আমাদের। মা আর আমি তোমার চিঠি পড়লাম কয়েকবার, তারপর পরের দিন মারাত্ আবার দু'বার পড়ে দিল। চিঠির সব কথাগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গেল।

আমি কল্পনা করি, যেখানে যুদ্ধ হবার কথা তোমাদের সেখানে পেঁছে দিল। সেখানে যুদ্ধ নেই মোটেও, চারদিকে বন। বড় বড় মোটা মোটা গাছ — দু'পা তফাতে কিছু দেখা যায় না। তুমি যাচ্ছ আর অবাক হচ্ছ, কিছু বুঝতে পারছ না, কারণ বন দেখছ জীবনে প্রথমবার। খুব মজা লাগছে তোমার, গাছের ওপর উঠছ, গুটি ছিঁড়ছ আর মা বলছেন, ঐ মুহূর্তগুলিতে তুমি আমাদের কথা একেবারেই ভাব না।

আর তারপর কম্যাণ্ডার যখন চীৎকার করে, 'সারি বাঁধো!' তুমি কাঠবিড়ালীর মত গুঁড়ি মেরে নেমে আস গাছ থেকে। 'ডাইনে।' ভীষণ বকুনি খেতে হয় তোমাকে কম্যাণ্ডারের কাছে — রুশ ভাষা ভাল বোঝ না তুমি, সব উল্টোপাল্টা কর, সবাই ডানদিকে যায়, তুমি একলা কেবল বাঁদিকে — হাসি পায়!

তারপর কম্যাণ্ডার তোমায় শুয়ে পড়তে বলেন, গাছের ফাঁকে ফাঁকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে বলেন। সবাই তা করে বেশ ভাল আর স্বাভাবিকভাবে, তুমিই কপালদোষে দুটো পাইন গাছের মধ্যে আটকে গেলে, সামনে পেছনে কোনদিকেই এগোতে পারছ না, চেঁচাচ্ছ, 'সাহায্য কর ভাইরা, আমায় ফেলে যেও না, ভালুকে খাবে আমায়!' বেচারী বাবা!.. সৈন্যরা তোমার পা ধরে টেনে বের করে আনল আর কম্যাণ্ডার তোমার আনাড়ীপনা দেখে আরও বকাবকি করেন। মজার লোক যে তুমি বাবা! যুদ্ধে তুমি যেন রূপকথার সাহসী বীর ক্লিচ-বাতিরের মত।

ঠিক আছে, তুমি কেবল যুদ্ধ থেকে এই রকম মজার চিঠি লিখ বেশী

করে। সবাই মুখ গোমড়া করে থাক, মেরে ফেলুক, তুমি ভেঙে পড়ো না...

মা বলেছেন তোমার চিঠি যতদিনে আমাদের কাছে পেঁছেছে, ততদিনে তোমার ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে আর তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে সত্যি সত্যি যুদ্ধ করার জন্য। কামনা করি, তুমি যেন হও ভাল, সাহসী, হাসিখুসী সৈন্য, তাহলে, আমি নিশ্চিত যে, তোমায় কখনও মেরে ফেলতে পারবে না...

৬

কি মজা! আজ শেষ পর্যন্ত এরকিনচাচা প্রথম কথা বলেছে। যখন ঘুম ভাঙল, মা'র আর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিতোরা।' আমরা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম আরও কি বলে, কিন্তু ও চুপ করে রইল যেন বলল — যথেষ্ট হয়েছে আজ। আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসল; একবার মা'র দিকে, একবার আমার দিকে তাকাল, ঘর, জানলা, দেয়াল-ঘড়ি সব দেখল।

মা'র হাসপাতালে যাবার দরকার তাই তাড়াতাড়ি করে ওকে পাশ ফিরিয়ে দিলেন আর ওর প্রথম কথা বলা উপলক্ষে মস্তবড় ছুঁচ দিয়ে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন ওকে।

'মা, সিতোরা কি?' মা'র সঙ্গে সঙ্গে ফটক পর্যন্ত যেতে যেতে বললাম।

'জায়গার নাম, যেখানে ওর জন্ম। ফেরগনাতে কোথায় যেন... যাক্, বুঝেশুনে চলিস আর বকবক করে ওকে বিরক্ত করিস না যেন।'

'সিতোরা।' উচ্চারণ করলাম আমি আর কান পেতে শুনলাম, ভালই শোনাচ্ছে, সুন্দর! বুঝেছি, ও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে — পাহাড়ের কোলে ওদের গ্রামটা, ওর ছোটবেলা, কেমন করে সে ছোট্ট, খালি পা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছে, আর তার পেছন পেছন কুকুরটা ছুটছে ভয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে: আর ওপরে উঠো না এরকিন, বিপজ্জনক। কিন্তু সে উঠছেই উঠছে একেবারে মেঘের কাছে। নীচে কি অপূর্ব সৌন্দর্য! উজ্জ্বল পোস্তফুল ফুটে আছে। আর পোস্তফুলের মাঝে মাঝে চৌকোণা চৌকোণা বাড়ীগুলি। ঐ যে এরকিনের বাড়ী, মা বসে আছে সুতোর পাঁজার আড়ালে, উঠোনে ছোট বোন ছাগলছানার সঙ্গে খেলছে। ওখানে সবকিছু চমৎকার, চ-মৎ-কার! পাহাড়, হাওয়া সবকিছুই যেন তোতা পাখীর মত বাররার বলে, "চ-মৎ-কার!"

এমন সময় এরকিনচাচার ঘুম ভেঙে যায়। অনেকক্ষণ ধরে বুঝতে পারে

না, তার এত ভাল লাগছিল কেন। আসলে তো: অপরিচিত মুখ — আমার, মা'র; দেহে বেদনা, ইঞ্জেকশন আর ইঞ্জেকশন। 'এঃ,' ভাবছে ও, 'একেবারেই ভুলে গেছি যে, যুদ্ধ চলছিল...'

আমি আবার তার মাথার কাছে চেয়ারে বসলাম আর গত কয়েক দিনের মতই চুপ করে বসে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, অপেক্ষা করি যে অবশেষে কথা বলবে, হাসবে আর উঠে দাঁড়াবে... কিন্তু এসবকিছু এত তাড়াতাড়ি হবার নয়। ঠিক আছে, আমি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে থাকব...

এরাকিনচাচা কথা বলেছে যখন, তখন সবকিছুই বুঝতে পারার কথা। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, দেখি মুখে গোলাপী আভা এসেছে, শান্ত ভাব একটু, চোখেও বুদ্ধির ছায়া। এমন বুদ্ধিভরা চোখগুলি যেন সবকিছু বোঝে। সুন্দর মুখ, সবকিছু চোখা আর মসৃণ, চোখা নাক, থুতনি। শক্ত, চওড়া চেহারা — বড়বড় পা বিছানার অর্ধেকটাই জুড়ে নিয়েছে, এমনকি একটুখানি ঝুলে থাকে খাটের বাইরে, কাঁধটাও কোনরকমে বিছানায় ধরেছে।

ও শুয়ে শুয়ে আমাকে দেখে, ভাল করে লক্ষ্য করে আমার হাত, চুল, নাক — আমাকে অবশ্য ওর ভালই লাগে। আমি ওকে বলতে আরম্ভ করি:

'বাবা এমন একটা মজার চিঠি লিখেছেন না, উঃ, কি ভীষণ! মা আর আমি এমন হেসেছি। লিখেছেন যেন তিনি বনে দুটো গাছের ফাঁকে আটকে গেছিলেন আর তাঁকে পা ধরে টেনে বার করেছে; আমার বাবার বুদ্ধি আছে, ভাববেন না যে যুদ্ধে গিয়ে বাবা এমনি ছেলেমানুষি করছেন... আগে বাবা সবকিছু করতেন মা'র জন্য। আমার মা'র নাম নোরা, মা...'

'মা ভা-ল,' ফিসফিস করে বলল এরাকিন, 'ভা-ল...' তারপর ঘরের ছাতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল আমার কথা আর মোটেই শুনছিল না। ঠিকই তো, ও ভাবছে আমার মা'র কথা, যে রাতগুলি মা ওর বিছানার পাশে কাটিয়েছেন সেই রাতগুলির কথা; সেই কষ্টকর ইঞ্জেকশন, যন্ত্রণা যা মা কমাবার চেষ্টা করেছেন সেকথা।

'আমার বাবার কথা বলব শুনবেন?'

আমি জানলাটা হাট করে খুলে দিয়ে বিছানায় বসলাম, খট করে একটা আওয়াজ হল আর তারপর আরম্ভ হল:

'শোন সবাই! ব্যায়াম আরম্ভ কর! এক, দুই চল! ডাইনে, বাঁয়ে!'

এরাকিনচাচা স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর দাঁত কিড়মিড় করে গোঙাতে লাগল।

'আরে এ যে আমার বাবা! আমার বাবা!' কিন্তু ও কিছুই বুঝতে পারছে না, শুয়ে শুয়ে গোঙাতে আর ছটফট করতে লাগল।

এই প্রথমবার আমি বাবার গলা শেষ পর্যন্ত না শুনেই বন্ধ করে দিলাম।

'অমনি করে না,' বললাম আমি, 'অমনি করে না...'

হয়ত বাবাকে ওর ঈর্ষা হয়? বাবা তো যুদ্ধে আর ও অসহায়, আহত বিছানায় পড়ে আছে। কি জানি?

আমার আর মনে নেই, কতদিন আমরা এর্‌রকিনচাচার সেবা করেছি — এক কিংবা দু'মাস, ঠিক মনে নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ওকে গল্পে ভুলিয়ে মুখে ওষুধ গুঁজে গুঁজে দিতাম আর সন্ধ্যা থেকে সারা রাত কাটিয়ে সকাল পর্যন্ত মা বসে থাকতেন ওর কাছে। তাই দিনগুলো কাটছিল একঘেয়েভাবে যেন একটা ভীষণ অস্বাভাবিক লম্বা দিন। আমি বাইরে প্রায় বেরোতামই না; একদিন ভীষণ অবাক লাগল দেখে যে, আঙ্গুরলতার সব পাতা পড়ে গেছে। আর তখনই তো, কি মজা — এর্‌রকিনচাচা, আমার আপন, ভাল এর্‌রকিনচাচা, যে এত যন্ত্রণা ভোগ করেছে, যার পিঠে ভীষণ ব্যথা ছিল — মা আর আমি ভয় পেতাম, ভাবতাম, ও কি আবার উঠে দাঁড়াতে বাইরে বেরোতে পারবে, দেখতে পাবে গাছপালা, চারপাশ, লোকজন, আকাশ, সূর্য আর চীৎকার করে বলতে পারবে, 'হো-হো! কি ভাল এই জীবনটা!' ও, আমার এর্‌রকিনচাচা উঠে দাঁড়াল!

উঠে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত! চীৎকার করে বলল:

'মেহ্‌দি, আমার কাছে আয়!'

আমি পাগলের মত লাফ দিয়ে উঠে, ভয়ে, আনন্দে ছুটে গিয়ে ঢুকলাম ওর ঘরে। গুটিয়ে গেলাম একেবারে যেন ওর না, আমারই পিঠে ব্যথা করে উঠবে, ওর হাত ধরে ওকে পিঠ সোজা করতে, তারপর পাগুলো বিছানার থেকে মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম।

'এই তো!' খুশীর সুরে বলল ও, 'এই তো ব্যাস! কি মজা!'

'কি মজা! হো-হো!'

'হা-হা! কি মজা! এবার ফিরে যাবার পালা! এক-দুই, যুদ্ধে চল!'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'এবার যাওয়া চলে!' আর এই ন্যাকার হঠাৎ কেন যেন কান্না পেয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এবার সব শেষ।'

এর্‌রকিনচাচা সেরে উঠেছে। ও আবার চলে যাবে সেই বনে, যার কথা সন্ধ্যাবেলায় অত সুন্দর করে গল্প করত। এর্‌রকিনচাচা চলে যাবে আর আমি

আগের মতই থেকে যাব একলা মা'র সঙ্গে। আমাদের মন খারাপ আর একঘেয়ে লাগবে। আমরা কেবল বসে বসে যুদ্ধ থেকে বাবার ফেরার অপেক্ষা করব — ব্যাস আর কিছু না। মা বোধহয় আমাকে স্কুলে ভাগিয়ে দেবেন ঐ ভয়ংকর খোঁড়া মাস্টারটার কাছে।

মা বলবেন, 'যথেষ্ট হয়েছে বখাটেপানা, সাতবছর বয়স হল তোর, এবার লেখাপড়া আরম্ভ করতে হয়।'

আগে মা একথা বলতেন না, লেখাপড়া করতে বাধ্য করতেন না — এরকিনচাচার দেখাশোনা করার দরকার ছিল।

'এবার সব শেষ,' বলে আমি গুটিয়ে গেলাম।

এরকিনচাচা হেসে উঠে আমার মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিল — এক বিশ্রী স্বভাব চুল প্রায় নেই বললেই হয় সেগুলোকে এলোমেলো করে দেওয়া — আর বলল:

'ও কিছু না রে ছেলে। তোদের বাড়ী অন্য কেউ আসবে। মা অন্য একজনকে নেবেন।'

'অন্য জন দরকার নেই। বায়না করবে, বড়াই করবে। ওষুধ থু থু করে ফেলে দেবে।'

'সেই অন্যজন আরও ভাল — জেনারেল। একজন সামান্য সৈন্য নয়!'

'জেনারেল চাই না! ও বড়াই করবে। আমি ইচ্ছে করেই ওর দেখাশোনা করব না।'

'অদ্ভুত ছেলে! জেনারেল অনেক ধরণের হয়। তুই মা'র সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে নিজে বেছে নিবি ভাল স্বভাবের জেনারেলকে।'

যাই হোক এরকিনচাচা, তুমি চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে, আমাকে বোঝাবার দরকার নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখব, তুমি নেই। বিছানাটা খালি, ঠাণ্ডা... বলব, "সুপ্রভাত", তুমি কোন উত্তর দেবে না যেন রাগ করেছ। উঠোনে বেরিয়ে কান পেতে শুনব, আঙ্গুরলতার পাতাগুলি কেবল সরসর করছে একঘেয়েভাবে। রাস্তাতেও তুমি নেই, অপেক্ষা করব তোমার জন্য... জানি না, যুদ্ধ থেকে তুমি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে কিনা।

'ভাবিস না,' হঠাৎ বলল এরকিনচাচা, 'চেষ্টা করব...'

'আপনাকে আপনার মা যে কবচটা দিয়েছেন সেটা আপনি শুধু শুধুই পরেন না। বুড়োবুড়ীরা জানে...'

'কেউ কিছুই জানে না। দেখা যাবে রে, ছেলে। সময়ে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।'

'আপনি তো এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না? আপনাকে আরও মোটা হতে হবে। তাতে লাগবে একমাস, হয়ত বা আরও বেশী।'

'আমি যুদ্ধে গিয়ে মোটা হব। সেটাই ঠিক জায়গা...'

তুমি ঠাট্টা করছ কেন এর্রাকিনচাচা? দেখছি, আমি তোমার কাছে থাকি বা না থাকি, তোমার তাতে কিছু যায় আসে না। বড়রা সবাই যেন কেমন অদ্ভুত ধরণের...

'হয়েছে,' বলল এর্রাকিনচাচা, 'মনে আছে, তোর বাবা কি বলতেন— নাক ওপরে তোল্ বুরাতিনোর মত!'

আমি নিঃশ্বাস ফেলে এর্রাকিনচাচার হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। এই আমাদের রাস্তা। সেটা দেখে এমনকি লজ্জা হয় এর্রাকিনচাচার সামনে। আর ও চোখ বন্ধ করে গভীর করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

'আঃ!' বলে চোখ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল কি একটা, ধুলো বোধহয়, আর এদিক ওদিক তাকাতে লাগল খুশীমনে। তারপর আবার চোখ থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলল। আমাদের এই রাস্তাটায় এক মিনিটও দাঁড়াবার যো নেই, হাওয়ায় ছাদের থেকে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে আসবেই।

'বেশ!' বলল এর্রাকিনচাচা। 'চমৎকার, রে ছেলে! শুধু শুধুই তুই তোদের রাস্তা সম্বন্ধে আজেবাজে কথা বলেছিস।' আমাদের ফটকের ওপর টাঙানো বোর্ড দেখে হঠাৎ হেসে উঠলও, 'দালানের লাইন, বাড়ী নম্বর ৮।'

হাসার কি হল? আজ ওর সবকিছুতেই ভাল লাগছে, হাসি পাচ্ছে। আমার মত অবস্থা না ওর।

'দালানের লাইন'? চারদিকে একটাও পাকা বাড়ী নেই!'

'আমি আপনাকে বলেছিলাম তো...'

'এরও একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। তুই জীবনের কিছুই বুঝিস না রে!'

আর যখন আমরা বোর্ডটা দেখাদেখি করছিলাম আর হাসছিলাম, আমাদের পেছনে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল— সোজা আমাদের দিকে আসছে আমাদের প্রতিবেশী আধপাগলা মদিনা আর তার সই শরাফৎ।

আমি কেঁপে উঠলাম— এমনভাবে দেখছে যেন আমরা কোন দোষ করেছি। আর এর্রাকিনচাচা কিছুই না বুঝে তাদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সালাম জানানর ভাবে।

'এ সেই লোকটা রে,' বলল মদিনা ঘৃণাপূর্ণভাবে এরকিনচাচার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে দেখিয়ে, 'যাকে এই অভাগা ছেলেটার মা নোরা নির্লজ্জভাবে বুকে তুলে নিয়েছে। ওর বাবা যুদ্ধে রক্ত ঢালছে বেচারী, কিছু দেখতে পাচ্ছে না!.. হায়! যা দিন পড়েছে...'

'এমনি যুগ,' সাদা মাথা নাড়িয়ে বলল শরাফৎ। 'সবকিছু এক হয়ে গেছে। সত্যি, মিথ্যে। পরপুরুষ, পরস্ত্রী। কোরানে বলেছে: "অন্ধকারে মানুষ নেকড়ের মত হয়ে যায়।"

এরকিনচাচা দাঁড়িয়েছিল মলিন মুখ, দিশাহারা ভাব আর বারবার গালটা ঘষছিল।

'আপনাদের লজ্জা করে না?'

'তুই আমাদের নিন্দা করিস না। আমরা পরস্ত্রীকে নষ্ট করি না, অন্যের বিছানায় ঘুমোই না। ওর বাবার নাম ডোবালি তুই, মরে নি এখনো। তুই আর ওর মা প্রেম প্রেম খেলিস আর ভাবিস আমরা অন্ধ, কালা? কিছু শুনি না, কিছু দেখি না? ভালয় ভালয় এপাড়া থেকে বিদেয় হয়ে যাও!'

'হায় অদৃষ্ট, কি বলছেন আপনারা?' এরকিনচাচা রেগেমেগে কি বলতে যাচ্ছিল; এমন সময় আমারও ভয় একেবারে পালিয়ে গেল, বললাম:

'তোমরা হিংসুটে আর পাজী! আমরা কোন রকমে ওকে সারিয়ে তুলেছি আর তোমরা... আর এ পাড়াটা তোমাদের একলার নয়, সবার...'

আমার কথা কেউ শুনছিল না, থামিয়ে দিচ্ছিল...

'কোথায় এমন দেখেছ? কোন দেশে? বিয়ে হয়ে গেছে, স্বামী বর্তমান? কি লজ্জা ছি ছি!'

'চলে যাও তোমরা, পাজী হিংসুটে! বাবা এসে তোমাদের দেখাবে! চল বাড়ী যাই।' আমি চাচাকে ফটকের দিকে টানতে লাগলাম, কিন্তু ও জিদ করে দাঁড়িয়ে রইল, সারা শরীর কাঁপছিল তার, চীৎকার করে কি যেন বলছিল।

এমনি চলতে লাগল, যতক্ষণ না রাস্তায় দেখা গেল মাকে।

আমি ছুটে গেলাম মা'র কাছে:

'মা!'

থেমে গেলেন মা, কিছু না বুঝতে পেরে হাসপাতালের ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন বাড়ীর দিকে। আর কারুর দিকে না তাকিয়ে এরকিনচাচাকে বললেন:

‘কি ? আমি আপনাকে বলেছিলাম কিনা যে এখনও দেরী আছে ! বলেছিলাম না কি !.. কি ঘটছে এখানে ।’

মিনিটখানেক সবাই চুপ করে রইল, মাকে লক্ষ্য করতে লাগল যেন এই প্রথম দেখছে তাঁকে আর এরকিনচাচা কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমতা আমতা করে বলল:

‘বাজে ব্যাপার ! সত্যি...’

আমি মা’র ও এরকিনচাচার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর শয়তানীভরা, বিস্মিত মুখগুলির দিকে দেখতে লাগলাম।

‘কার কি জানা দরকার ?’ জিজ্ঞাসা করলেন মা। ‘আমি শুনছি...’

কিন্তু মা’র মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি কেমন উদ্বিগ্ন আর দিশাহারা বোধ করছেন, এরকিনচাচার জন্য ভয় পাচ্ছেন।

‘নোরা, আমরা জানতে চাই,’ ধীরভাবে মদিনা বলল, ‘এই পুরুষমানুষটি কে ?’

‘একথা আপনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেদিন ও প্রথম এসেছিল সেইদিন। আর কি বলার আছে ?’

‘তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে, ডাক্তার, আমরা তোকে সম্মান করি, কিন্তু লোকে... অবাক হচ্ছে...’

‘কেন ?’

‘পরপুরুষ, কি করে...’

‘এরকিনের চিকিৎসা হচ্ছে আমার বাড়ীতে। এ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করার দরকার নেই !’

‘...তুই বিবাহিতা...’

‘তাতে কি হয়েছে ? বুঝলাম না।’

‘ভাবছি, তোর স্বামী আনোয়ার, আমাদের সম্মানিত ইঞ্জিনিয়ার...’

‘দুঃখ পাবে, তাই তো ? তা’হলে শুনুন, আমার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার সুখী আর সন্তুষ্ট !.. আশা করি সবকিছু এভাবে বুঝিয়ে দেবার পর এ নিয়ে আর কোন কথা উঠবে না... কিন্তু যদি আমার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার সুখী ও সন্তুষ্ট নাও থাকত, তা’হলেও এরকিনের চিকিৎসা হত আমার বাড়ীতে!.. আর কিছু ?’

আর কোন প্রশ্ন শোনা গেল না।

‘ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।’ কড়া স্বরে মা হুকুম দিলেন এরকিনচাচাকে। এরকিনচাচা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে ছাদে ছায়াগুলি দেখতে

লাগল। আর মা যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে ইঞ্জেকশন দেবার জন্য সিরিঞ্জ তৈরী করতে লাগলেন।

আমার কাছে সবকিছুই ভীষণ দুর্বোধ্য লাগছিল। বাবার কথা উঠছে কেন জানি না। মা যে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন একেবারে মরণাপন্ন এরকিনচাচাকে আর আজ সে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়েছে, তাতেই বা ক্ষতি কি? বড়দের এতে আনন্দ হবার কথা আর ওরা... যদি এরকিনচাচার ভাল লাগে মাকে, যদি ও সারাদিন মা'র হাসপাতাল থেকে ফেরার অপেক্ষায় থাকে আর মা ফিরে ওকে বড় করে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন তখন ও আনন্দে প্রায় লাফালাফি করে, তাতে দোষটাই বা কি? মাও ইদানীং, আমি লক্ষ্য করেছি, প্রায়ই এরকিনচাচার সঙ্গে বসে বসে মৃদুস্বরে গল্প করেন, ওরা হাসে কখনও, ওদের দু'জনেরই ভাল লাগে, আনন্দ হয়। এতে খারাপ কি আছে বুঝি না। আর যখন আমরা বাবাকে এরকিনচাচার কথা লিখেছিলাম, বাবাও মাকে প্রশংসা করেছিলেন আর পাঠিয়েছিলেন কার্ডবোর্ডের থেকে কেটে নেওয়া একটা পদক যার ওপরে লেখা ছিল "উদারতা প্রদর্শনের জন্য, প্রথম শ্রেণীর" আর বলেন মাকে, সত্যিকারের পদক দেবেন যখন নিজে পাবেন।

'মেহ্দি।' মা ডাকলেন আমায়, 'যা চাচার কাছে গিয়ে একটু বোস। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।'

আমি ওর ঘরে ঢুকলাম, ও কিন্তু একটুও নড়ল না, একমনে ছাত পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

'যাক, মন খারাপ করবেন না,' বললাম আমি। 'আমরা ওদের হারিয়ে দেব, ওই বুড়ীগুলোকে। যত সব বাজে লোক!'

'হ্যাঁ,' বলল এরকিনচাচা, কিন্তু খুব আস্তে করে। 'বাজে লোক। তুই কোথা থেকে জানিস যে বাজে লোক?'

ও একটু সরে গেল আর আমি বিছানার ধারে বসলাম।

'আপনি বরং আমাকে বনের গল্প বলুন।' বললাম আমি, 'সেই বনটার কথা।'

'ওঃ সে তো আমি তোকে অনেক বলেছি!'

'আমি বনের গল্প শুনতে ভালবাসি।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। '... সেই বনে... আমরা চলেছি, চলেছি বনের মধ্যে দিয়ে গোটা বাহিনীটা, অনেক সৈন্য। চলেছি একদিন, দু'দিন, চলেছি, চলেছি, বনের আর শেষ হয় না। তারপর হঠাৎ অন্ধকার,

কিছু দেখা যায় না। রাস্তা না। আলো না। ভয়ঙ্কর। চুপচাপ চলেছি, সাবধানে... চারপাশে জার্মানরা। অনেক জার্মান। হঠাৎ একজন সৈন্য সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে উঠল, "মাগো, ডাক দাও! বাঁচাও আমাকে, মা!" আর ওদিকে জার্মানরা গুলি চালান আরম্ভ করল... স্টেনগান, কামান, ট্যাংক থেকে গুলি ছুটল। সৈন্যটা চেঁচিয়েই যাচ্ছে, "ডাক দা-ও!.."

'তখন কম্যাণ্ডার নিজের বক্ষ থেকে জ্বলন্ত, চোখ-ধাঁধান হৃদয়টাকে বার করে আনল আর উঁচু করে ধরল মাথার ওপর; এইভাবে বনের মধ্যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, বন আলো হয়ে উঠেছে, ভয়ের আর কিছু নেই... ঐ কম্যাণ্ডারের নাম দানকো*।'

'ব্যাস?'

'হ্যাঁ।'

'আর তারপরে? ওরা বন থেকে বেরোল? সৈন্যটা শান্ত হল?'

'বাকীটা কাল। তোর ঘুমোতে যাবার সময় হয়েছে।'

... আমিও যাচ্ছি বনের মধ্যে দিয়ে। চারদিক অন্ধকার ভয়ঙ্কর। জট পাকান ভয়ঙ্কর শিকড়গুলি হাত বাড়িয়ে আছে আমাকে ধরবার জন্য। আমি চীৎকার করছি, পালাতে চাইছি। কিন্তু পাগুলো যেন মাটিতে আটকে গেছে। গাছগুলোর থেকে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে বাবা-ইয়াগা ডাইনী, মদিনার সঙ্গে তার খুব মিল। তাকিয়ে আছে আর গায়ে জ্বালাধরানো হাসি হাসছে:

'হা-হা! গোটা পাড়ার কাছে তোমাদের এখনও কৈফিয়ৎ দিতে হবে...'

অন্য একটা গাছ থেকে আর এক ভয়ঙ্কর বুড়ী শরাফৎ:

'কি যুগ, কি যুগ... সবকিছুর জন্য জবাব দিতে হবে।' বলে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার গলা টিপে দিতে চাইছে।

'মা!' চীৎকার করে উঠি আমি। 'মা, ডাক দাও! বাঁচাও মাগো!'

চীৎকার করছি, কিন্তু নিজের গলা শুনতে পাচ্ছি না। ভয়ে জমে গেছি।

'কি হয়েছে, বাবা, শান্ত হ'!' মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন।

---

* দানকো — সোভিয়েত লেখক মাক্সিম গোর্কির ছোটগল্প 'বুড়ী ইজেরগিল'-এর নায়ক। — সম্পাঃ।

চোখ মেললাম — আমাদের ঘর, মা, এর্রাকিনচাচা, রাত্রি।

'মা,' বলি আমি, 'আমার কাছ থেকে লুকোবার দরকার নেই। কি হয়েছে? ঐ বুড়ীগুলো কি চায়? আমি জানতে চাই, সব জানতে চাই!..'

'আপনাকে অনুরোধ করছি, ঐ মর্দিনার চোখে যত কম পড়া যায় সেই চেষ্টা করবেন।' বললেন মা এর্রাকিনচাচাকে। 'ও আধপাগলী, কোন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে।'

'সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন পুরো সুস্থ। শীগ্গির ফ্রণ্টে ফিরে যেতে পারব।'

তারপর উঠে টিনের তৈরী সৈন্যের মত হাঁটতে আরম্ভ করল ঘরময়। আর মা চীৎকার করে তাকে বলতে লাগলেন:

'হয়েছে, হয়েছে। যথেষ্ট। বেশী হাঁটাহাঁটি করার দরকার নেই।' ওরা দু'জনেই হেসে উঠল — এত খুশী ওদের মনে।

বড়রা কেমন যেন অদ্ভুত। প্রায়ই অমনি অমনি হাসে কোন কারণ ছাড়াই, কিন্তু মা আর এর্রাকিনচাচার খুশী হওয়ার কারণ আছে — প্রায় সেরে উঠেছে চাচা, হাসুক, আরও বেশী করে হাসুক, কারণ এতদিন মা'র কোন আনন্দ ছিল না, এতদিন হাসেন নি।

'আবার বাঁচা কি মজার, হাঁটতে পারা কি আনন্দ!' বলছিল চাচা। 'আমি সব সময় মনে করব যে পৃথিবীতে একজন মহিলা আছেন যিনি আমার দুঃখের দিনে সাহায্য করেছেন। সেই মহিলা আপনি, নোরা।'

'কি যে বলেন! এমন বড় বড় কথা বলার কি দরকার?'

'বিশ্বাস করুন, এ আমার আনন্দ।'

এইভাবে সেই সন্ধ্যায় তারা কথা বলেই যেতে লাগল, পরস্পরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, আর আমার তাতে হাসি পেতে লাগল। তারপর এর্রাকিনচাচা বলল:

'আমি আপনাদের বাড়ীতে আছি, আজ ঠিক তিন মাস হল। বিশে আগষ্ট থেকে বিশে নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিমাসের বিশ তারিখ — আমার উৎসবের দিন। কল্পনা করতে পারেন নোরা, আমি কেমন ধনী — প্রতিমাসে একটা করে উৎসব, বছরে বারোটা উৎসব!'

এরপর হঠাৎ এর্রাকিনচাচা যা করল, তাতে আমি একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। মা'র হাত ধরল ও, আর ওরা দু'জনে আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল চাচার গাওয়া এক করুণ সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ওরা

আমার কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে নাচতে লাগল আর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বসে বসে প্রশংসার চোখে তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। আর কখনও আমি দেখি নি চাচার মুখে এমন সুখী, বিষণ্ণভাব আর কখনও ভাবতেই পারি নি যে মা এমন সুন্দর নাচতে পারেন, মাকে বাবার সঙ্গে নাচতে কখনই দেখি নি। হয়ত এমনিই বাবা নাচতে পারেন না বা চান নি, কখনও নাচার সময় ছিল না।

চাচা মা'র দ্বিগুণ চওড়া আর প্রায় মা'র দ্বিগুণ লম্বা, ওকে কুৎসিত দেখাচ্ছে কারণ ওর ঘাগুলো এখনও পুরো সারে নি।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে নাচতে লাগল, কারণ দেখা গেল চাচা যে সুরটা গাইছিল সেটা খুব লম্বা।

তারপর মা দেখলেন যে আমি ওদের দিকে তাকিয়ে আছি, চাচাকে বললেন:

'ওকেও সঙ্গে নিই।'

আমিও তাদের মাঝখানে গিয়ে ঘুরতে লাগলাম, হাসতে লাগলাম আর চাচার গাওয়া গানের সুরটা ভাঁজতে লাগলাম...

এতদিন ধরে মা ঘুমোন কিনা আমি একেবারেই জানি না, সন্ধেবেলায় এরকিনচাচার ঘরে গিয়ে ঢোকে বালতিভরা ভয়ংকর, বিশ্রী তুলো আর এম্পুল নিয়ে বাইরে ফেলে আসেন, ছুটোছুটি, তাড়াহুড়ো করেন, একটুও বিশ্রাম নেন না — নিজের সমস্ত সময়, ঘুম, খাওয়া, বিশ্রাম সব ছেড়েছেন এরকিনচাচাকে একেবারে পুরোপুরি সারিয়ে তোলার জন্য।

সকালবেলায় ঘুম ভেঙেই দেখতে পাই জানলার কাছে ওদের দু'জনকে — মাকে আর এরকিনচাচাকে, তারা দেখছে, বাগানে কেমন করে সূর্য এসে পড়ে, কথা বলে আস্তে, নীচুস্বরে যেন নতুন দিন আর সূর্যকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না। ওরা কি সম্বন্ধে কথা বলছে? কান পেতে শুনেছিলাম একদিন। কিছুই বুঝতে পারি নি। শুধু শরৎ আর আঙ্গুরলতার পাতার সম্বন্ধে যেন পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

ঐ দিন আমরা বাবার চিঠি পেয়েছি। আবার নিজের কথা লেখার চেয়ে আমাদের কথাই লিখেছেন বেশী। সে চিঠি থেকে একটা কথাই মাত্র জানা যায় যে সারা দিন-রাত ধরে তিনি, অন্য সৈন্যদের সঙ্গে গ্রামশহর পেরিয়ে চলেছেন। এ আবার কেমন যুদ্ধ না যে সারাদিন ধরে সৈন্যরা কেবল চলেছেই যেন যুদ্ধ — সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়ান ছাড়া আর কিছুই নয়।

মা আর আমি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর লিখতে বসলাম। প্রথমে মা লিখলেন যা যা নিজে বলতে চান সবকিছু...

“প্রিয় আনোয়ার, যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে বাঁচি, তুমি না থাকায় যে আমার কি কষ্ট হচ্ছে তা কল্পনাও করতে পারবে না। এরকিন ইতিমধ্যেই সেরে উঠছে, মেহ্‌দির সঙ্গে রাস্তায় বেরোয়। ওকে নিয়ে কি কষ্ট গেছে! কিন্তু ও বেশ ভাল, মনটাও ভাল আর কোন বায়নাক্কা নেই। তুমি নিজের কথা এত কম লেখ কেন? তুমি কেমন আছ, আমি কিছুই জানি না, মাঝে মাঝে আমার ভীষণ ভয় হয়। এরকিনের দিকে তাকিয়ে ভাবি মানুষের কত কষ্ট হয়, কেমন সবকিছুই অদ্ভুত। প্রথম লড়াইয়েই ও আহত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই ও সেরে উঠছে, শীগগির ফ্রণ্টে ফিরে যাবে। আর হঠাৎ যদি তোমাদের দেখা হয়ে যায় সেখানে, বেশ মজা হবে!..”

খালি এরকিন আর এরকিন... এরকিন এই করেছে, এরকিন ঐ করেছে... ঠিক আছে, আমি ওর সম্বন্ধে একটা কথাও বলব না, মা’র ওপর রাগ করেই বলব না।

“বাবা গো, আমি এর মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছি। সবাই স্কুলে যায় আমি ছাড়া। তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি ফিরে এলে লেখাপড়া আরম্ভ করব। এখন লেখাপড়া মাথায় ঢোকে না কিছু। তোমার কথা ভাবি খালি...”

মা আর আমি উঠোনে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছিলাম। এরকিনচাচা ঘুমোচ্ছে। মা একটু আগে ওর ব্যাণ্ডেজটা বদলে দিয়েছেন আর ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

‘শীতকাল আসছে, লম্বা, ভীষণ লম্বা শীতকাল,’ বললেন মা।

‘আমি বরফ ভালবাসি! তুমি তো জান, আমি কি ভালবাসি বরফ!’

‘হাসপাতালে ছুটি যখন শীতকালে তখনও অন্ধকার রাস্তায়,’ অন্য কি কথা ভাবতে ভাবতে বললেন মা।

অনেকদিনই মাকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছি:

‘বল দেখি মা, চাচা ঘুমোচ্ছে, আমি ঘুমোই, বাবাও বোধহয় ঐ সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুমোয়, কেবল তুমি ঘুমোও না। আমি শুনতে পাই দেয়ালের ওপাশে বিছানায় শুয়ে তুমি কেবল এপাশ ওপাশ কর, কেন?

‘আমি লক্ষ্য রাখি, রাত্রে হঠাৎ যেন চাচার অবস্থা খারাপ না হয়ে পড়ে।’

‘তোমার মনে আছে, বাবার কাজ নিয়ে একবার কি গোলমাল হয়েছিল, তোমরা ঘুমোচ্ছিলে না। আমায় বলছিলে, ঘুমো, ঘুমো, আর নিজেরা

ঘুমোচ্ছিলে না। তুমি যদি আমায় সব বলতে তো তোমার হালকা লাগত হয়ত।’

কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে মা আমাকে কেবল বুকে চেপে ধরলেন।

এছাড়া মা প্রায়ই বাবার জিনিসগুলো নিয়ে দেখেন, বাবার জামাটা হাতে নিয়ে বসে থাকেন, দেখেন... বাবার চিঠিগুলোও বারবার করে পড়েন। আমায় বলেন না কিছুই। কি যেন ভাবেন, ভাবেন।

আমি মাকে বলি:

‘তোমার এত চিন্তা করা উচিত নয়, স্কেরোসিস হবে। মনে আছে, তুমি বাবাকে বারণ করে দিয়েছিলে বেশী চিন্তা করতে, বলতে যে স্ক্লেরো-সিস হবে।’

ভীষণ ইচ্ছে করে জাদুকর হয়ে যেতে তা’হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতাম, মা’র মনে কি আছে, মা এত চিন্তা করেন কেন। মনে পড়ে, রূপকথার জাদুকর বলতে ভালবাসত — এক বুদ্ধির চেয়ে দুই বুদ্ধি আরও ভাল।

এমন সময় বাবার চিঠি এল।

‘মেহ্দি,’ মারাতের গলা শুনতে পেয়ে ছুটে বেরোলাম রাস্তায়। ‘নাচ।’ বলল মারাত।

‘সময় নেই।’ ওর হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম মা’র কাছে।

‘বাবার চিঠি ! নাচো !’

‘বাবার চিঠি ?’ অন্যান্যবারের মত চীৎকার করে উঠলেন না, খুশী হলেন না। ‘কেমন যেন অদ্ভুত,’ বললেন মা, ‘আমি এখুনি ভাবছিলাম তোর বাবার কথা, আর হঠাৎ ওর চিঠি। যেন ও বুঝতে পারে...’

আশ্চর্য, বাবার হাসিখুশীভরা চিঠিটা পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন মা।

সারাদিন মনমরা হয়ে রইলেন মা। সবকিছু পড়ে যেতে লাগল হাত থেকে। বালতি পড়ে গেল, ওষুধভরা এম্পুল ভাঙল। তারপর মা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন, আমার কাছে বা এরকিনচাচার কাছে বেরোলেন না।

কি যে হয়েছে মা’র, জানি না।

তখন তো আমি অনেক কিছুই বুঝতাম না। বুঝতাম না যে মা যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন, বুঝতে পারছিলেন না নিজেকে নিয়ে, নিজের মনকে নিয়ে কি করবেন...

"আমার ভালবাসার মা, তোমার জন্য ভীষণ মন যেন কেমন করে। আঙ্গুরগুলো এত ভাল ছিল যে সব সৈন্যদের একেবারে জিভে জল ঝরছিল। কিন্তু আমি তো আর কিপ্টে নই, সবাই মিলে খেয়েছি। মা, তুমি ভয় পেও না, আমায় মারতে পারবে না, আমি চেষ্টা করব যাতে মারতে না পারে আমায়, চারদিকে চোখ রাখব। তোমার দেওয়া কবচটা পরে থাকি সব সময়, এটা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়..."

'থাক,' চীৎকার করে উঠি, 'যথেষ্ট হয়েছে মৃত্যুর কথা!'

মারাত পেনসিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'এবার তুই লেখ। আমি পারছি না, আর মিথ্যা বলতে পারি না! যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা কি লিখব, অ্যাঁ?'

'তা'হলে যা, গিয়ে বল লায়লা-আপাকে — আপনার হাকিম অনেকদিন আগেই মারা গেছে। আমরা ওর হয়ে আপনাকে চিঠি লিখি।'

মরা ছেলের নামে মাকে এমনি চিঠি লেখার সময় প্রতিবারই আমরা পরস্পরের প্রতি রেগে উঠি। আমাদের দু'জনেই কেন যেন ওকে মেরে ফেলার জন্য নিজেকে দোষী মনে করি। কিন্তু কেমন করে সেই মাকে গিয়ে বলব যে তাঁর ছেলে আর নেই, যে শুধু শুধু তিনি ছেলেকে চিঠি লেখেন, ছেলে সে সব চিঠি আর পড়ে না অনেক দিন হল?

এইভাবে প্রতিসপ্তাহে আমরা মরা ছেলের নামে তার মাকে চিঠি লিখি আর মারাত তাঁকে পড়ে দেয় — অন্ধপ্রায় লায়লা-আপা, দেখতে পান না যে হাতের লেখা হাকিমচাচার নয়। তারপর তিনি উত্তর বলতে থাকেন আর মারাত ছেলেকে মা'র চিঠি লিখে দেয়। তিনি এমন হৃদয়ছোঁয়া কথা বলেন যে যখন আমরা তা শুনি আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, কারণ তাঁর ছেলে তো আর নেই।

আজ আমার চিঠি লেখার পালা। আমি বন আর আমার বাবাকে নিয়ে এক গল্প বানালাম, সে গল্পটা আমার জিভের ডগায় এমন ঘুরপাক খাচ্ছে যে ইচ্ছে হচ্ছে ছেলে যেন তার মাকে লিখুক:

"আমরা সব সৈন্যরা মিলে অন্ধকার বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, মেহদির বাবাও আছে দলে। মনে পড়ে, আমাদের পাড়ায় থাকে একটি ছেলে মেহদি — রোগা, লম্বা লম্বা পা? এখন আমরা চলেছি ওর বাবা ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারের সঙ্গে শত্রুদের হারিয়ে দিতে। বনের মধ্যে কখনও ঝোপের আড়াল থেকে ঝলক দিচ্ছে নেকড়ের চোখ, কখনও গাছে বসে বাবা-ইয়াগা ডাইনী দাঁত দেখাচ্ছে... গাছগুলো মড়মড় করছে কারণ তারা সবাই জাদুর বশ, আর

বাজ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে... আর সৈন্যদের মধ্যে কে যেন আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা গো, ডাক দাও, এখানে এস, সাহায্য কর আমায়!' আর তখন ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার, মেহ্দির বাবা, নিজের বুক থেকে হৃদয়টাকে উপড়ে আনল, শক্তিশালী সূর্যের মত উজ্বল আর সেই আলোয় সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বন ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, নেকড়ে, বাবা-ইয়াগা ডাইনী ছুটে পালাচ্ছে, গাছগুলোও শান্ত হয়ে গেল। আর সৈন্যরা সব জার্মানদের মেরে ফেলছে, আমাদের জয় হচ্ছে..." এইভাবেই আমরা লিখি। আমার গল্প উপহার দিই ওই মাকে। বিশ্বাস নিয়ে বাঁচা সহজ হোক তাঁর কাছে...

আমাদের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার উপায়ই নেই একেবারে। বেরোলেই দেখা যাবে, আধপাগলী মদিনা। কোন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কানাকানি করছে। আমাদের কথা নিয়ে, মা'র আর এরকিনচাচার কথা নিয়ে হিংসেয় আর ঘৃণায় কানাকানি করছে।

কি করলে যে ওর মুখ বন্ধ করা যায়।

এমন সময় আবার এরকিনচাচা নানান প্রশ্ন করে আমায় চিন্তায় ফেলে দেয়।

'আধপাগলী মদিনা আবার কিছু বলেছে নাকি?'

'না, না!'

'বলেছে, তোর মুখ দেখে বুঝতে পারছি,' বলেই তার মুখ মলিন হয়ে গেল, নাকি আমার এমনি মনে হল, জানি না।

এরকিনচাচা অমন কেন? ওদের ভয় পায় নাকি ও? আমি ছোট হলেও ওদের এক কণাও ভয় পাই না, আর ও...

ওর কিন্তু ছোটবেলায় খুব প্রতিভা ছিল, আমার মত নয়। বেহালা বাজাত ও এমন চমৎকার যে সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের মন গলে যেত, কাঁদত তারা।

'আপনি একজন বিরাট বাজিয়ে হলেন না কেন?' জিজ্ঞাসা করলাম। 'ছোটবেলা থেকে যারা বাজায় তারা সবাই তো বড় বাজিয়ে হয়ে ওঠে।'

'ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার বাবা ছিল নিষ্ঠুর। যখন দেখল যে আমি বেহালায় খুব মন দিয়েছি, বেহালাটা নিয়ে ভেঙে ফেলল। বাজিয়ে বলে এমন কোন পেশার অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে।'

'অদ্ভুত আপনার বাবা। আর আপনি কি করলেন?'

'প্রচণ্ড মনোকষ্টে এমনকি অসুখে পড়লাম। তারপর অভ্যাস হয়ে গেল। বোকা ছিলাম।'

'আমি কিন্তু কিছুতেই ছাড়তাম না।'

'জানি, তুই বীর... আমার বাবা জানত মাত্র সাতটা অক্ষর। গ্রামসোভিয়েতকেই পৃথিবীর কেন্দ্র বলে মনে করত। শুনেছি, যখন আমার জন্ম হয়, তখন বাবা মাঠ থেকে ছুটে এসে আমার কাছে রাখল একটা তুলো গাছের গোছা — সুখের প্রতীক হিসাবে... চেয়েছিল আমিও যেন তুলোর সঙ্গেই বড় হয়ে উঠি আর মাটিকে ভালবাসি। কিন্তু আমার জিদ চেপে গেল, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাশখন্দ চলে গেলাম, লেখাপড়া শিখলাম। শিক্ষক হলাম।'

'চাচা, আপনার ছেলেমেয়ে আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। হাতড়ে হাতড়ে গলাটা ধরল যেন তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'আমি একা...' আস্তে করে বলল। তারপর আবার, 'মা মারা গেছেন আর বাবাও গত বছর... তুই তো ভালই আছিস রে, তোর এমন মা...'

অল্পক্ষণ চুপ করে রইলাম আমরা।

'তা'হলে,' বললাম আমি, 'এবার ওষুধ খেতে হয়, কিছু করার নেই।'

বেচারী এর্‌কিনচাচা বিনাবাক্যব্যয়ে সম্মতি জানায়। ও কেমন করে বড়িটা গেলে দেখি আর ভাবি ওর পেটে বোধহয় হাজারটারও বেশী বড়ি জমে গেছে। কেমন করে সেখানে আরও খাবার ধরে বুঝি না। আমি হয়ত এমন পারতাম না, চেঁচাতাম, বড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিতাম, আর ও গেলে, গেলে, অসংখ্য বড়ি গিলেই চলে।

বড়িটা খাবার পরে ওকে পিঠটা ওপরের দিকে করে শুয়ে থাকতে হবে একটুখানি ধৈর্য ধরে। ও লাল হয়ে যায় কমলালেবুর খোসার মত, যন্ত্রণায় মুখ কোঁচকায়, ঠোঁট কামড়ায়। আমার ভয় হয়, জানি না কি করে ওকে সাহায্য করতে পারি।

এই তো এখনই দু'মিনিটও হয় নি শুয়ে আছে, এর মধ্যেই উসখুস করতে লেগেছে যেন জ্বলন্ত বিছানায় শুয়ে আছে, গোঙাচ্ছে।

'লক্ষ্মীটি, চাচা, আর একটুখানি, আর একটুখানি, ঠিক হয়ে যাবে...'

এর্‌কিনচাচা গায়ের থেকে কম্বলটা ফেলে দেয়। ওঠার চেষ্টা করে। আমি সাহায্য করি ওকে, জানলার কাছে নিয়ে যাই। ও জানলা দিয়ে দেখতে

থাকে আর হঠাৎ শিস দিতে আরম্ভ করে। প্রথমে প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না, তারপর ক্রমশঃ জোরে। পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যায় ও, আমার কথা, পিঠের ব্যথার কথা। আর চোখের থেকে কি একটা ঝেড়ে ফেলে ধুলো বোধহয়।

'চাচা...'

ও যে লাঠিটায় ভর দিয়ে চলে, সেটা নেয় আর টেবিল থেকে স্কেলটা উঠিয়ে নিয়ে হাতটা এগিয়ে ধরে বাজাতে থাকে যেন ওটা লাঠি নয় — সত্যিকারের বেহালা, আর আমি — হলভর্তি শ্রোতা।

দারুণ! এই তো চাচা — কেমন বাজিয়ে!

'কোন আনন্দের সুর বাজান চাচা!'

সে যেন শ্রোতাদের উদ্দেশে মাথা নোয়াল।

আমার সঙ্গে সবকিছুই যেন ঘুরছে, নাচছে। মোটা মোটা পায়াওয়ালা টেবিলটা ধুপ-ধুপ-ধুপ, বাটিটা মগটাকে জড়িয়ে ধরে তুক-তুক, বাবার হাই-বুটটাও থাকতে পারে না — ধুম-ধাম, জানলার কাঁচগুলোও দুলতে, কাঁপতে আরম্ভ করে ঝিন-ঝিন।

ওঃ দারুণ! এই হল আসল মজা! এমন মজা আমাদের বাড়ী বহুদিন হয় নি।

৭

আমি বরাবরই খুশী হই শীতকাল এলে, তার অপেক্ষায় থাকি। পরিষ্কার বরফ আঙ্গুরলতার ওপর, ছাদের আর লোকেদের টুপির ওপর পড়ে যা কিছু পচা, নোংরা সব ঢেকে লুকিয়ে ফেলে; শীতের পরে সমস্ত কিছু নতুন আর ভাল হয়ে যায় যতদিনে না পরের বছর গ্রীষ্মকাল আসে, আবার বাড়ীগুলির ছাতে ছাতে জঞ্জাল আর আঙ্গুরলতার মাচায় পচা ডালপালা আর পাতা জমে ওঠে। বরাবরই আমি শীতকাল পড়লে খুশী হই, তার অপেক্ষায় থাকি কিন্তু এবছর শীতকাল আবার আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এল বিষণ্নতা আর দুশ্চিন্তা, কারণ এরকিনচাচার অবস্থা আবার খারাপের দিকে চলল। পিঠের ঘাটা এখন শুকিয়ে গেছে, মা আর ভয়ংকর তুলো-ব্যাণ্ডেজ ফেলে আসেন না, কিন্তু ও এখন ভীষণ কাশতে আরম্ভ করেছে, অনেকক্ষণ ধরে কাশে আর রক্ত বেরিয়ে আসে ওর গলা দিয়ে।

কি যে হল আমার চাচার? যে শীতকাল আসার জন্য এত অপেক্ষা করেছি, ভেবেছি, আমি আর চাচা বরফের ওপর স্লেজ চড়ে বেড়াব, বরফের

ওপর দিয়ে ছুটব আর হাসব আর পরিষ্কার বাতাসে গভীর করে নিঃশ্বাস নেব।

আমি জানতাম, ঐ মুখপুড়ী পাগলী মদিনাটার শাপেই চাচার এমনি অবস্থা। শুনেছি, ও নাকি প্রতিবেশী কালান্তরের কাছে গিয়েছিল তাকে বলতে যেন সে চাচার মরণ ডেকে আনে আর মা'র জন্য আনে জাহান্নমে যন্ত্রণা-ভোগ। ঠিক্ আছে, বাবা আসুন, যদি এরকিনচাচা নিজে প্রতিশোধ নিতে না চায়, বাবা এসবকিছুর প্রতিশোধ নেবেন। এরকিনচাচা বোধহয় মদিনা আর অন্য সব প্রতিবেশীদের ভয় পায়, তা'নাহলে কবে উঠে গিয়ে ওদের মুখগুলো বন্ধ করে দিত। আর ও... ও খালি জিজ্ঞাসা করে মদিনা কি বলেছে। কেমন করে বলেছে? আর মা বেশ বাহাদুর, ওদেরকে কোন পাত্তাই দেয় না। যত খুশী বলুক বাজে কথা, আমার বয়েই গেল — এই হল মায়ের কথা। মা যে কি করে এত সাহসী হলেন, বুঝি না।

একবার আমাদের বাড়ীতে একসঙ্গে ছ'জন ডাক্তার এলেন, তারা চাচাকে পরীক্ষা করে চলে যাবার পর মা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

মা কাঁদছিলেন, কারণ এত রাত ধরে না ঘুমিয়ে চাচার কাছে বসে থেকেছেন আর এদিকে আবার ওর অবস্থা খারাপ হল। কাঁদছিলেন, কারণ বেচারীকে এত ইঞ্জেকশন দিয়েছেন, ওর ভয়ঙ্কর ব্যথা লেগেছে, আর এখন আবার সবকিছুর শুরু হল। মায়ের দুঃখের কারণ হল — চাচা ইতিমধ্যেই রাস্তায় বেরোচ্ছিল, বেহালা বাজাচ্ছিল আর এখন আর পারবে না, আবার ওকে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে হবে সেরে ওঠার।

বেচারী মা আবার পুরনো পোশাক পরে ঘুরতে লাগলেন, ভুলে গেলেন যে তিনি মেয়েমানুষ, মুখে একটু ক্রীম ঘষা দরকার। আবার মায়ের হাত থেকে সবকিছু খসে পড়তে লাগল। মা'র আর আগের মত হাসিখুশী নেই, আগের মত গর্বের ভাব নেই যে মা কারুর ভাল করতে পারছেন, কারুর কাজে লাগতে পারছেন।

কিন্তু এরকিনচাচার আসলে হয়েছে কি? মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা কেবল একটা কথাই জোর দিয়ে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আর কেবল বছর দশেক পরে যখন অনেক কিছুই আমরা ভুলে যেতে আরম্ভ করেছি, আমি হঠাৎ বাবার ড্রয়ারে পেলাম বাবাকে আমার আর মা'র

লেখা চিঠিগুলি। তার মধ্যে একটা চিঠি মা একাই লিখেছেন বাবাকে, আর অন্যসবগুলোই আমরা দু'জনেমিলে লিখেছি।

"প্রিয় আনোয়ার! তোমায় কি বলব, জানি না। এমন দুর্ভাগ্য... এর্কিন অসুস্থ। এর্কিন ভীষণ অসুস্থ। কি করব? বলে দাও আমায়। কেমন করে ওকে বাঁচাব? এখন ওকে মরতে দেওয়া অন্যায় নয় কি, বল তুমি, তুমি তো সবই জান আনোয়ার, তোমার পায়ে পড়ি..."

৮

'মসজিদে চল,' হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল মারাত আর আমরা সবার বাড়ীর পিছনদিক দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে মসজিদে গিয়ে হাজির হলাম, তারপর একেবারে ওপরে গম্বুজের কাছে উঠে গেলাম। সেখানে একটা গোল গর্ত ছিল, যেটা দিয়ে মসজিদের ভেতর কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখা যেত।

বুড়োরা, ওদের চকচকে জুতোগুলো, পাগড়ী আর মোল্লা কালান্তর। এই সবকিছু নীচে মিলেমিশে গেছে, এক হয়ে গেছে বিভিন্ন রং আর গন্ধ। গর্তটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে শ্যাওলাঢাকা দেওয়ালগুলোর গন্ধ, আমাদের নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না।

ঐ যে নামাজ পড়া শেষ হল, আল্লাহকে মনের কথা জানিয়ে সবাই এবার কালান্তরের চারপাশে ভীড় করল। আর জ্ঞান-মর্যাদায় পূর্ণ কালান্তর আকাশের দিকে হাত তুলে বলল:

'হে মুসলমান ভাইরা! আজ আমাদের বিবেচনা করতে হবে ভদ্রতা, সম্মানের প্রশ্ন...'

মারাত বিষণ্ণ মুখে এক মনে শুনছে আর আমার কেমন যেন হাসি পেয়ে গেল।

'মহান গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'যখন লোকেরা মোটা হতে আরম্ভ করে আর নিশ্চিন্ততায় আল্লাহকে ভুলে যেতে আরম্ভ করে, তখন খোদাপ্রেরিত কালো তারা দেখা দেয় আকাশে আর তখনই লোকেরা খেপে ওঠা ভোমরার মত একে অপরকে হুল ফোটাতে আরম্ভ করে...'

ও বোধহয় ওর বাবার কথা বলছে, বেচারী ঘুমন্ত অবস্থায় ভোমরা গিলে ফেলে মারা গেল।

'জানবে, যে যুদ্ধই হল, সেই দুর্ভাগ্যের তারা! আরও, জানবে যে

উজবেকরা নিজেরাই খোদার কথা ভুলে গিয়ে এই দুর্ভাগ্যের তারাকে ডেকে এনেছে নিজেদের শিশুদেরই মাথার ওপর...'

'মজার ব্যাপার, না, মারাত ?'

'আস্তে !'

'তার মানে আমাদের বাবারা নিজেরাই ঐ দুর্ভাগ্যের তারাটাকে ডেকে এনেছে ?'

'চুপ !'

'আর যখন আমাদের পুরুষমানুষেরা আমাদের ধর্মরক্ষার জন্য ঐ অভিশপ্ত কাফেরগুলোর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে, তাদের স্ত্রীরা... বিবেক সম্মানের কথা ভুলে যায়...'

তারপর হঠাৎ সবাই চীৎকার করে উঠল, "ঠিক !" তারপর সবাই উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করতে আরম্ভ করল জানি না কেন।

'ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারের স্ত্রী ডাক্তার নোরাকে তোমরা সবাই জান...'

সবাই বলল:

'জানি !'

আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই।

নোরা ? কোন নোরা ? এ যে আমার মা। ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারের স্ত্রী।

'ওর আচারব্যবহারে মেয়েমানুষরা বিরক্ত। তারা ক্রুদ্ধ। তারা আমার কাছে এসে অনুরোধ করেছে যেন ভাইরা, আমরা সবাই মিলে শেষ অবধি স্থির করি যে ঐ পুরুষমানুষটির সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু আছে নাকি যা উজবেক মেয়ের লাজুকতা, নম্রতার খ্যাতিকে নষ্ট করে।'

'ও নিজের স্বামীর কথা একেবারেই ভুলে গেছে !' চীৎকার করে উঠল পাগলী মদিনার স্বামী মক্কা। 'আমার স্ত্রী জানতে পেরেছে ওদের নষ্ট সম্পর্কের কথা।'

'লজ্জার কথা ! আমাদের মেয়েরা যদি ওই ডাক্তারকে দেখে এমনি করতে শেখে, তা'হলে কি হবে ?'

'আমরা পুরুষেরা হাস্যস্পদ হয়ে পড়ব, স্ত্রীরা আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে !'

'আর কোরানে যেমন বলা আছে — পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে, আর অনাচারে বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের পাড়া থেকে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হোক ! তাড়িয়ে দেওয়া হোক !'

আমি রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মারাতকে ফিসফিস করে বললাম:

'বাজে কথা! কিছু করতে পারবে না। ওটা ওদের একার পাড়া নয়, সবার পাড়া।'

'ছুটে গিয়ে তোর মাকে সতর্ক করে দিতে হবে।'

'বাবা ফিরে আসবেন... দেখিয়ে দেবেন ওদের...'

'মিথ্যাকথা!' হঠাৎ শোনা গেল মসজিদের ভেতর থেকে।

'কার এত সাহস?' বুড়োরা নড়েচড়ে উঠল, ফিসফিস করতে লাগল।

'এ মিথ্যা!' ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে কালান্তরের উদ্দেশে বলল সেই সিরাজ-বোবো যে প্রতিদিন সকালবেলায় সূর্যের দিকে তুলো ওড়ায়। 'আপনার সাদা মাথার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও (কালান্তরের সাদা মাথা আবার দেখল কোথায় ও?) আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না... সে একজনের চিকিৎসা করছে। সাহায্য করছে তাকে। ও ভাল কাজই করছে। আর আমাদের কোরানেও লিখেছে: "যে বিপদের মুহূর্তে মুসাফিরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তার জয় হোক!" তাড়াহুড়ো করে কথা বলছিল সে একবার এর দিকে আবার অন্য বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে, আর তার কথা শুনছিল সবাই মুখে-চোখে ঘৃণার ভাব নিয়ে। 'আমাকে তোমরা মেরে ফেললেও একমত হব না তোমাদের সঙ্গে।'

কালান্তর হাতঝাঁকি দিল যেন বলতে চাইল, দূর হয়ে যা, মূর্খ।

'যুদ্ধের সময়। লোকের দুঃখব্যথায় ও সাহায্য করছে, আমাদের ওর প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয়।'

'তার মানে, আমি ঠিক বলি নি?' বিশ্রীভাবে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল কালান্তর। 'শুনছ, মুসলমান ভাইরা, আমি ভুল বলেছি!'

'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' চীৎকার শোনা গেল।

'ওকে মসজিদ থেকে দূর করে দাও!'

কিন্তু সিরাজ-বোবো মনে সাহস সঞ্চয় করে কালান্তরের প্রতি চীৎকার করে বলল:

'আপনি আমার কথার উত্তর দিন, আমার কথার উত্তর দিন। আমার বিশবছরের ছেলেটার প্রাণ নেবার প্রয়োজন পড়ল কেন খোদার? ও যে মেষশাবকের মত নির্দোষ, নম্র? কেন? জার্মানরা ওকে মেরে ফেলেছে আর খোদা ওর প্রাণটা নিয়ে নিয়েছেন! কেন?'

'তোর মত গাধার পাপের ফল।' কালান্তর চিন্তা না করেই উত্তর দিল।

'যদি খোদার প্রাণ নেবার দরকার হয়েই থাকে, আমাকে, এই বুড়োকে নিয়ে নিলে তো পারত। আমার দিন তো চলেই গেছে। আর ওর বয়স অল্প, কিছুই দেখে নি, বাঁচতে চেয়েছিল ও।' কেঁদে ফেলল সিরাজ-বোবো। 'খোদা নিষ্ঠুর,' কাঁদতে কাঁদতে বলে চলল সে, 'কখনও ঠিক সময়ে শিকার নিতে আসে না। আর কোন বাছাবাছি করে না, যাকে নেওয়া উচিত নয়, তাকে নেয় !'

'থাম তুই !'

'পাগল !'

'ঐ মেয়ে ভাল কাজই করছে। আমার ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য সবকিছুই করত ও, কিন্তু ভগবানই ছেলেকে টেনে নিয়েছে। আমি ঐ মেয়ের সামনে মাথা নীচু করি, আর খোদাকে বলি, 'তুমি নিষ্ঠুর !' খোদা আমার বিচার করুন।'

সবাই সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল আর সিরাজ-বোবো আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল হিংসুটে বদমাশ লোকগুলির মধ্য দিয়ে...

আমরা দৌড় দিলাম বাড়ীর দিকে। আমি উঠোনে পায়চারী করলাম একটু, কান পেতে শুনলাম, তারপর এরাকিনচাচার কাছে গেলাম।

'ওরা কিছু-ছু করবে না, আপনি ভয় পাবেন না !' বলে আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। 'এখুনি বিষ্টি নামবে। ওরা ভয় পাবে।'

'ওরা এদিকে আসছে নাকি ?'

চাচার মুখ মলিন হয়ে গেল, উঠে বসল বিছানায়।

'না ! এখুনি বিষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি নামুক বিষ্টিটা।'

'মা আসবে এখুনি।'

'হ্যাঁ, এখুনি আসবে মা।'

'ধুত্তোরি ছাই, আসুক ওরা ! ওদেরকে আমি স্বপ্ন দেখেছি, ঐ প্রেতগুলোকে। অস্থিসার প্রেতগুলো ! আসুক তাড়াতাড়ি ! তাড়াতাড়ি !' চীৎকার করে উঠল ও।

'চাচা শুয়ে পড়ুন, আপনার পায়ে পড়ি !'

এমন সময় দরজায় টোকা দিল কে যেন। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে।

'ও হাওয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ হাওয়া।'

'যা মেহুদি, খোল, ভয় পাস না !'

'ডাক্তার নোরা, খুলুন !'

'এ কালান্তর !'

'হোক ও স্বয়ং শয়তান। খোল্ !' চীৎকার করে বলল চাচা, নিজের তো ওঠার ক্ষমতা নেই।

'ঐ মা'র গলা ! চাচা, মা এসেছে !'

ছুটে রাস্তায় বেরোলাম। মা আর কালান্তর... আরও দুই বুড়ো।

'মা ! বাবার চিঠি এসেছে।'

'আমরা এসেছি সমস্ত মুসলমান আর এ পাড়ার সমস্ত বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে,' বলল কালান্তর।

'ভেতরে আসুন।'

'না, না।'

বুড়োদের একজন, বদমাশ মক্কা ঘাড়, হাত রগড়াচ্ছে যেন গরম লাগছে। অন্যজন সাফার মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে। আরও কারা সব যেন আসছে ছুটে ছুটে, বাচ্চারাও। মদিনা নিজের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে।

আর মা সমানে চুল ঠিক করছেন।

'কি জানা দরকার আপনাদের ? যদিও আমি জানি যে, পাড়ার পক্ষ থেকে কিছু বলতে হলে মোড়লের বলার কথা।'

'চালাকি করিস না, চালাকি করিস না !' মদিনা মা'র কাছে ছুটে এসে কেন কি জানি নিজের বুকে ঘুষি মারতে লাগল, 'বেহায়া !'

'আপনি ডাক্তার, আমরা আপনাকে খুব সম্মান করি। আর আমরা চাই যে আপনি যেন না ভেবে চিন্তে এমন কিছু করে না ফেলেন, যা আপনার পরিবারের ওপর ছায়া ফেলে।'

'মেহ্দি, তুই এখানে কি করছিস, চাচার কাছে যা, আমি এখুনি আসছি...'

'তুমি এমন সম্মানিত লোকের মেয়ে, লেখাপড়াজানা লোকের স্ত্রী, নিজেও লেখাপড়া জান, বাড়ীতে পরপুরুষকে এনে ঢুকিয়েছ কেন ?' জিজ্ঞাসা করল মক্কা মাকে আর মদিনা তার কথায় সায় দিতে লাগল।

'আমি ডাক্তার, আহতের সেবা করা আমার কাজ।'

'ও তোমার ভালবাসার লোক !' মদিনা নিজের বুকে আঘাত করল।

'আপনারা বোধহয় ভুলে গেছেন যে যুদ্ধ চলছে। ও আহত, আমার কাজ ওকে সারিয়ে তোলা।' মা ধীরস্থির।

'আর আপনার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী ?' বলল কালান্তর। 'আমি সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি মুসলমান নই! আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলতাম কালান্তর কিন্তু আপনি তো বুঝবেন না... এরকিন!' চীৎকার করে উঠল মা। 'বেরিও না!'

কিন্তু চাচা কথা শুনল না। মলিন মুখ, ভীষণ অসুস্থ চাচাকে কোনরকমে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে দেখে সবাই পিছিয়ে গেল।

'আমি যা বুঝলাম, কথা হচ্ছে আমায় নিয়ে?' কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হাসল, চোখগুলো চক্‌চক্‌ করছে। 'ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত। বিচার করুন আমার!'

সবাই চুপ করে রইল। মা ওর দিকে ছুটে গেল।

'মেহ্‌দি! ওকে শুইয়ে দিতে হবে!'

'খালি নোরাকে কিছু বলবেন না... ওর কোন দোষ নেই...'

'ওকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও,' বলল কে যেন, 'ওর শরীর খুবই খারাপ!'

প্রতিবেশীরা সবাই আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল। কালান্তর, মদিনা, বৃদ্ধরা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা চাচাকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ও, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ভোরবেলায় কে যেন আমাদের বাড়ীর ফটকে পরপর কয়েকটা বোতল ভাঙল, বাড়ীর দোরগোড়া ভাঙা কাঁচের টুকরোয় ভর্তি হয়ে গেল।

তার মানে প্রতিবেশীরা আমাদের বয়কট করল, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

আচ্ছা, ঠিক আছে! দেখা যাবে, কে কাকে হারায়!

ভাঁড়ার ঘরে খুঁজে পেলাম কালো রংভর্তি একটা কৌটো, ভোরবেলাতেই ছুটে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে সমস্ত রংটা ঢেলে দিলাম মদিনার প্রিয় ফটকের ওপর। জ্বলুক রাগে এবার!

তারপর ঠিক করলাম, বাবাকে চিঠি লিখব যেন বাবা আমায় একটা বোমা পাঠান।

"বাবা, তুমি কোনরকমে লুকিয়ে আমায় একটা বোমা পাঠাও। না না, ভেবো না যেন ফ্যাসিস্টরা আমাদের শহরটা দখল করে নিয়েছে, মাকে বন্দী করে রেখেছে আর আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, যাতে আমি ওদের পক্ষে যোগ দিই। না সেসবকিছু না, যদি ফ্যাসিস্টরা এখানে আসত, তা'হলে আমি আর

মারাত গেরিলাদলে যোগ দিয়ে ফ্যাসিস্টদের নেতাকে ধরতাম ও মোটরসাইকেলে করে যাবার সময়। জিজ্ঞাসাবাদ করতাম ওকে, তারপর...

"জানি না কি করতাম ওকে নিয়ে, মাথা খাটিয়ে বার করতাম কিছু।

"আমাকে তুমি একটা বোমা পাঠাও। ভীষণ দরকার, বোমা ছাড়া কি করব জানি না।"

বসে বসে এইভাবে মনে মনে বাবাকে চিঠি লেখার খসড়া করছিলাম, হঠাৎ মদিনা আমাদের দরজায় ছুটে এল কালো রং মেখে ভূতের মত চেহারা।

'মেরে ফেলল! রঙে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল, একটু একটু করে পুড়িয়ে মারতে হয় তোদের, মহামারী আসুক তোদের বাড়ী!'

মা সেই চেঁচামেচিতে দিশাহারা হয়ে গেলেন আর আমি লুকিয়ে পড়লাম। মা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কি হয়েছে, কিন্তু মদিনা পাগলের মত চেঁচাতে লাগল খালি হুমকি-শাসানি ছাড়া কিছুই বোঝার উপায় নেই। মা আর পারলেন না ধৈর্য ধরতে, ওর মুখের ওপরই ফটকটা বন্ধ করে দিয়ে হুড়কো লাগিয়ে দিলেন।

মদিনা আরও অনেকক্ষণ ধরে চেঁচাল আর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এরকিনচাচার বিরক্তি ধরে গেল তাতে।

'কি চায় ওরা সবাই? কি?' বুঝতে পারে না ও।

'কান দেবার দরকার নেই,' যতটা সম্ভব শান্তভাবে বললেন মা।

'ভেবেছিলাম, সব ঠিক হয়ে যাবে — চলে যাব, ভুলে যাব! কিন্তু তা হবার নয়! এসব কি শেষ হবে না, নোরা?'

'তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। শীত পড়ায় এমনি হচ্ছে, ঠাণ্ডায় তোমার শরীরটা আবার খারাপ হল।'

'তুমি কি যেন লুকোচ্ছ, নোরা। আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে নিয়ে আর জ্বালা ভুগতে হবে না। তোমায় অনুরোধ করি, আমাকে হাসপাতালে দিয়ে এস।'

'বিশ্বাস কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মা ঢুকলেন সেই ঘরে, যেখানে আমি আলমারীর পেছনে লুকিয়েছিলাম মদিনার ভয়ে, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আমি আলমারীর পেছন থেকে বেরিয়ে এলাম। মা কেঁপে উঠলেন। আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

'মা মাফ কর আমায়, মদিনার ফটকে আর কখনো রং ঢেলে দেব না আমি।'

৯

প্রায়ই যখন চাচার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ত, মা উঠোনে বেরিয়ে এসে চীৎকার করতেন:

'মেহ্দি, শীগ্গির...'

আমাকে ছুটতে হত হাসপাতালে ডাক্তার জুলফিয়া-আপাকে ডাকতে মাকে সাহায্য করার জন্য, কারণ মা'র মনে হত যে, একা তিনি কিছু করতে পারবেন না। জুলফিয়া-আপা এসে মাকে সব বুঝিয়ে দিত, শান্ত করত, একসঙ্গে এরকিনচাচার দেখাশোনা করত, যতক্ষণে না ওর অবস্থা একটু ভাল হয়। মা'র খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ত বয়স্ক একজন কাউকে, যে মাকে উৎসাহ দিতে পারে, আর জুলফিয়া-আপা মাকে সবসময় উৎসাহ দিত।

আজও জুলফিয়-আপাকে ডাকতে ছুটতে হল হাসপাতালে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা হাতে লাল কাপড়ের টুকরো বাঁধা মহিলাটি ইতিমধ্যেই জানত, আমার কি দরকার, আহত সৈন্যে ভর্তি করিডোর দিয়ে আমায় নিয়ে চলল; আগের মত আমি আর এখন ওদের ভয় পাই না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ওদের , এখন আমি বুঝতে পারি ওদের মধ্যে কে সাধারণ সৈন্য আর কে জেনারেল।

'কোথায় যে গেল জুলফিয়া ? আপনি দেখেন নি জুলফিয়াকে ?' প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছিল মহিলাটি। আর আমি তাগাদা দিচ্ছিলাম আরও:

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, মা বলেছেন তাড়াতাড়ি !'

আমরা আবার করিডোরগুলি পেরিয়ে চলতে লাগলাম, ওয়ার্ডগুলিতে চোখ চালালাম কিন্তু কোথাও পেলাম না তাকে। কোথায় যে গেল ডাক্তার জুলফিয়া ? আমার মনে হতে লাগল যে মা সমানে আমাকে আর জুলফিয়া-আপাকে ডাকছেন যেন খুব খারাপ লাগছে মা'র।

জানা গেল যে, ডাক্তার জুলফিয়া স্টেশনে গেছে নতুন আহতদের নিয়ে আসতে।

'যেই উনি আসবেন, আমি তোমাদের বাড়ী পাঠাব ওঁকে,' বলল মহিলাটি।

আমি বাড়ীর দিকে দৌড়তে দৌড়তে ভাবতে লাগলাম, মাকে কি বলা যায়, যাতে মা শান্ত হন।

কে বেরিয়ে এল আমাদের ফটক থেকে ? দাদু ! দাদুমণি এসেছেন, বলা-কওয়া নেই, বরাবরের মত।

'দাদু! দাদুমণি!'

জড়িয়ে ধরলাম দাদুকে — কতদিন দেখি নি! কোনরকমে আমাকে একটা চুমু দিয়ে এগিয়ে চললেন দাদু। আমি দাদুর পেছন পেছন দৌড়লাম।

'ফিরে যা, বাচ্চাদের এসব ব্যাপারে থাকতে নেই!' চীৎকার করে উঠলেন দাদু।

'আমিও কালান্তরের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই! এত অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য!'

'কালান্তর!' দাদু কালান্তরের বাড়ীর ফটকে মুঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগল।

'কালান্তর!' চেঁচিয়ে বললাম আমি। 'যদি তুই ভীরু না হোস বেরিয়ে আয়!'

কালান্তর বেরিয়ে এল পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা, মাথায় পাগড়ি নেই, একেবারে ঘরোয়াভাব। মসজিদে আমি যে কালান্তরকে দেখেছি তার সঙ্গে একটুও মিল নেই।

'বন্ধু রে!' দাদুকে আলিঙ্গন করতে গেল কালান্তর। 'ভেতরে এস। তুইও আয়, ছেলে। তুই যদিও সেবার আমায় গাল দিয়েছিলি, কিন্তু আমি তোকে ক্ষমা করে দিয়েছি। কোরানে বলেছে, "সাত বছর পূর্ণ না হলে কোন পাপ ছোঁয় না তাকে।"

'ওর বয়স সাত বছরের বেশী,' বললেন দাদু। 'কিন্তু ব্যাপার তা নয়।'

'এস ভাই ভেতরে, এই পথিকের আশ্রয়ে।'

ও আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল, আমাদের বাড়ীর মতনই, উঠোনে তেমনই আঙুরলতা। আর আমার কেন জানি না সবসময়ই মনে হত, কালান্তরের বাড়ীটা অন্ধকার, বিষণ্ণ, রুগ্ণ বুনো বেড়াল ঘুরে বেড়ায় উঠোনে, আর উঠোনের গাছগুলোয় বড় বড় পেঁচা যেন বসে বসে সবাইকে লক্ষ্য করছে।

'তুমি আমাকে একবার প্রতারণার দায়ে দায়ী করেছিলে, ভাই,' কালান্তর দাদুকে বলল, 'আর এখন দেখছ তো, আমি কেমন নিঃস্ব গরীব। দেখ, ঘুমোই শতচ্ছিদ্র কম্বল পেতে, চুলায় কয়লা নেই একেবারেই। খোদার অনুভূতি আমার কাছে বেশী প্রয়োজন পার্থিব সুখের চেয়ে। সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছি গরীবদের মধ্যে। সরকারকে দিয়েছি দু'বস্তা ময়দা সৈন্যদলের জন্য — এই যে কাগজটা লেখা আছে এতে... বোস অতিথিরা, চুলায় পা গরম করে নাও, চুলাটা জ্বালিয়েছি আমার অত্যন্ত প্রিয় বইগুলি দিয়ে, তা' নাহলে

আমি জমে যেতাম... কিশমিশ খাও, শাশুড়ী পাঠিয়েছেন গ্রাম থেকে, যাতে আমি ক্ষুধায় না মরি।'

'হয়েছে।' বললেন দাদু। তিনি বসেন নি। 'এসবকথা আমি একশ' বার শুনেছি। আমি অন্য কথা জানতে চাই: তুই আমার মেয়েকে অভিশাপ দিস কেন ?'

কালান্তর দাদুর দিকে থালাভরা কিশমিশ এগিয়ে দিল।

'খান অতিথিরা, মনে কষ্ট দেবেন না...'

'আমার মেয়ে কি করেছে ?'

'নে ছেলে কিশমিশ। তুই কিশমিশ ভালবাসিস ?'

'না !'

দাদু আর কালান্তর চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

'মুসলমানদের তাই ইচ্ছে,' বলল কালান্তর। 'ওরা দাবী করেছে, আমি কথা শুনেছি।'

'আমার মেয়ে খারাপ কাজটা কি করেছে ?'

'লোকে বলছে, ও আর ঐ লোকটা... ও ঐ লোকটার সঙ্গে। যখন ওর স্বামী যুদ্ধে, মরণের মুখোমুখি।'

' ঐ বেচারী, আহত লোকটির সেবা করছে সেটাই ওর দোষ ?'

'মাফ কর, কিন্তু লোকে বলছে যে আরও খারাপ...'

'আমার মেয়ে নম্র, স্নেহময়ী মা আর বিশ্বস্ত স্ত্রী, খারাপ কোন কিছু ওর মাথাতেও আসতে পারে না। আর ও অসুস্থ, ঐ লোকটি। আর ঐ ভিখারী আর গাধীর দল একথা প্রমাণ করতে পারবে ? কে ওকে হাতেনাতে ধরেছে ?'

কালান্তর নীরবে দু'হাত ছড়াল।

'কে, নাম বল্ !'

কালান্তর দাদুর দিকে বালিশ এগিয়ে দিল:

'গড়িয়ে নাও ভাই, হাড়গুলো একটু বিশ্রাম পাক।'

'এবার আমি তোর মুখে থুতু দেব !'

'শান্ত হও, ভাই।'

'ধরলাম, ও কোন অনিষ্ট করেছে। সমস্ত অনিষ্টের বিচার করতে পারে কেবল একজন — সে হল ভগবান। আর মানুষকে বিচার করার অধিকার কারুর নেই — তোরও না, ওই মুসলমান গাধাদলের নেই আর মসজিদেরও নেই। আমাকে দেখে নোরা যে চোখের জল ফেলেছে ঐ জলের মতই সে পবিত্র।'

'যদি তুমি নিশ্চিত হও...'

'আমি নিশ্চিত। আমি চাই যে, তুই ওকে যেন আর কিছু বলিস না। ব্যাস... আজ আর রাগ বাড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে না, যথেষ্ট হয়েছে। চল্, মেহ্দি!'

'খোদা তোমাদের পরিবারের মঙ্গল করুন!' বলে কালান্তর ছাদের দিকে হাত তুলল। 'আমিন!'

যখন আমরা বাড়ী ফিরলাম, দাদু উঠোনে থেমে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর হাত ধুলেন, অনেকক্ষণ ধরে মুছলেন, তারপর চাচার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

চাচা একটু উঠে বসল দাদুকে দেখে, মৃদু হাসল।

'শুয়ে থাক, শুয়ে থাক... সেরে উঠছ?'

'মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি খরমুজ এনেছি। আর মেওয়া। তোমার কাজে লাগবে।'

তারপর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কি অবস্থা, নোরা? খুব কষ্ট হচ্ছে? আনোয়ার কি লিখছে?'

'লিখছে, যুদ্ধ করছে। আর কি লিখতে পারে ও। তুমি অনেকদিন আস নি বাবা।'

'কাজ রে, মেয়ে, এবছরটা খুব কঠিন সময়। নদীতে জল কম। তুলো হল না। কোন রকমে বিপদ এড়িয়েছি।'

খানিকক্ষণ এসব কথা শুনে তারপর চলে গেলাম নিজের ঘরে, শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বুঝতে পারলাম, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এমন কখনও হয় নি। বোধহয় উৎকণ্ঠাই এর কারণ, আজকের দিনটা কেটেছে স্বাভাবিকের থেকে বেশী উৎকণ্ঠায়। ভর দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে দেখি মারাতকে। ও আমার হাত ধরে টানছে, প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'কি হয়েছে? দাদু কোথায়?'

'দাদু চলে গেছে। তাড়া ছিল।'

'কেন?'

'চাচাও চলে গেছে।'

'কোথায়? দাদুর সঙ্গে?'

'না, দাদু আলাদা গেছে আর চাচাও নিজের মত আলাদা গেছে।' বলে মারাত নিজের থলিটা তুলে নিয়ে কোথায় যেন দৌড় দিল।

আমি প্রথমে ছুটে গেলাম চাচার ঘরে। তারপর মা'র কাছে।

'মা! মা! তোমরা চুপ করে আছ কেন? কোথায় তোমরা? কোথায় চাচা? তোমরা লুকিয়েছ কেন? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তোমরা লুকিয়ে আছ! আমি তো দেখতে পাচ্ছি!' মনে হল, মা, চাচা আর দাদু — তিনজন একসঙ্গে এখুনি বেরিয়ে আসবে আর হেসে উঠবে। বলবে...

'আ!' চীৎকার করলাম আমি।

'আ!' প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ।

আমি চীৎকার করতে করতে দরজায় ঘুষি মারতে লাগলাম। তারপর এরকিনচাচার তখনও উষ্ণ, ওষুধের গন্ধবেরোন বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম।

কেঁদে কেঁদে মনটা যখন একটু হালকা হল, বুঝলাম যে, এরকিনচাচা আর নেই এ বাড়ীতে।

কেন তুমি চলে গেলে, চাচা? এখন মদিনা আর কালান্তর কি খুশী হবে জান, ওদেরই তো জয় হল। আর বাবাকেই বা আমরা কি বলব? তোমাকে আমরা ধরে রাখতে পারি নি বলে বাবা মা'র ওপর, আমার ওপর কেমন রাগ করবে! মা'র অত সাহস, ওদের ভয় পায় না, ওদের মুখের ওপর হেসেছে, আর তুমি পুরুষমানুষ হয়ে... ছি চাচা...'

আমি চুপ করে ছিলাম, তোমায় কিছু বলি নি, এমনকি নিজের কাছেও স্বীকার করতে ভয় হচ্ছিল... তোমার জন্য আমার একটু লজ্জা হচ্ছিল, জান? মারাতের কাছে, মা'র, এমনকি নিজের কাছেও। কিন্তু সে তো আহত, সে তো আর... যাক। আর যুদ্ধে কি হয়? বাবা লিখছেন যে সৈন্যরা গুরুতর আহত অবস্থাতেও এমনকি যুদ্ধ করে...

আমি নিশ্চিত যে ও কাপুরুষ। এখনও ও কাপুরুষের মত কাজই করেছে। আর কাপুরুষদের আমি সহ্য করতে পারি না। না, না, ওকে আমি ক্ষমা করতে পারব না, ও ভয় পেয়েছে। আমাদের ফেলে পালিয়েছে। মা এতদিন ওর চিকিৎসা করেছেন, দুশ্চিন্তায় ভুগেছেন আর ও আমাদের ঠকিয়ে পালিয়ে গেল। ঠিক আছে। যাক চলে। অমন লোকের দরকার নেই আমার...

'দরকার নেই!' চীৎকার করে উঠলাম আমি, আর কানখাড়া করে

শুনতে লাগলাম ফিরে আসছে নাকি ও। যদি ফিরে আসত ও... আমি ওকে ক্ষমা করতাম... যদিও এখন ফিরে আসত, এখুনি...

না, ক্ষমা করতাম না। ও কাপুরুষ!

দরজাটায় ধাক্কা দিলাম। ছুটে বেরোলাম উঠোনে। সব নিস্তব্ধ। কোথাও কেউ নেই।

'মা!'

মা, মাগো কি হল তোমার? কেন কে জানে তুমি বসেছিলে মাটিতে। অমনিভাবে এক অবস্থায় তুমি বসেছিলে একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছ।

'মাগো!'

আমি তোমায় ডাকছিলাম, চীৎকার করছিলাম আর কাঁদছিলাম ভয়ে, কিন্তু তুমি সাড়া দিচ্ছিলে না।

কেমন যেন ভয় হচ্ছিল তোমাকে ছুঁতে। যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর চাচা কোথায়, তা'হলে কি হবে? কি বলব আমি তখন? ওর জন্য আমার লজ্জা হচ্ছিল। আর মাগো, কষ্ট হচ্ছিল তোমার জন্য। ওর কাপুরুষতা কি ক্ষমা করা যায়? মোটেই না! তাহলে তুমি কেন ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছ? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ও আমাদের ঠকিয়েছে? যাক্, আর একটুখানি ধৈর্য ধর, বাবা এসে যাবে শীগ্গির, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, আবার আগের মত সবকিছু সহজসরল হয়ে যাবে।

'মাগো!'

'কি রে মেহ্দি... আয় আমার কাছে।'

'বাবা আসবে শীগ্গির'।

'বাবা? এত অন্ধকার কেন রে, রাত নামল নাকি এর মধ্যে?'

'এখনও নামে নি...'

'বাবার চিঠি এসেছে?'

'কাল চিঠি আসবে। আমরা সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখব মারাত এসেছে চিঠি নিয়ে।

'ও, হ্যাঁ চিঠি। রাস্তায় বেরিয়ে দেখ্ তো। ও নিশ্চয়ই চিঠি লিখেছে। এইভাবে ও চলে যেতে পারে না। যা শীগগির...'

আমি উঠোনে বেরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর ভাবলাম ফিরে এসে বলব – না ও লেখে নি, ভয় পেয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ল, ছুটে

গেলাম রান্নাঘরে, তুলে নিলাম মাটির তৈরী সৈন্যটাকে — সেটাকে তৈরী করেছি সারা সপ্তাহ ধরে। চোখ, নাক, রাইফেল তৈরী করেছি, রং করেছি — সেটাকে ধরে আছড়ে ফেললাম মাটিতে। ঠিক হয়েছে ! বেশ হয়েছে ! লজ্জা করে না তোমার! তোমার জন্য মাই বা কেন এমন শোকে জ্বলছেন বুঝি না। আমি বাবার চিঠির কথা বলছি, আর মা ভাবছে তোমার চিঠির কথা। চিঠি লিখো না আমাদের, আর ফিরে আসারও দরকার নেই। তোমাকে দরকার নেই আমাদের। সবসময়ে তুমি প্রতিবেশীদের ভয়ে কাঁপতে, আমাকে বা মাকে কখনই তুমি ভালবাস নি।

'ব্যায়াম আরম্ভ কর !' বাবার গলা শোনা গেল।

'মেহ্দি !' মা'র গলার স্বরে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। 'খুলতে হবে না ! কি করছিস ?'

'আমি... বাবার গলা শুনছি...'

'শুনতে হবে না !'

মা আঘাত করলেন রেকর্ডটার ওপর।

'বলছি না, আমার মাথা... রেকর্ডটা পুরোন, ঘড়ঘড় করে... মাথাটা ফেটে যাচ্ছে !' মা ছুটে বেরোলেন রাস্তায়, বোধহয় এরকিনচাচার চিঠি খুঁজতে।

কি করব ? মা'র সঙ্গে যাব, না ঘরে বসে বাবার কথা শুনব ?

'ব্যায়া... তি... পা... পা... মেহ...' শেষ হয়ে গেল রেকর্ডটা, থেমে গেল।

'বাবা !'

ভাঙা, নষ্ট রেকর্ডটা চুপ করে রইল।

মা কেন এমন করলেন ? এ যে বাবা, বাবার গলা ! বাবা মা'র কি ক্ষতি করেছেন ?.. কে এখন আমার সঙ্গে কথা বলবে, কে ? চাচা পালাল, মা কথা বলেন না, বাবাও আর নেই। আমি এখন একা, একেবারে একা, যেন ঐ অন্ধকার ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে...

'এই, মেহ্দি !' ফটকের কাছে দেখা গেল পাগলী মদিনার মাথাটা, জানোয়ার। 'আর আসবে না তোর নতুন বাবা। পালিয়েছে। ব্যাস, অপেক্ষা করিস না আর...'

'মূর্খ,' মনে মনে বলে আমি হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিলাম। মা বোধহয় ওখানেই আছেন। মা বোধহয় একা আর থাকতে পারছেন না, সবসময় কারুর চিকিৎসা করা অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই হাসপাতাল থেকে

আর একজন আহতকে আনতে চান। ভালই হয় তা'হলে। মদিনা বোধহয় ভাবছে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। তা আর হয় না! আমরা আর একজন আহতসৈন্যকে নেব, বসে বসে নিজের হাত কামড়াক পাগলী বুড়ী। এই নতুন আহতসৈন্যটি ওকে দেখিয়ে দেবে, মা'র নামে কলঙ্ক দেওয়া। ও সবাইকে দেখিয়ে দেবে, ও হবে সাহসী, শক্তিশালী, প্রকৃত সৈন্য।

কে বলতে পারে, হঠাৎ যদি মা নিয়ে আসেন একজন সত্যিকারের জেনারেলকে, তা'হলে মদিনা হিংসেয় একেবারে মরেই যাবে! চীৎকার করে যেই হুকুম দেবে, 'বি-শ্রাম!' শুনেই পড়ে না যেতে হয়। নিজের সৈন্যদের নিয়ে আসবে, গোটা বাহিনীটাকে, হাজারজন, না লক্ষজন, আর কালান্তরের ঘাড় ধরে ছুঁড়ে দেবে আকাশে ওর প্রিয় খোদার কাছে, ওখানেই থাকুক। মদিনা আর অন্যান্য বুড়ীদের সঙ্গে কথাও বলবে না। একবার ফুঁ দিলেই ওরা উড়ে চলে যাবে।

এইভাবে কল্পনামগ্ন অবস্থাতেই পেঁৗছে গেলাম হাসপাতালে আর মাকে দেখতে পেলাম। মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এপ্রনপরা একজন মহিলার সঙ্গে, তারা দু'জনেই কাঁদছিলেন।

'নোরা, ও কিছু না। তুই দেখিস, ও ফিরে আসবে। ও দুর্বল, একা কোথাও চলে যেতে পারবে না...'

'তুই কেন এসেছিস?' মা জিজ্ঞাসা করলেন। 'বাড়ী যা।'

'বকো না ওকে, ওর-ও তো মন খারাপ।' বলল মহিলাটি। 'আয়, ভেতরে আয় ছেলে, একটু গরম হয়ে নে।'

'চল, বাবা,' বললেন মা।

আমরা করিডোরে ঢুকে চুলার কাছে দাঁড়ালাম। মা বারবার রাস্তায় বেরোচ্ছিলেন, তারপর আবার হাত গরম করছিলেন — কথা বলছিলেন না, কাঁদছিলেন।

'মা,' বললাম আমি, 'আমরা অন্য একজন আহতকে তো নিতে পারি, ভাল, সাহসী কাউকে!'

পরে এমন বলার জন্য এত আফসোস হয়েছিল!

'এমন কথা মুখে আনবি না! বাড়ী যা!'

চলে এলাম আমি। বুঝবে যখন চলে যাব যেদিকে দু'চোখ যায়। বাবাকে খুঁজতে চলে যাব...

এরকিনচাচাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছুতেই যতই খোঁজ না কেন। আর ও মাকে চিঠিও লিখবে না। ওর পেন্সিল কাগজ কিছুই নেই।

ঠিক আছে, লিখুক না হয় একটা চিঠি, যাতে মা দুশ্চিন্তা না করেন। খালি এখানে যেন না আসে, এলেও ওকে আমি ক্ষমা করব না কিছুতেই।

ফটকের কাছে পেন্সিল আর কাগজ রেখে দিতে হবে ওর জন্য, মা চিন্তামুক্ত হবে।

আবার ঐ মুখদ্য মদিনাকে চোখে পড়ল, আবার খুশী খুশী ভাব।

'থাক্,' বললাম আমি ওকে, 'আজ আমাদের বাড়ীতে জেনারেল আসবে। তখন আপনারা আনন্দ করবেন খুব করে...'

ভীষণ খারাপ লাগছিল আমার, সারাত। এত রাগ হচ্ছিল ঐ বড়দের ওপর, ওদের সবকিছুই এমন জটিল আর গোলমেলে — বাবা কোথায় যেন যুদ্ধ করছেন, এরাকিনচাচা ছিল আমাদের বাড়ী, অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম ওর সঙ্গে, সবকিছু বেশ ভালই চলছিল, কিন্তু সেও হুট করে চলে গেল, আর মা'র একেবারে মাথার গোলমাল হয়ে গেছে, চেনাই যায় না মাকে; দাদু আগে মাঝেমধ্যে আসতেন, ঠাট্টা করতেন, হাসতেন — এবার দাদুও এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সবকিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, গুলিয়ে গেছে। আর তুইও বরাবরের মত বিষণ্ন। কি জানি কেন আমরা ফিসফিস করে কথা বলছিলাম:

'ও কি একেবারে চলে গেছে নাকি ?'

'গুজব শুনে কান ভারী হয়েছে না ? আমরা অন্য একজনকে নেব আরও ভাল, জেনারেল। মা হাসপাতালে গেছেন।'

'ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসত সেকথা সত্যি নাকি ?

'কি বললি ? আবার বল্ !'

'এতে খারাপের কি আছে, রে বোকা ? সত্যি বলছি, আমি তো মদিনার মত নোংরা কথা বলছি না, ভালবাসা — মানে আমি পড়েছি, ভালবাসা এমন জিনিস যে, লোকে মরে যায়।'

'মরে যায় ? কেন ?'

'আরে না রে ! বুঝলি, এ ভীষণ ভাল, ধুৎতোরি, এ ভীষণ ভাল, এমন ভাল যে যদি কারুর থেকে তার ভালবাসা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তবে সে খুন করে ফেলতে পারে। কিরে অমন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছিস কেন আমার দিকে ? তুই এখনও ভীষণ ছোট্ট আর বোকা, ভালবাসা কি, তা আমি তোকে বোঝাতে পারব না।'

'ফারহাদ-শিরীনের গল্পের মতন, তাই না ? সিন্ডারেলা আর রাজপুত্রের মত ? বুরাতিনো আর মালউইনের মত ?'

'হ্যাঁ, ফারহাদ-শিরীনের মত। বুঝলি এবার ?'

হ্যাঁ মারাত, এবার আমি একটু একটু বুঝতে আরম্ভ করছি। ভালবাসা... তুই-ই প্রথম একথা উচ্চারণ করলি, এখন আমি বুঝতে পারছি। সবাই নোংরা কথা বলেছে, গালি দিয়েছে, রাগ করেছে, কিন্তু কেউ বলে নি যে, এটা ভালবাসা, তাই আমি বুঝতে পারি নি। একটু আগে যদি এসম্পর্কে জানতে পারতাম, যদি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিত যে, এটা ফারহাদ-শিরীন, বুরাতিনো-মালউইনের মতই ব্যাপার, যে এতে লোকে আনন্দ পায়, কষ্ট পায়, কাঁদে আর একেবারে অন্য মানুষ হয়ে, তখন তারা কেবল ভাল কাজই করে ফারহাদের মত, সুখের সোনার চাবিটা খোঁজে বুরাতিনোর মত আর ভয়ংকর বুড়ো — কারাবাস-বারাবাসের সঙ্গে লড়াই করে তাকে হারিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু হঠাৎ আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম। আর আমার বাবা ? বাবার কি হবে তা'হলে ? বাবাও তো তোমাকে ভালবাসে মা, সেও বুরাতিনো, ফারহাদ, রাজপুত্রের মত ! কি করবে বাবা ? তুমি ভালবাসো বাবাকে আর এর্কিনচাচাকেও, তোমাকে ভালবাসে বাবা আর এর্কিনচাচাও। আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে...

'বল দেখি মারাত, তুই তো বলছিস, ভালবাসা ছিনিয়ে নেওয়া হলে লোকে খুন করতে পারে ?'

'হ্যাঁ... যেমন বাজপাখীর কাছ থেকে যদি তার ছানাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।'

'তাহলে বাবার কি হবে ? বাবাও কি খুন করবে ? আচ্ছা মারাত্, আমি যেমন করি তেমন করা যায় না ? মা-বাবা দু'জনকেই ভালবাসি আর ওরা দু'জনে মিলেই — আমাকে ?'

'বড়রা বোধহয় তা পারে না, মেহ্‌দি।'

'পারে ! পারে ! তুই বাজে বকছিস ! তুই কিছু জানিস না ! পারবে ওরা। বাবা-মা পারবে !'

মিনতি করি বাবা, পায়ে পড়ি তোমার, এমন কর যেন মা তোমাকেও ভালবাসে আর এর্কিনচাচাকেও ভালবাসে যদি মা এর্কিনচাচাকে ছাড়া থাকতে নাই পারে। সবকিছু যেন আগের মতই থাকে। আর কেউ কাউকে খুন না করে। এমন কর বাবা, তুমি তো ভাল। মা যদি ওকেও ভালবাসে

তোমার কি কষ্ট হবে নাকি? তার বদলে আমি ভালবাসব কেবল তোমাকেই। আমি ওকে এককণাও ভালবাসি না, যতই আমাকে কষ্ট দিক না কেন, আমি চেঁচাতেই থাকব, 'ঐ কাপুরুষকে ভালবাসি না, ঘৃণা করি!'

কে জানে, হয়ত মা'র ওকে ভালবাসা ভীষণ দরকার। হয়ত তোমাকে আর আমাকে ভালবাসা মা'র পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমাদের মা ঐরকমই, কিছু করার নেই। মনে আছে, তুমি নিজেই তো বলতে আমাদের মা ভালবাসতে চায় সব লোককে, সারা দুনিয়াটাকে...

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম একটু, হঠাৎ যদি এরকিনচাচাকে দেখা যায়, হঠাৎ যদি ফিরে আসে।

ফিরে আসুক, যদি মা'র ওকে প্রয়োজন থাকে। যাই হোক না কেন আমি ওকে ভালবাসব না। বাবা, তুমি আর আমি একসঙ্গে ঘুমোব আর ফিসফিস করে নানারকম গল্প বানাব — চাচার শোনার দরকার নেই, ওর সঙ্গে খেলি না আমি...

ঘুমোচ্ছিলাম না আমরা। আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম আর মা চেয়ারে বসেছিলেন। দু'জনেই কিসের যেন অপেক্ষা করছিলাম। চারদিক নিস্তব্ধ... ঘড়িটাই কেবল কারুর জন্য অপেক্ষা করছিল না, বরাবরের মতই ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছিল — নয়, দশ, এগার...

মা কান খাড়া রেখেছিলেন। আমিও তাই। কিসের অপেক্ষায় আছেন মা? আমিই বা কিসের অপেক্ষায়?

প্রায় মাঝরাতে মা আরও বেশী দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বারবার উঠোনে বেরোতে লাগলেন আর ফিরে আসতে লাগলেন আরও মনমরা আর বিমর্ষ হয়ে।

হঠাৎ আমার কানে এল উঠোনে মা'র ভয়ংকর চীৎকার, একটামাত্র জামাপরা অবস্থাতেই ছুটে বেরিয়ে গেলাম বাইরে ঠাণ্ডায়।

'আলো আন্!' শোনা গেল মা'র গলা, 'শীগ্গির...'

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, দেখছি অথচ বুঝতে পারছি না। ফটকের কাছে অন্ধকারে কেবল দুটি মানুষ।

আমি সেদিকে আলো ফেললাম, দেখতে পেলাম ওকে। ফিরে এসেছে তা'হলে! এরকিনচাচা শুয়ে আছে ফটকের কাছে আর মা ওকে ধাক্কা দিচ্ছেন, ডাকছেন, কাঁদছেন, হাসছেন। আর আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, জানি না কি ভাবব, ও ফিরে এসেছে — সেটা ভাল না খারাপ। আর এই ছাইয়ের আলোটায় কিছু বুঝতেই পারা যায় না ও বেঁচে আছে কি না।

এখন আর মনে নেই, কেমন করে মা একা কারুর সাহায্য ছাড়াই তুললেন ওকে, দাঁড় করলেন আর ঘর পর্যন্ত নিয়ে এলেন। তারপর ওকে শুইয়ে দেওয়ার পর ও যখন চোখ মেলল, মা ওর হাত, মুখ ঘষে দিতে লাগলেন শরীরে উত্তাপ ফিরিয়ে আনার জন্য আর চুমো দিতে লাগলেন।

আমি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম, তক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ব যাতে এসবকিছু দেখতে না হয় — না এরকিনচাচাকে, না মাকে।

এ সমস্তই কল্পনা, বললাম মনে মনে, এখুনি আমি এসব বার করেছি মাথা খাটিয়ে। এসবকিছুই ঘটে নি, চাচাও ফিরে আসে নি, মা ওকে চুমো দেয় নি; এমনি আমার মনে হয়েছে কারণ ঠাণ্ডা লেগে খুব অসুখে পড়েছি।

কেন যে আপনি ফিরে এলেন এরকিনচাচা? কেন? সবকিছুই ঠিক হয়ে গেছিল, আমারও প্রায় অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে আপনি নেই, আর বাবার অপেক্ষা করার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম যে বাবা ফিরে আসবে আর আবার সবকিছু আগের মত চলবে।

মা আপনাকে চুমো দিক! আপনাকে ভালবাসুক! যা ইচ্ছে হয় করুন যেমনভাবে চান থাকুন — আপনারা বড়। আমি কেবল ভান করব যেন কিছুই ঘটে নি, যেন আপনি চিরকালের মত চলে গেছেন আর ফিরে আসেন নি আর আমি একা কেবল বাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। অনেক অনেক দিন অপেক্ষা করব। বাবা এসে আমাকে সব বুঝিয়ে দেবে। হয়েছে, আমি আর পারি না। আমার বয়স তো মাত্র সাত বছর চার মাস...

১০

'বাবা!'

বাবা আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে, ঠোঁটটা কাটা বলে মুখের হাসিটা একটু অদ্ভুত, বয়স বেড়ে গেছে যেন, চোখগুলি ক্লান্ত। একটু দূরে মা দাঁড়িয়ে, মাও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'বাবা, বাবাগো!'

জানি যে আমার ঘুম ভেঙে গেছে, চোখ মেলেছি, তবুও বিশ্বাস করতে পারছি না — মনে হচ্ছে এমন ঘটতে পারে কেবল স্বপ্নেই।

'মেহ্দি!' বাবার গলার স্বর ভেসে এল যেন মাথার মধ্যেকার মেঘের মধ্যে থেকে; গলাটা আগের মত আর অত পরিষ্কার নেই আর ঠোঁটটা কাটা

হওয়ার ফলে কথাগুলো যেন শিস দিয়ে বেরিয়ে আছে। 'ওঠ, মেহ্দি, আমি এসেছি...'

'এসেছ ?' আমি তখনও ভাবছিলাম যে এটা স্বপ্ন।

'ওরে ছেলে... ওঠ তো !'

'উঠছি এখুনি... তুমি চলে যেও না যেন। কালেভদ্রে তোমার স্বপ্ন দেখি।'

'ও এখনও ঘুমোচ্ছে,' মা'র গলা শুনলাম। 'থাক্, ঘুমোক... ভোরবেলার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে কেবল।'

'হ্যাঁ, মা, আমি আর একটুখানি ঘুমোব। কালেভদ্রে স্বপ্নে দেখি তোমাকে আর বাবাকে। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা ফিরে এসেছে... তোমার ঠোঁটে কি হয়েছে বাবা ? আঘাত পেয়েছিলে ?'

'ও কিছু না, সব ঠিক আছে। চোখ খোল এবার, দেখ্,' বাবা আমাকে তুললেন, বসিয়ে দিলেন বিছানায়।

বাবা ! দাঁড়িয়ে আছেন আমার জীবন্ত, সত্যিকারের বাবা ! না, আমি তো ঘুমোচ্ছি না, আমি বাবার হাত ধরে আছি, এই তো হাতগুলো, তাকিয়ে আছি মুখের দিকে, ঠোঁটটা কেমন অদ্ভুত... ঠোঁটটা কেবল বাবার নয়...

'বাবা ! এসেছ !'

এসেছেন আমার প্রিয়, আমার আপন বাবা, এসেছেন যুদ্ধ থেকে ফিরে জীবন্ত, কেউ মেরে ফেলে নি। সত্যিই তো কল্পনা, ছলনা নয়, বাবা এসেছেন !

'অমনি করে না রে ছেলে, শক্ত হ', মনে আছে, বুরাতিনোর মত ?'

'আচ্ছা, আর একটুখানি, তারপরেই মনে জোর আনব... আমি তো কাঁদছি না। বাবা, কতদিন ধরে তোমার অপেক্ষা করেছি, ক্লান্ত হয়ে গেছি, বিশ্বাস করতাম না যে তুমি কোনদিনও ফিরে আসবে। এই তো তুমি ফিরে এলে আবার আমার কাছে... আর ঠোঁটটা, ঠোঁট... তোমার ঠোঁটের কি অবস্থা করেছে ?'

বাবা আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন; দাঁড়িয়ে রইলাম বাবার সামনে, তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আর রাগও হচ্ছে নিজের ওপর, আনন্দও হচ্ছিল, এদিকে বুঝতেও পারছিলাম না বাবার মুখে ওরা কি অবস্থা করেছে। চলে যখন গিয়েছিলেন কি সুন্দর ছিলেন, ফিরে এলেন একটু অন্য রকম হয়ে...

'তুমি কটা পদক পেয়েছ ? তুমি বীর হয়েছ তো ?'

'একটাই মাত্র পদক পেয়েছি, তাও আসার ঠিক আগেই।'

'কোথায় ? দেখাও !'

'এই তো...'

থলির ভেতর থেকে পদকটা বার করে বাবা আমার বুকে আটকে দিলেন।

'মা, দেখছ ! সত্যিকারের !.. মাকে এটা উপহার দাও।'

'আচ্ছা, বাবা। শুনছ, নোরা ?'

মা কি যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু কিছু না বলে আমার দিকে এগিয়ে এসে বাবার পদকটা ছুঁলেন...

'তুমি চলে যাবে ? তুমি আর চলে যেও না বাবা।'

'দু'সপ্তাহ বাদে আমাকে চলে যেতে হবে রে, বাবা... যুদ্ধ তো এখনও শেষ হয় নি...'

'আমি এত অপেক্ষা করেছি ! মাও অপেক্ষা করেছে ! সবাই অপেক্ষা করেছে ! আর তুমি, তুমি আবার চলে যাবে !'

'যুদ্ধ, বাবা।'

মা চুপ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা আমার কথার সমর্থন জানাতেও পারতেন। মা কেমন যেন অদ্ভুত। আগে বাবা কাজে যখন বাইরে যেতেন, তারপর ফিরে এলে মা খুশীতে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিতেন, এখন আর তা করছেন না। বোধহয় মা এর আগেই অনেক আনন্দ করে নিয়েছেন — বাবা তো এসেছেন সেই ভোরবেলা, যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম।

'বাবা, তোমার দেখা হয়েছে এরিকিনচাচার সঙ্গে ? মনে আছে তোমার, আমরা ওর কথা লিখতাম তোমায় ?'

'না, দেখা হয় নি এখনও। ও ঘুমোচ্ছে...'

'কেমন করে তুমি যুদ্ধ করতে ? মনে আছে সেই মজার কথা, কেমন করে তুমি গাছের ফাঁকে আটকে গিয়েছিলে ?'

'মনে আছে, নিশ্চয়ই।'

'তোমার গুলি ঠিক ঠিক গিয়ে লাগে ? গুলি করতে তোমার আর ভয় লাগে না ? যুদ্ধের কথা তুমি আমাদের লিখতে না কেন ?'

'যুদ্ধের কথা লেখা সম্ভব নয়, বাবা। এমন অনেক কিছু আছে যা লেখা যায় না।'

দু'সপ্তাহ, পনের দিন, পনের দিন বাবা আমাদের সঙ্গে থাকবেন !

'বাবা, বাবা ! তুমি সত্যিকারের জীবন্ত জেনারেলকে দেখেছ ? তারা খুব লম্বা, তোমার থেকে দ্বিগুণ লম্বা আর জোর গলা, রেডিওর মত তাই না ?'

'আমার জেনারেলের গলার স্বর পিনপিনে, মশার মত। আর লম্বায় তোর থেকে একটু বেশী।'

'এরকিন জেগেছে,' হঠাৎ বললেন মা...

•

দরজা খুলে ও চৌকাঠে হোঁচট খেল, লজ্জায় লাল হয়ে উঠল আর সোজা এগিয়ে গেল বাবার দিকে।

'এই যে, মাফ করবেন, ফ্রণ্ট থেকে ফিরে আসা সৈন্যদের মত বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে ফেলেছি। ফ্রণ্টের কি খবর ?' এরকিনচাচা তাড়াহুড়ো করে কথা বলছিল যেন ভয় পাচ্ছিল বাবাকে যা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিল তা ভুলে যাবে; যেন যা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিল, তা মুখস্থ করে নিয়েছে।

'মস্কোর বাইরে থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' বললেন বাবা।

ওরা দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে — বাবার ড্রেসিং গাউন পরা এরকিনচাচা, আনাড়িভাব, হাতদুটোকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না, আর বাবা চাচার থেকে একটু খাটো, বুদ্ধিমান সবকিছু-বুঝে-নিতে পারা চোখ, একেবারে ফ্রণ্ট থেকে গোলাগুলি আর মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। আর কাছেই মা দাঁড়িয়ে...

'এরকিনচাচা, বাবা পদক নিয়ে এসেছেন, সত্যিকারের,' বললাম আমি।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যেন ওদের, বড়দের প্রত্যেকেরই বুক থেকে ভারী পাথর নেমে গেল।

এরকিনচাচা আমার বুকে লাগানো পদকটায় সাবধানে হাত ছোঁয়াল, বলল:

'সত্যিকারের... বাবাকে নিয়ে গর্ব করা উচিত তোর।'

'মারাতেরও এমনি একটা পদক হলে হয় !'

'কোন মারাত রে, ছেলে ?' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন। 'যে আমার চিঠি নিয়ে আসে ?'

'হ্যাঁ, বাবা, তুমি ওকে দেখবে এখন।'

'ওকে বেশ ক'দিন দেখা যাচ্ছে না কেন জানি,' বললেন মা আর এরকিন-চাচা মা'র কথায় সায় দিল।

মজার লোক এই বড়রা, কি যে হল ওদের আজ ? সবাই আমায় নিয়ে পড়ল, একগাদা প্রশ্ন করছে, যেন নিজেদের মধ্যে বলার কোন কথা নেই।

'বাবাও আঘাত পেয়েছিল,' বললাম আমি এর্‌রকিনচাচাকে, 'দেখছেন ঠোঁটটা ? কেমন করে তোমায় সারিয়ে তুলেছে, বল বাবা।'

'সারায় নি তো। ঠোঁটটা ব্যাণ্ডেজ করে রেখেছিলাম, তাতেই সেরে গেল।'

'কি করে ব্যাণ্ডেজ করলে ? কি বলছ, জান ? যদি সেপটিক হয়ে যেত ?' বললেন মা।

'আর সেপটিক ! সবকিছু জাহান্নমে গেছে, এই যুদ্ধে সব রোগজীবাণু পুড়ে গেছে !'

'তা'হলেও সাবধান হওয়া উচিত ছিল,' বলল এর্‌রকিনচাচা।

'আপনার শরীর এখন কেমন ?'

'আগের থেকে ভাল, অনেক ভাল,' এর্‌রকিনচাচার বদলে মা বললেন। 'এবার ফিরে যাবার আয়োজন করছি।'

বাজে কথা বলছে ওরা বাবাকে, মোটেই ভাল নয়। এর্‌রকিনচাচার শরীর খারাপ, আমি যে দেখছি। প্রায় ওর এমন জ্বর ওঠে যে মাকে 'ইমারজেন্সি' ডাকতে হয়, কারণ ভয়ের চোটে মা আর কিছু করতে পারেন না। ও বোধহয় আর কখনই যুদ্ধে ফিরে যেতে পারবে না। এ সম্বন্ধে মা আর কিছু বলেন না মোটেই... এর্‌রকিনচাচা নিজেও আর যুদ্ধের কথা মনে করে না...

বাবার আর তর সইছিল না রাস্তায় বেরোবার জন্য, একটুখানি একা হবার জন্য। আমি যতই বলি না কেন কিছুতেই আমাকে নিতে চাইছিলেন না।

কি মজা ! হার মানলেন শেষে, বললেন:

'জামাকাপড় পরে নে।'

আমি বাবাকে বললাম:

'আমি যাব যদি তুমি পদকটা লাগাও বুকে।'

বাবা ভেবে ভেবে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের বুকে আটকে নিলেন পদকটা। বেরোলাম আমরা। অনেকদিন আগের মত হাত ধরে চললাম, বাবা বড় বড় পা ফেলে চলছিলেন, আমার দু'বার পা ফেলার মত, আমাকে ছুটতে হচ্ছিল বাবার সঙ্গে সমান তালে চলার জন্য।

এমনই কপাল, রাস্তায় কেউ নেই। বাবার পদকটা কেউ দেখতে পেল না, ছেলেদের কেউ ঈর্ষা করল না আমায়।

আর দেখবি তো দেখ মদিনা হাজির। সারাদিন বোধহয় ফটকের ফুটোয় চোখ রেখে বসে থাকে, যাতে রাস্তা দিয়ে কে যায় না যায় সবাইকে সে দেখতে

পায়, কেউ যেন বাদ না পড়ে। সেখান থেকেই বাবাকেও দেখতে পেয়েছে তাই ছুটে বেরিয়ে এসেছে বাবার কাছে।

'এই যে, ইঞ্জিনিয়ার! এসেছেন! আল্লাহ্‌র রহমতে আপনি বেঁচে আছেন, সুস্থ আছেন... আপনাকে ছাড়া আমরা এদিকে অন্ধপ্রায়, কতকগুলো দুর্বোধ ঘটনায় আমরা অন্ধ হয়ে গেছি...'

বাবা থেমে একটু ধূর্ত হাসি হাসলেন:

'কি আপনাদের কাছে দুর্বোধ?'

'কি করে সেসব বলি আপনাকে!' মদিনা আমার বাবার চারপাশে ঘুরছিল, একবার আমাদের বাঁদিকে, একবার ডানদিকে থামছিল।

'থামবেন তো নাকি! আপনার হল কি?'

'ইঞ্জিনিয়ার, আমি গুজবে কান দিই না, আমি হলাম গিয়ে ধীরস্থির মানুষ। আমি এমনকি ডাক্তার নোরার জন্য গোটা পাড়ার সঙ্গে ঝগড়া করেছি... লোকে বলে যে ও...'

সাবাস বাবা, মুখচোখের একটুও পরিবর্তন হল না বাবার, কেবল তাঁর হাতটা একটু কেঁপে উঠে, বললেন:

'আপনি জানেন, মদিনা, সেই ঘোড়াটার গল্প, যেটা বিনা কারণেই সবাইকে চাঁট মারত, চাঁট মারা ও বন্ধ করল না যতক্ষণে না ওর পাটা কেটে দেওয়া হল? জানেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'এসব মিথ্যা। তাই আপনার এত সক্রিয় সাহায্যের জন্য কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

মদিনা হাঁ হয়ে ছাগলের মত আস্তে করে ব্যা ব্যা করতে লাগল।

'কি বলছেন ইঞ্জিনিয়ার... ঠিক আছে... আমি এমনি, আপনাদের পরিবারের প্রতি বন্ধুত্বের জন্য,' তারপর হঠাৎ নিজের ফটকের দিকে দৌড় লাগাল। 'তুই পুরুষমানুষ নস্, কাপুরুষ! তোর বউ নষ্টামি করছে আর তুই হাসছিস।'

বাবাও রেগে গিয়ে চীৎকার করে বললেন:

'মদিনা, আমাকে রাগিয়ে দেবেন না!'

চলেছেন বাবা, তাঁর হাতটা কাঁপছে যেন ম্যালেরিয়া হয়েছে বাবার আর সমানে গালিগালাজ করছেন, 'চুলোয় যাক! চুলোয় যাক!'

অজানা সব রাস্তা দিয়ে আমরা চলতে থাকলাম, যেখানে আমি আগে

কখনও যাই নি; হাঁটতে হাঁটতে আমরা কি করে কি জানি এসে পড়লাম কেল্লাটার কাছে, যেখানে শহরের শেষ। সাদা, সম্পূর্ণ সাদা চলাপথটা দিয়ে আমরা কোনরকমে ওপরে উঠতে লাগলাম। বাবা উঠছিলেন, আমার হাত ধরে টেনে তুলছিলেন, সমানে শিস দিচ্ছিলেন কিন্তু কোন কথা বলছিলেন না। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমরা ঐ কেল্লাটার ওপর কি করব।

ওপরে পেঁাছে ভয়ে আমার হাঁটু খুলে এল একেবারে, বসে পড়লাম আমি। আর বাবা দাঁড়িয়ে নীচে শহর দেখতে লাগলেন, যেখানে সেখানে রেখে দেওয়া শতখানেক মাটির চৌকোণা টুকরো যেন কোন বাচ্চা ঐ চৌকোণা টুকরোগুলি নিয়ে খেলছিল, তারপর ওকে কেউ ভয় দেখিয়েছে, তাই ও ওগুলো সব ফেলে পালিয়েছে। তারপর আর ফিরে আসে নি সেগুলো সমান সারিতে সাজাবে বলে।

বাবা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন সেইদিকে, যেদিকে ছিল মাঠ, অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে জমিটা যেখানে আছে শহর, বন, নদী, যেখানে যুদ্ধ চলছিল।

কি দেখছিলেন তিনি ওদিকে? কি ভাবছিলেন? হয়ত বাবা তাই দেখছিলেন, যা আমি দেখি বছর দশেক বাদে যখন আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ দুঃসহ মুহূর্তগুলিতে এখানে আসতাম, এই কেল্লায়, তাকিয়ে থাকতাম দূরে, ঐ দিকে, যেখানে বিশাল প্রান্তর, অনেক রৌদ্র আর বাতাস; ঐখানে আমার ইচ্ছা হত যেতে, কোন কিছুর চিন্তা না করে কেবল হাঁটতে, কখনও না থেমে হেঁটেই চলতে, কারণ আমার মনে হত ওখানে মানুষ এত স্বাধীন, মুক্ত যে, সহজেই সে পরিণত হতে পারে গাছ বা পাখী, বা মেঘে — যা কিছু পরিচ্ছন্ন অকপট, তাতে।

বাবা বোধহয় এখন সেই কথা ভাবছিলেন যা আমি ভাবব বছর দশেক বাদে? হয়ত...

তারপর হঠাৎ বাবা বললেন:

'চল নীচে! তাড়াতাড়ি!'

সবকিছু শিস দিয়ে পেছনে ছুটে যাচ্ছিল, সবকিছু ধাওয়া করছে আমাদের।

'চমৎকার!' বললেন বাবা নীচে নেমে এসে। 'এবার সব ঠিক আছে।'

তারপর বাবা আমাকে নিয়ে এলেন বিশ্রী, ন্যাড়া একটা পার্কে। একটা পুরোন বেঞ্চির ওপর বসে রইলাম আমরা, চুপ করে কোন কথা না বলে বসেই

রইলাম; তারপর আমি কি যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম বাবাকে, বাবা উত্তর দিচ্ছিলেন না, শুনছিলেন না, খালি মাঝেমাঝে মাথা তুলে আমার দিকে দেখছিলেন, উত্তরে একটু হাসছিলেন আর চুপ করে থাকছিলেন।

তারপর আমরা যখন পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, বাবা আবার বললেন:

'এবার সব ঠিক হয়ে গেছে! সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আমরা আবার অজানা সব রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম, প্রায় প্রতিটি গাছের কাছেই আমরা থামছিলাম, বাবা গাছগুলির মগডালের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন তো ভাবছিলেন...

'বাবা তোমার কি হয়েছে?'

বাবা কিন্তু শুনছিলেন না যেন আমার কোন অস্তিত্বই নেই।

বাবাকে জ্বালাতন করতে লাগলাম আমি:

'বাড়ী চল বাবা। কেমন যেন দুর্বোধ তুমি আজ।'

'হ্যাঁ।' বাবা বললেন।

'কেন?'

'কেন, কেন!' বাবা রাগাবার জন্য বললেন।

'আমি যখন কোন কিছু বুঝতে পারি না, আমি তা জানি।'

'সুখী ছেলে।'

'তুমি কি দুঃখী নাকি?'

'যত্ত সব! চল বাড়ী! লেফ্‌ট, রাইট, লেফ্‌ট!'

'মা! মাগো! আমি তোমাকে বলেছিলাম না যে বাবা এসে তোমার সঙ্গে অমনি করার শোধ নেবে। আজ যদি তুমি দেখতে মদিনা কেমন দৌড় দিল!'

এরিকিনচাচা আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকল। চেয়ারে বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কি ম্লান চেহারা! কি হয়েছে ওর? আবার খারাপ হয়েছে নাকি শরীরটা? আর মা'র চোখগুলিই বা অমন কেন? কাঁদছিল নাকি?

'কোথায় গিয়েছিলি তোরা?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেল্লায়। তারপর আমায় বাবা অনেক নতুন নতুন রাস্তায় নিয়ে গেছে যেখানে আমি আগে কখনও যাই নি।'

এরিকিনচাচা উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল।

‘আর ?’ জিজ্ঞাসা করলেন মা।

‘আর ? আর বাবা বালির ওপর অদ্ভুত সব চিহ্ন আঁকছিল। ভুলে গেছি, আর কোথায় গিয়েছি আমরা।’

বাবা হাত ধুয়ে যেখানে আমরা বসেছিলাম সেখানে এসে ঢুকলেন।

‘তুই, নিশ্চয়ই, সবকিছু বলেছিস এরিমধ্যে ?’ আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললেন বাবা।

‘তোমাদের খিদে পেয়েছে ?’ জিজ্ঞাসা করলেন মা।

‘দারুণ !’ খুশীর সুরে বললেন বাবা, ‘এমন টাটকা বাতাস...’

মা রান্নাঘরে চলে গেলেন আর কয়েক মিনিট আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। আমি অপেক্ষা করে রইলাম... হঠাৎ এরিকিনচাচা প্রথম কথা বলে উঠল:

‘আমি... খুব চাই যে আপনার চলে যাওয়ার সময় যেন আমি সেরে উঠি। তাহলে আমরা একসঙ্গেই যেতে পারি।’

‘আপনার ভাগ্য ভাল যে তিনমাসের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পেরেছেন,’ বললেন বাবা। ‘যাবেন, যখন পারবেন।’

‘হ্যাঁ, আমার ভাগ্য ভাল...’

‘আমাদের ডাক্তার কি বলছে ?’

‘আমাদের ডাক্তার বলে: শীগ্‌গির। কিন্তু সবকিছু এমন অনির্দিষ্ট। এটাই বিরক্তিকর।’

‘আরে, ও কিছু না।’

‘কিন্তু আমি তো পঙ্গু নই!’

‘আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য হল সাহস।’

‘ধন্যবাদ।’.

মা ঘরে ঢুকলেন আস্তে করে। দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়ে শুনলেন খানিক, তারপর খাবার সাজাতে লাগলেন। শুকনো ফল, খরমুজ আর রুটি — সব ঠিক তেমনি যেমন ছিল বহুদিন আগে যখন বাবা যুদ্ধে যান নি।

‘আমি তোমায় সাহায্য করব,’ বললেন বাবা, ‘আর কি লাগবে ? ছুরি, থালা। আগের সেই জায়গাতেই আছে ?’

‘হ্যাঁ, সেখানেই আছে।’

বাবা রান্নাঘরে গিয়ে নিয়ে এলেন সবকিছু আর আগের মত রুটি কাটতে, থালা সাজাতে লাগলেন।

'খাসা খরমুজ!' বললেন বাবা, সেটাকে লোফালুফি করতে করতে।

সবাই বসল আর বাবা যথারীতি খরমুজটাকে কাটার আগে টেবিলে গড়াতে লাগলেন।

খেতে বসে বড়রা আবারও চুপ করে রইল।

তারপর মা রান্নাঘরে গেল বাসন ধুতে; বাবা যথারীতি মাকে সাহায্য করতে চাইলেন, কিন্তু মা রাজী হলেন না। আবার আমরা তিনজন রইলাম ঘরে — আমি, বাবা আর এরকিনচাচা।

চাচা বাবার দিকে তাকিয়েছিল সরলদৃষ্টিতে, বাবাও ওর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করছিলেন, এতে আমি খুশী। ওরা, ওই বড়রা পরস্পরের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই ভাব হয়ে যাবে ওদের। আর মা এখন ভীষণ উদ্বিগ্ন, মা আবার প্রকৃতিস্থ হবে, আমরা চারজনে একসঙ্গে থাকব — আমি, মা, বাবা, এরকিনচাচা — স্বাভাবিকভাবে ভালভাবে থাকব। শীগ্‌গির করে যেন আসে সেই দিনটা!

তারপর আমরা অনেকক্ষণ ধরে ঠিক করতে লাগলাম, কে কোথায় শোবে। ঠিক হল — মা ঘুমোবেন আমার ঘরে, বাবা আর আমি বড় ঘরটায়। এক বিছানায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শোব, শীত করবে না আমাদের। রাতে বাবার গায়ের থেকে যাতে কম্বলটা সরে না যায় তা দেখব, আমি প্রথমে ঠাণ্ডা বিছানায় শোব, তারপর যখন বিছানাটা গরম হয়ে উঠবে, তখন বাবা শোবেন আমার কাছে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা শুয়ে শুয়ে দেখব, কেমন করে ঘরের ছাতে ছায়াগুলি লাফাচ্ছে, আর মা বা এরকিনচাচার যাতে ঘুম না ভেঙে যায় সেজন্য নীচুস্বরে অনেকরকম গল্প বানাব। আর বাবা আমায় যুদ্ধের গল্প বলবেন।

সকালবেলায় উঠে স্বপ্নে আমি যা দেখেছি তা' বলব বাবাকে। যদি সাপের স্বপ্ন দেখি তো বিষ্টি হবে, যদি টাকাপয়সা দেখি তা'হলে আমার দাঁত ব্যথা করবে আর যদি মরা ফারহাদমামাকে দেখি, তাহলে জানি না কি হবে।

বাবা বললেন:

'আজ আমি তোকে কোন গল্প বলব না, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এত পথ এসে। আর কাল পরশু গোটা পনেরটা দিনই নিশ্চয়ই বলব।'

বাবা বলল: ঘুমো, কিন্তু নিজে ঘুমোচ্ছিলেন না। আড়চোখে তাকিয়ে ছিলাম বাবার দিকে, খুব ঘন ঘন চোখের পলক পড়ছিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন বাবা আর যখন দেখলেন যে আমি ঘুমোচ্ছি না রেগে গেলেন:

'ঘুমো এবার!'

'তুমি আমার কাঁধের ওপর হাতটা রাখ, তা'হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ব।'

মিনিট দুয়েক আমি ভান করে পড়ে রইলাম, তারপর ধৈর্য ফুরিয়ে গেল:

'বাবা, এরকিনচাচাকে তোমার ভাল লেগেছে? ও খুব চমৎকার, তাই না?'

'আমি ঘুমোচ্ছি।'

ঘুমোচ্ছিলেন না কিন্তু, আমি দেখেছি।

'তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?'

বাবা যেন শুনতে পাচ্ছেন না।

'কেমন চমৎকার বেড়ালাম আমরা! কাল আমরা সবাই একসঙ্গে যাব, কেমন? মা, এরকিনচাচাও।'

আমি আরও কি-সব যেন বলেই চলেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম ঘুমোব না, বাবার দিকে তাকিয়ে থাকব, কারণ বাবাও ঘুমোচ্ছিলেন না।

আর সকালবেলায় সবকিছু যেন ভালভাবে শেষ হওয়া গল্পের মতন। বাবা আমার গায়ের থেকে কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন:

'দাদুর বাড়ী যাব রে ছেলে, তৈরী হ! দেখছিস, আমি প্রায় তৈরী!'

'এক্ষুণি, বাবা।'

জানলা দিয়ে মাকে দেখতে পেলাম উঠোনে।

'মা, মা! শুনছ, আমরা দাদুর কাছে যাচ্ছি!'

মা দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালেন বাবার দিকে, আমার দিকে...

'তোমাকে ছাড়া আমাদের ভাল লাগবে না মা। চাচাকেও আমরা নেব।'

'চাচার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে,' বললেন মা। তারপর আবার বললেন, 'গ্রীষ্মকালে আমরা সবাই একসঙ্গে যাব, যখন চাচা সেরে উঠবে।'

'তুমি যাবে না?'

'ঠিক, মেহ্দি, চাচার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।' বাবা সমর্থন জানালেন মাকে।

আমিও ভেবে দেখলাম যে চাচার না যাওয়াই ভাল, আর আমরা গ্রীষ্মকালে সবাই একসঙ্গে যাব গ্রামে, মাও নিশ্চয়ই যাবেন।

শীতকালে গাছে উঠে আপেল, খুবানি পাড়া যায় না, নদীতে চান করা যায় না, ঘাসের ওপর ছুটোছুটি লাফালাফি করা যায় না। শীতকালে উষ্ণ চুলার কাছে পা রেখে বসে থাকতে হয় বাড়ীতে আর শুকনো ফল, শুকনো রুটি খেতে হয়...

প্রথমে আমি দাদুর ওপর একটু রাগ দেখালাম সেবার অমন অদ্ভুতভাবে চলে যাওয়ার জন্য। উত্তর দিচ্ছিলাম কেবল 'হ্যাঁ', 'না'। বাবাও কেবল 'হ্যাঁ', 'না' করছিলেন, আর বলছিলেন 'স্বাভাবিক', 'সম্ভব'। আমারা — আমি, বাবা আর দাদু তিনজনই কেমন যেন অপরিচিত মনে হচ্ছিল পরস্পরের কাছে।

তিনদিনের দিন দাদু পোলাও রান্না করলেন, খুব সুন্দর পোলাও রান্না করতে পারতেন দাদু, আর আমরা উষ্ণ চুলাকে ঘিরে বসে আলোচনা করছিলাম তুলোচাষ, খরমুজ, শীতকাল সম্বন্ধে আর তারপর, আমার এখন আর মনে নেই, দাদু না বাবা, কে যেন মা'র কথা তুললেন।

'তুই আমায় কি শোনাচ্ছিস ?' দাদু বললেন। 'তুই যখন ফ্রন্টে চলে গেলি, নোরা ঘোষণা করল: আগের মত করে আর বাঁচতে চাই না।'

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, খাওয়া থেমে গেছে সবার। তারপর বাবা বললেন:

'ওর সম্বন্ধে আমরা কিই বা জানতাম! হাসিখুশী, নরমমন, আদুরে, মেহ্দিকে আর আমাকে ভালবাসে, ব্যাস।'

'বেশী কি আর দরকার ছিল ওর ?'

'ও নিজেও হয়ত ভাবত যে এই-ই ওর সব। হয়ত বা নয়। হয়ত ওর সবসময়ই মনে হত, ও আরও বড় কিছু করতে পারে।'

'ওর ভাগ্যকে দোষ দেওয়ার কোন কারণই ছিল না!'

মনে হল বাবা যেন দাদুর কথা শুনছিলেন না। খুব আস্তে কথা বললেন বাবা যেন নিজেকেই বলছেন:

'কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি নি আর চাই নি...'

দাদু কি যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু বললেন না। তারপর আমায় বললেন:

'যা মেহ্দি খেলা কর গিয়ে।'

'থাক ও,' বাবা প্রতিবাদ করলেন। 'প্রশ্ন ওকে নিয়েও। আমাদের

ছেলেকে অনেক কিছু বুঝতে হবে... হঠাৎ দেখা গেল যে এমন কেউ আছে যার কাছে নোরা খেলনা নয়, আমোদপ্রমোদ নয়, তার কাছে সে জীবন। হ্যাঁ, জীবন। সে হয়ে পড়ল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর যা সবকিছু সে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত, তা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এখন নোরা সম্পূর্ণ অন্য লোক — সাহসী, শক্তিশালী। জান বাবা, ও এরকিনকে ভালবাসে কারণ এরকিনের কাছে ওর প্রয়োজন আছে। জান, ওর কাছে সেই জন প্রিয়, যে ওর মধ্যে এই পরিবর্তন এনেছে...'

'আর তোমাদের কি হবে ? তুই ? মেহ্দি ?'

'মেহ্দির আর আমারও নোরাকে খুব প্রয়োজন...'

'বাবা !' বাধা দিলাম বাবাকে। বাবাকে এই প্রথম এমন বিষণ্ণ দেখলাম, ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল আমার।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম আর জমেযাওয়া ঠাণ্ডা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকলাম; তুক-তুক আওয়াজ উঠল আমার জুতো জমেযাওয়া মাটিতে ঠোকা লেগে, মনে হচ্ছিল যেন ওটা কার গলার স্বর, যেন আমি কারুর সঙ্গে কথা বলছি।

ভাবছিলাম, এসব আমি দেখেছি, অনেকদিন আগেই লক্ষ্য করেছি যে মা বদলে গেছেন। কিন্তু আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না, জানতাম না, এ ভাল না খারাপ। বাবা বললেন: মা'র মনের জোর বেড়েছে, সাহসী হয়ে উঠেছেন তিনি। আমরা কিন্তু তা লক্ষ্য করি নি। মা খুব চাইতেন সাহসী হতে, আত্মনির্ভরশীল হতে, যাতে সবকিছু নিজে করতে পারেন। জানি না তা ভাল কি না, আমার ভয় হচ্ছিল যখন মা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে, তখন কি করব মাকে নিয়ে ? কিন্তু বাবা বললেন: এ ভালই ! এখন আমাদের সবাই সাহসী আর শক্তিশালী — বাবা আর মাও। আর আমাকেও এমনি হতে হবে ওদের মতই, ছিঁচকাঁদুনে খোকন হয়ে থাকলে চলবে না। আমিও ওদের মতই হয়ে উঠব, সাহসী আর শক্তিশালী আর কিছু একটা করব, কারুর চিকিৎসা করব আর যখন সারিয়ে তুলব, বাবা বলবে: এখন মেহ্দিও বদলে গেছে...

...পরের দিন আমরা তিনজন — আমি, বাবা, আর দাদু একসঙ্গে শহরে মা'র কাছে ফিরে এলাম।

এই হল, মারাত, পুরো কাহিনী, যুদ্ধ চলছিল অনেক অনেক দিন ধরে, কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না।

তুই আর আমি, মারাত, আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরে কালো ভয়ংকর কাগজ দিয়ে আসতে লাগলাম, আবার বাবার মজার মজার চিঠির অপেক্ষা করতে আর দিন গুণতে লাগলাম কবে বাবা ফিরে আসবেন।

আর কেবল আমরাই না — সবাই যুদ্ধ থেকে আপনজনেদের ফিরে আসার অপেক্ষা করছিল আর আশা করছিল... কেবল ওর অপেক্ষায় কেউ ছিল না, আমাদের এরাকিনচাচার; ওই কেবল নিজের বাড়ী আর খুঁজে পেল না, যদিও মা ওকে সারিয়ে তোলার জন্য খুব চেষ্টা করেছেন। বাবা আবার যুদ্ধে চলে যাবার কয়েকদিন পরেই ও আর রইল না আমাদের মধ্যে।

আর যদিও এখন সেই দিনগুলি আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, তবুও মাঝে মাঝে মা'র মন খারাপ হয়ে যায়, কাঁদেন খানিক; বাবা তখন মা'র প্রতি আরও বেশী স্নেহশীল, মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

আলোকপাতের
মুহূর্তে

তার দিন শেষ হয়ে আসছে... মঙ্গোলদের ঘোড়াগুলো ইতিমধ্যেই টাটকা পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছে, ক্লান্ত কোণঠাসা হয়ে পড়া ঘোড়ার গন্ধ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ঘড়ঘড় করে উঠল। মরুভূমিতে হারিয়ে যেতে যেতে দলটা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল। কোন দল চলে গেছে রাতের বেলায় কিছু জানতে না দিয়েই, আর কোন কোন দল — তার মুখের ওপরই সোজাসুজি অভিযুক্ত করে তাকে শঠতা আর স্বার্থপরতার জন্য। সেই সমস্ত এলাকাগুলি যাদের ভয় ছিল মঙ্গোল আক্রমণের, জালালুদ্দিনের একত্রিত হওয়ার প্রার্থনায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা, কিন্তু যেই সে পিছন ফিরেছে অমনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তার সৈন্যদলে বিভিন্ন উপজাতির লোকেদের — কাংলুক, গুরেত্স, কুর্দ আর তুর্কমেনীয় — মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে, যেহেতু এখন তারা তুরান থেকে ইরাক পর্যন্ত আর জাইহুন* থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত তার দেশের মাটিকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করছে না। প্রায়ই সে দেখেছে তাদের অনুসরণকারী মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে সফল লড়াইয়ের পরে তার আমীররা কেমন গিল্টি করা তলোয়ারের জন্য নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করছে আর সে বিমর্ষ হয়ে বসে বসে গোঁফের প্রান্ত কামড়াচ্ছে, ওদের ঝগড়া থামাতে পারে নি — কারণ যদি তুর্কমেনীয়দের পক্ষ নেয় তো সকালবেলায় দেখা যাবে গুরেত্সদের তাঁবু ফাঁকা, তাঁবুর সামনে জ্বলা আগুন নিভে গেছে, আর যদি দুপক্ষকেই তিরস্কার করে, শাস্তি দেয়, তাহলে দু'দলকেই হারাতে হবে...

আগের সেই একাগ্রতা আর অনুভব করছে না সে, সবকিছুই যেন তার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। তার সুস্থ চিন্তাশক্তি, লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে। দীর্ঘ

---

* জাইহুন — ত্রয়োদশ শতকে আমু-দরিয়া নদীর নাম। — সম্পাঃ

এগার বছর ধরে সে মঙ্গোলদের প্রতিরোধ করে আসছে — মঙ্গোলদের পথে পড়া অন্য যে কোন শাসকের থেকে বেশী — তার শৌর্য এমন কি স্বয়ং শত্রু — চেঙ্গিজ খানও লক্ষ্য না করে পারে নি, কিন্তু এখন সে আর কিছু ভাবতে পারছে না, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফেলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার অনিশ্চয়তা। যে কখনও কোন প্রতিবাদ সহ্য করে নি, যা কিছুই করেছে সবই কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসারে, এখন সে উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেই কয়েকজন আমীরের মুখের দিকে, যারা এখনও তার বিশ্বস্ত আর তারা যা বলছে তাই করছে। তারা তাকে অত্যন্ত কৌশলে কাজে লাগাচ্ছে: এক-দল — নিজে বড়লোক হবার জন্য, অন্যদল — অপমানের শোধ নেবার জন্য...

সকালবেলায়ই সে স্থির করেছে যে ইসফাখান যাবে যেখানে পাহাড়ী নদীর ঠাণ্ডা জলের কাছে গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়া সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে পারবে। আর সেও এই ক্ষেপার মত পালিয়ে বেড়ান থেকে এক মুহূর্ত বাঁচবে, একাকী হয়ে চিন্তাভাবনাগুলোকে একটু গুছিয়ে নেবে, চারপাশে তাকিয়ে দেখবে যাতে যারা তার কাছে রয়ে গেছে তাদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখা যায় আর বোঝার চেষ্টা করবে, তাদের থেকে আর কি পাওয়া যাবে, কি আশা করা যায়।

ছেলেবেলা থেকেই তার ভাল লাগত ইসফাখান। বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে এই শহরে যদি সে সাফল্য লাভ করতে না পারে তাহলে অন্তত স্বস্তি আশা করতে পারে, মঙ্গোলরা এদিকে আসার রাস্তা সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পাবে না পথে পাহাড়শ্রেণী থাকার জন্য।

তাই চলল সে... বিসুতুন পাহাড়ের পাশ দিয়ে, যেখান থেকে খুলোয়ার নদী নেমে এসেছে সেই গিরিপথ দিয়ে।

দুপুরবেলায় আমিদের মালিক মাসুদ তাকে রাজী করাল ঘোড়া ঘুরিয়ে আল-রুমে যেতে। মাসুদ ছিল তোষামুদে আর বাকপটু। বলল, সুলতানের হতাশ হবার কিছু নেই, যে বিরাট ঘটনা তাঁর ভাগ্যে লেখা আছে তা এখনও তাঁর সামনে। কোন দুর্গম জায়গায় পেঁছে শক্ত হয়ে গেড়ে বসে আবার বিশ্বস্ত লোকদের একত্র করতে হবে। এমন জায়গা হল এশিয়ামাইনরের বন্যা আর অনাবৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে পড়া আল-রুম অঞ্চল, যাকে দখল করতে বিশেষ কষ্ট হবে না। মুসলমান আমীররা যেই তাঁকে দেখবে সিংহাসনে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার পতাকাতলে এসে সম্মিলিত হবে। প্রথমেই বশ্যতা স্বীকার

করতে ছুটে আসবে কিপচাকরা*। মাসুদ নিজে চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আজই জালালুদ্দিনের কাছে আসতে আর শেষদিন পর্যন্ত তার সেবা করতে প্রস্তুত।

এমনি সব কথা বলছিল মাসুদ, আর জালালুদ্দিনও জানত প্রতারক কোন দিকে হেলছে। জানত যে মাসুদ এখন মঙ্গোলদের কথা মোটেই চিন্তা করছে না, এখন তার একটাইমাত্র চিন্তা কি করে সুলতানের মন বিষিয়ে দেওয়া যায় তার অপমানকারীর বিরুদ্ধে, যে গতবছর দুর্গ আক্রমণ করে তার একজন স্ত্রীকে লুঠ করে নিয়ে গেছে।

অন্য পরিস্থিতিতে হলে জালালুদ্দিন হয়ত ক্ষেপে উঠত, ঘোড়া থেকে না নেমেই মাসুদের পেটে এক লাথি মারত, কিন্তু এখন তার তিক্ততা, অপমানের কোন অনুভূতি ছিল না, সহজেই, শীঘ্র রাজী হয়ে গেল সে। মাথার মধ্যে খেলে গেল কেবল একটা দুর্বল চিন্তাধারা: 'হয়ত এই দরকার ? এটাই হবে বুদ্ধির কাজ ?' মাসুদের দিকে তাকাল সে গোপন মিনতি আর নাবলা প্রশ্ন নিয়ে: 'আমি তোর প্রতারণা গলাধঃকরণ করলাম... তার পরে কি ? তুই যে খেলা আরম্ভ করেছিস তার কি এখানেই শেষ হবে ? এরপর তুই বিশ্বাসঘাতকতার দিকে এগিয়ে যাবি নাকি ?' সবার সঙ্গেই এমনি — নির্ভর করতে চাইত কারুর উপর, সাহায্য চাইত কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারত না কাউকে, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে দুলত একেবারে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না দিশাহারা হয়ে পড়ত। এমনকি এখনও তার এই আঠাশ বছর বয়সে জালালুদ্দিন পুরোপুরি মুক্তি পায় নি সেই সং-বেদনশীলতা, অভিমান থেকে, যা শাসকের পক্ষে আর সেনানায়কের পক্ষে সমান কণ্টকর।

রাত্রিবেলায় তারা আমিদের কাছে এসে পৌঁছাল, কিন্তু শহরের মধ্যে ঢুকল না, নদীর এপাশে তাঁবু খাটাল সেতুর অনতিদূরে, যাতে মঙ্গোলরা এসে পড়লে তাড়াতাড়ি ওপাশে চলে যেতে পারে। কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে মঙ্গোলদের পাহাড়ী পথে অনভ্যস্ত ঘোড়াগুলি এখানেও তাদের ধাওয়া করবে, কিন্তু তাহলেও মাসুদ আদেশ দিল, শহরের ফটক রাত্রে বন্ধ করা হবে না।

সুলতান মাসুদের সঙ্গে মদ্যপান করছিল, মত্ত অবস্থায় হঠাৎ কেমন ব্যাঙ্গাত্মক হয়ে উঠল আর মুখ ভঙ্গী করতে লাগল, যেন প্রচণ্ড বিপদ, ভবিষ্যৎ

---

* কিপচাক — তুর্কী বংশোদ্ভূত অসংখ্য যাযাবর জনগোষ্ঠী। — সম্পাঃ

সম্বন্ধে ভয়ংকর অনুভূতি — সর্বাকিছু উধাও হয়ে গেল আর সে নিজে তার শাসকের পদ, সমস্ত ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, আল-রুম, সূর্যালোকিত এই জায়গা কোন কিছুর পরোয়া করে না; কেমন অদ্ভুতভাবে হাসছিল সে, যেন ব্যথায় মুখ বেঁকে যাচ্ছিল, আর সমানে চোখ টিপছিল উর-খানের দিকে তাকিয়ে — তার একমাত্র আমীর যে এখনও তার বিশ্বস্ত। সে মুখভঙ্গী করছিল যেন ইচ্ছা করেই অপ্রীতিকর লজ্জার কোন কিছুকে ঢাকবার জন্য। তার এই ব্যবহার মাতালের মত নয় এ হল দূরদর্শী ও সুস্থমস্তিষ্ক জাদুকরের মত, যে হঠাৎ সর্বাকিছু বুঝতে পেরে চমকে উঠেছে...

মদের পাত্রটা মুখে তোলামাত্র বিষম খেল কিন্তু গিলে ফেলল মদটা এইভাবে গলার কাছে হঠাৎ উঠে আসা কান্না চাপল। বিশ্রী অনুভূতিটা তাড়াবার জন্য জালালুদ্দিন মাসুদকে ধাক্কা দিল।

'আরে, তোমার বউ — হা-হা-হা ?! ঐ যে যাকে লুঠ করেছে... ঐ যে আল-রুমের... ঠগ, লুঠেরা... কি নাম ওর ? কাফের...'

'মেয়েটার বয়স ষোল,' কেমন এক দুর্বোধ্য আত্মমর্যাদা নিয়ে বলল মাসুদ। 'বুখারার তারা...'

'চাঁদ,' হঠাৎ বিষণ্ণভাবে সুলতান তাকে শুধরে দিল। 'হায়, চাঁদ, চাঁদ...'

প্রায় মাঝরাতে তার তাঁবুর মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটি মেয়েকে। মেয়েটি তার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে দেখল দরজা পেরিয়ে ঢোকার সময়; সাধারণ, অমার্জিত, ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল যেন সর্বাকিছুর প্রতিই সে উদাসীন। একে ধরে আনা হয়েছে একটু দূর থেকে, যখন ও পথহারান ভেড়াকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

তার নোংরা খালি পায়ের দিকে তাকিয়ে জালালুদ্দিন বিরক্তিতে মুখ কোঁচকাল; সে মেয়েটির দিকে মদের পাত্র এগিয়ে ধরল কিন্তু বুঝতে পারল না কিভাবে কথা বললে ঠিক হবে — ব্যাঙ্গের সুরে নাকি কঠোর সুরে।

এখন প্রতি রাত্রেই আশপাশের গ্রাম থেকে মেয়েদের ধরে আনা হয় তার জন্য, আর তারা যতই ওপরে ফাঁকা পাহাড়ী এলাকায় উঠছে ততই বেশী করে পাওয়া যাচ্ছে এমনি অমার্জিত চেহারা, নিরীহ মেয়েদের, যারা তার কাছ থেকে চলে যাবার সময় কিছুই আন্দাজ করতে পারে না কার বন্দী হয়েছিল অল্পক্ষণের জন্য।

সমস্ত কিছুতেই আত্মসংযমী উর-খান এই শেষের দিনগুলিতেই আত্মসংবরণ হারিয়ে ফেলেনি; সাধারণত মালিকের অমার্জিত আচার

আচরণে সে কোন বিরক্তি প্রকাশ করে না, কিন্তু আজ সবকিছুর সাক্ষী ধূর্ত, অবিশ্বাসী মাসুদ, তাই উর-খান আর সহ্য করতে পারল না:

'এই নোংরা মেয়েটির সঙ্গে রাত কাটান উচিত নয় মহামান্যের,' শুষ্কস্বরে বলে সে দেহরক্ষীদের ইঙ্গিত করল মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্য।

জালালুদ্দিন ভ্রূ কোঁচকাল, অপমানিত বোধ করল, মাথা নীচু করে, অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইল। তারপরে হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অতি সহজভাবে বলল সে, যেন তার একটুও আফসোস হচ্ছে না:

'আমি আমার সব স্ত্রীকে হারিয়েছি। আর সন্তানদেরও... ওদের গাড়ীটা যখন পিছিয়ে পড়ল...'

তারপর তার তাঁবুতে এক রাতের অতিথিকে নিয়ে আসা হল, যে নিজেকে ভবঘুরে পথিক বলে পরিচয় দিল, খুব তাড়াহুড়ো করছিল সে। সুলতান যেখানে দিনের বেলায় থেমেছিলেন খুলোয়ার গিরিপথের কাছে, ইসফাখান যাবার পথ থেকে সরে এসে অন্য পথ ধরার জন্য সেখানে পথিকটি দেখেছে মঙ্গোলদের, তার মানে তারা এক মুহূর্তও জালালুদ্দিনের পিছু ছাড়ে নি, তার পদচিহ্ন হারিয়ে ফেলে নি।

কিন্তু জালালুদ্দিনের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। গুমোট গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে সে, ঘুমে ঢুলে আসছে, আজকের রাতে তার আর কিছুই ইচ্ছা করছে না — উঠবার বা আবার পালাবার জন্য তৈরী হবার — এই রঙচঙা তাঁবুটা তাকে সবার কাছ থেকে কেবল লুকিয়ে ফেলুক, আড়াল করুক তাকে যাতে সে হাসির মধ্যে দিয়ে, নেশার ঘোরেও শুনতে পারে তার মনের মধ্যে এখন কি হচ্ছে। কি একটা অনির্দিষ্ট অজানা আশংকা, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বস্তি মুক্তিরও আভাস...

'বিশ্বাস করুন, সুলতান, আমি তুর্কমেনীয়, তুর্কমেনীয়রা আপনাকে কখনও মিথ্যা কথা বলে নি...'

'বলেছে,' আবদারের সুরে বলল জালালুদ্দিন আর দুর্বল হাতটা তুর্কমেনীয়র দিকে নাড়িয়ে চলে যেতে বলল তাকে। লক্ষ্য করল না যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কমেনীয়টির পিছনে পিছনেই বেরিয়ে গেল আমিদের মালিক মাসুদ।

আর যখন উর-খানের কুঁজো পিঠটা তাঁবুর দরজার পর্দাটা তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দিল তখন জালালুদ্দিন যেন কোন কিছু খুঁজছে এমনিভাবে দেখতে লাগল টেবিলে পড়ে থাকা পানীয়ের পাত্রগুলি, ট্রেতে পড়ে থাকা অল্প একটু বাদাম আর চিনি, সন্ধ্যাবেলায় নিজের সস্তা আচার

ব্যবহার আর মুখ ভেংচানোর কথা মনে পড়ে তিক্ত হাসি হাসল। হঠাৎ মনে পড়ল রাতে তার কাছে নিয়ে আসা মেয়েটির কথা, এমনকি শুধু মনেই পড়ল না, পরিষ্কার অনুভব করল যে মেয়েটির আত্মা যেন তাঁবুর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁবুতে ঝোলান গালিচাগুলোতে ধাক্কা খেতে খেতে বেরোবার পথ খুঁজছে।

আশ্চর্য, মেয়েটির দিকে ভাল করে দেখেও নি সে, মাতাল চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়েছিল তার খালি পায়ের দিকে, মুখের দিকে তাকায় নি ভাল করে, কেন এমন হল? যেন সে তাকে দেখে তার মুখের প্রতিটি খুঁটি-নাটি মনে করে রেখেছে। পাহাড়ী সূর্যের রোদে পোড়া মুখ, চোখে মিশে ছিল বশ্যতা আর বিস্ময়, নীচের মোটা ঠোঁটটা ঠেলে বেরিয়ে এসে ওপরের ঠোঁটটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে... এমন হাজার হাজার লোক তার সামনে দিয়ে চলে গেছে সব জায়গাতেই, সে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, কারুর দিকে ভাল করে তাকায় নি বা শোনে নি কারুর কথা আর হঠাৎ এখানে, এই পাহাড়ে এই মেয়েটি আলাদা করে কেমন যেন মনে রয়ে গেল। কেন? এর মানে কি? এতো আর কামনা, লালসা থেকে নয়। মেয়েটির প্রতি সে কোন কিছুই অনুভব করে নি, বিষণ্ণতা ছাড়া, তবে এই ছায়াটা...

কিছুদিন ধরে জালালুদ্দিন প্রায়ই ভাবে বহুদিনকার পুরোন এক তর্কের কথা, মনে করত কিন্তু ভাসাভাসা ভাবে, বিরক্তি আর সন্দেহ নিয়ে। অল্পবয়সে সে একবার পণ্ডিত শিক্ষক কুরবার সঙ্গে একগুঁয়ে তর্ক করেছিল, সাধারণ মামুলী ব্যাপারেও যার মতামত গুরুগঞ্জের লোকেরা সন্দেহাতীত ভাবে মেনে নিত, সেবার ঠাট্টার কথা না — তর্ক আরম্ভ হল সত্য নিয়ে। বিখ্যাত ফকির তখন বলেছিলেন যে মানুষ সত্য আবিষ্কার করতে পারে ঠিক বিদায়ের শেষ মুহূর্তে যখন সে তার শেষ সহালাপীর মুখোমুখি হয়। সেই আলাপের হয়ত কোনই অর্থ হয় না, হয়ত তা নিতান্তই আকস্মিক, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে জীবনের বিদায়ী অর্থ। এই আলোকপাতের মুহূর্তটিকে কুরবা বলেছিল মুক্তির ছোট্ট নিঃশ্বাস, যে মুক্তির দিকে মানুষ সারা জীবন ধরে যাবার চেষ্টা করে, ভুল আর হতাশার কুয়াশা ভেদ করে। ব্যস্ততা আর ঔদ্ধত্যের কারণে সেই মুহূর্তটি যেন ফসকাতে না হয়, একেবারের বেশী দুবার আসে না সে মুহূর্ত। হাজার হাজার লোকের মধ্যে দেখে খুঁজে বার করে নিতে হবে সেই একজনকে যে সবকিছুর কথা বলবে। কিন্তু সেই জন কেমন, কি তার লক্ষণ কিছুই জানা যাবে না আগে থেকে, কিন্তু যে এই আলাপের সুযোগ হাতছাড়া করবে, তার ভাগ্য মন্দ,

তখন শেষ সহালাপী তার কাছে দেখা দেয় অন্য ভাবে, যেন মূর্তিধারণ করে কিন্তু আর সব পথভুলকরা লোকদের কাছে যেমন তেমনই ভয়ংকর আর নীরব...

আর জালালুদ্দিন তো... আজকের এই রাতে তার এমন ইচ্ছা হচ্ছিল কারুর সঙ্গে কথা বলতে, অন্য কিছু সম্বন্ধে, কোন মামুলী কথা; না মাসুদ বা উর-খানের সঙ্গে তাদের অভ্যস্ত কথাবার্তা — মঙ্গোলদের কথা বা অর্থ, ক্ষমতার কথা নয়। সে তো ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল: কে সে ? কেমনভাবে জীবনধারণ করে ? কি তাকে কষ্ট দিচ্ছে ? তার থাকার জায়গাটা কেমন ? এ বছরে ফসল কেমন হয়েছে ? খড় গাদা করা হয়েছে নাকি ? কোন জীবন্ত প্রাণীকে যা সে কখনও জিজ্ঞাসা করে নি।

কিন্তু তা জিজ্ঞাসা করা হল না, এখন আর বোঝার উপায় নেই ও-ই এসেছিল নাকি শেষ আলাপের জন্য। ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারার জন্য কার দোষ তা বোঝা যাচ্ছে না, হয়ত তার মনে সন্দেহ ছিল, গড়িমসি করেছিল হয়ত বা কেউ বাধা দিয়েছে, এক কথায়, বিফল হল সে...

ভোরবেলায় মঙ্গোলরা তাদের নাগাল ধরে ফেলল। যাতে সুলতানের তাঁবুটা আলাদা করে চেনা না যায় তার জন্য একই রঙের সব তাঁবু খাটান হয়েছিল, মঙ্গোলরা কিন্তু পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সোজা জালালুদ্দিনের তাঁবুর দিকেই ছুটে গেল যেন আগে থেকেই জানত তার জায়গা। কিন্তু সফল হল না তাদের ছুটে আসা। কতকগুলি দড়িদড়ায় পা জড়িয়ে কয়েকজন মঙ্গোল পড়ে গেল একসঙ্গে। দেহরক্ষীরা ঠিক সময়ে এসে পড়ে মঙ্গোলদের বাধা দিতে লাগল।

যতক্ষণ তাদের তলোয়ারের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল উর-খান ইতিমধ্যে সমস্ত লোককে জাগিয়ে তুলেছে। তারা সবাই জালালুদ্দিনের তাঁবু থেকে মঙ্গোলদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছুটে গেল, সুলতান কিন্তু কিছুই জানে না, গভীর ঘুমে মগ্ন। এই প্রথম যুদ্ধের গোলমাল তার কানে গেল না।

যখন সুলতানের দাসেরা তাঁবুর ভেতর ঢুকতে পারল, তখন দেখল সুলতান নিজের নরম বিছানায় ঘুমিয়ে নেই, তাঁবুর মাঝখানে গালিচার ওপরে কেমন এক অদ্ভুত অসহায়ভাবে গুটিয়ে শুয়ে আছে, হাঁটু এসে ঠেকেছে থুতনিতে।

আধোঘুমন্ত অবস্থায় তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল দরজার দিকে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে, গায়ে একটামাত্র সাদা জামা, ঘোড়ার ওপর তাকে বসিয়ে দিয়ে হাতে লাগামটা ধরিয়ে দেওয়া হল। পেছন থেকে কে যেন চাবুক মারল ঘোড়াটাকে আর ঘোড়াটা দৌড় আরম্ভ করার আগেই এমন লাফ দিয়ে উঠল যে সোনার দিনারে সজ্জিত রেশমের লাগামটা প্রায় ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম হল।

এই ঝাঁকানিতে জালালুদ্দিন পুরোপুরি জেগে উঠল। দেখল, কি প্রচণ্ড গতিতে তার পেছনে ধাওয়া করে আসছে মঙ্গোলরা, সাফল্যের আনন্দে জিভগুলো বেরিয়ে পড়েছে আর উর-খান তার দলবল নিয়ে তাদের পথে বাধা দেবার চেষ্টা করছে।

'উর! উর!* আ-আ-আ!..'

ঘোড়াটা জালালুদ্দিনকে নিয়ে গেল দুর্গের কাছে, তার প্রধান ফটকের দিকে যে ফটকটা মাসুদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুলতান আর তার লোকজনের সামনে সব সময়েই খোলা থাকার কথা।

জালালুদ্দিনের দিকে একটা তীরও ছুটে এল না, বোঝা যাচ্ছে মঙ্গোলদের ওপর হুকুম আছে তাকে জীবন্ত ধরার।

দূর থেকেই সুলতান দেখতে পেল আমিদের ফটক থেকে কিছু লোক বেরিয়ে এল। ওরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়েছে ভেবে সে উৎসাহিত হয়ে উঠল। কিন্তু যারা বেরিয়েছিল তারা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল খরেজমবাসীরা কেমন করে মঙ্গোলদের সঙ্গে লড়াই করছে, দেখে ফিরে গেল। তারপর ফটকটা যখন শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হল তখন জালালুদ্দিন ওখানে মাসুদকে দেখতে পেল।

'খরেজমবাসীদের মারো!' দুর্গের প্রাচীরের ছায়ার কাছে আসতে না আসতেই সে শুনতে পেল। 'ওরা আমাদের লুঠ করতে আসছে!' আর তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা জ্বলন্ত ফেঁসো. আর একটু হলেই তার চুলগুলো পুড়ে যেত...

উর! উর! আ-আ-আ... যুদ্ধের আওয়াজ ক্রমশঃ কমে আসছে. চীৎকার, গোঙানি ছোট জায়গাটায় এমন প্রতিধ্বনি তুলছিল যেন মৃত্যুর আগের শেষ কণ্ঠস্বর ডাক দিয়ে দিয়ে একে অপরকে খুঁজছে।

জালালুদ্দিন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল মঙ্গোলরা সারা

---

* উর — মার — সম্পাঃ

উপত্যকা জুড়ে তার সৈন্যদের কোণঠাসা করে ফেলেছে, তাদের কেটে ফেলে, ঘোড়ার পায়ের নীচে ফেলে দিচ্ছে। এইসব দেখে সে নিজের লোকেদের কাছে ফিরে যাবার জন্য ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, কিন্তু ঘোড়াটা সব সময়ই তাড়া খেয়ে বেড়িয়ে আর ইতিমধ্যে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে থাকায় তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ক্রমশঃ দূরে নিয়ে যেতে থাকল, আরো ওপরে — যেখানে সরু পায়ে চলা পথের বদলে আছে প্রশস্ত ক্ষেত্র — তারপর আবার সরু গিরিখাতের কুয়াশায় মিলিয়ে যায়।

ভাদ্র মাসের শেষ দিনগুলিতে পাহাড়ে নেমে এসেছে প্রচণ্ড স্তব্ধতা, বুনো বাদাম আর আর্চাগাছের ঝোপগুলিতে ঘন রং ধরেছে, পাহাড়ের গায়ে, পাথরে শ্যাওলা শুকিয়ে গুটিয়ে উঠে আসছে — সবকিছুতেই বিষণ্ণ আড়ষ্ট হয়ে যাওয়াভাব।

মনে হল চারপাশের এই দৃশ্য যেন কি করে ঘোড়াটার গতি কমিয়ে দিচ্ছে। বিপদ থেকে দূরে চলে এসেও সে একটুও ঢিলে দিচ্ছিল না, যদিও বারেবারে ভুল পা ফেলছিল, হোঁচট খাচ্ছিল। যেন সে অনুভব করছিল তার ঘ্রাণশক্তি দিয়ে যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফ দিয়ে যাতে সেই একাকী অশ্বারোহী চোখের আড়াল না হয়ে যায়।

কিন্তু অশ্বারোহী নিজে কিছুই লক্ষ্য বা অনুভব করছিল না। সে এই জায়গাটা ভাল করে দেখে চিনতে পারল. মনে পড়ল ছেলেবয়সে, বছর চোদ্দ আগে, গিরিপথের থেকে একটু উত্তরে এই পাহাড়গুলিতে সে এসেছিল।

তখন সুলতান মুহাম্মদ খালিফার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছিলের আর সেনাধ্যক্ষকে বলেছিলেন জালালুদ্দিনকে সঙ্গে নিতে. যুদ্ধে হাতে খড়ি করার জন্য। কিন্তু সেনাদল বাগদাদ পর্যন্ত গিয়ে পেঁছিতেই পারে নি। পাহাড়ে এত বরফ পড়েছিল যে অনেক লোক শীতে মারা পড়ে আর যারা ফিরে আসতে পেরেছিল কুর্দরা তাদের প্রতারণা করে সংকীর্ণ উপত্যকায় নিয়ে এসে লুঠ করেছিল।

পিতার কত গোপন, কত প্রকাশ্য আশা ছিল. কত কুটিলতা. ধূর্তামি ছিল — কিন্ত কি হল? বালিতে সব উড়িয়ে নিয়ে গেল. ধূলোয় ঢাকা পড়ল... সীমান্তশহর অতরারের কাছে চেঙ্গিজ খান দেখা দেওয়া মাত্রই সব অদৃশ্য হয়ে গেল। বিভিন্ন আঞ্চলিক সৈন্যাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রে দিশাহারা ও বিধ্বস্ত হওয়ায়, তাঁর লালসার জন্য সাধারণ লোকের তাঁর প্রতি উদাসীনতা,

এইসব কারণে যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই পিতা পিছু হঠতে লাগলেন; কারুর কাছেই একটুও সহানুভূতি পান নি, খালি পালাতে হয়েছে, তাঁর বংশ দু'শ বছর ধরে যা সংগ্রহ করেছে তা তিনি এক বছরে সব হারালেন। শেষ দিন পর্যন্তও আরো কিসের যেন আশায় ছিলেন তিনি, উচ্চাকাঙখা তাঁকে বাধা দিচ্ছিল সুস্থমস্তিষ্কে চারপাশ তাকিয়ে দেখতে, যখন মঙ্গোলরা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল আসুর-আদা দ্বীপে কুষ্ঠদের কাছে, তখনই কেবল তিনি তাঁর তরবারিটি দেন জালালুদ্দিনের হাতে।

ছেলে প্রতিশোধ নেবার জন্য বহুদিনই অস্থির হচ্ছিল। কিন্তু দেশহীন শাসক কেমন করে শক্তি সঞ্চয় করবে মঙ্গোলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। এমন একটা এলাকাও নেই যে যেখানে থেমে ভাল করে চারপাশ তাকিয়ে দেখবে — সব চলে গেছে শত্রুর দখলে। রাজধানী গুরগঞ্জ পড়েছে জালিয়াতদের হাতে, প্রতি সপ্তায় মালিক বদল হয়। এই সাহসী, কিন্তু কোপন স্বভাব ও অপরিনামদর্শী যুবকটিকে, যে এখনও কূটনৈতিক কলাকৌশল ভাল করে জানে না, রাজধানী স্বীকার করে নিতে চাইল না, তাড়িয়ে দিল তাকে আর নিজেই মঙ্গোলদেরকে শহরে প্রবেশ করার জন্য ফটক খুলে দিল। হ্যাঁ!

ছুটে বেড়াতে লাগল জালালুদ্দিন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে পিছু হঠতে হঠতে, তাদের শাসকদের বিতাড়িত করে, দেশবাসীদের হত্যা আর লুঠ করে; বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে সে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে নতুন রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করতে লগল। কিন্তু একত্রিত হল না, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব, হিংসা হিংসারই জন্ম দিল, তরবারির শক্তিতে সে মাজানদারান আর আরমেনিয়াকে তার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী করাতে পারল না...

এখন ঘোড়াটা তাকে পাহাড়ী পথ দিয়ে ক্রমশঃ ওপরে নিয়ে যাচ্ছে — জালালুদ্দিন চলেছে, এক অদ্ভুত বিষণ্ণ দিশাহারা ভাব, সময়ের কোন হিসাব নেই তার, সময় যে বয়ে যাচ্ছে তার চারপাশ দিয়ে তাও সে অনুভব করছে না — সূর্যের অবস্থান দেখেও না, ছায়া দেখেও না।

জন্ম থেকেই তার সময় সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম, কোনো জায়গায়ই ঠিক সময়ে গিয়ে উঠতে পারত না, দেরী করে ফেলত, সব জায়গাতেই সে অসময়ে গিয়ে উপস্থিত হত, হয়ত সেই কারণেই জায়গা, অঞ্চল সম্বন্ধে তার অনুভূতি আরো প্রখর হয়ে উঠেছিল। স্তেপভূমিতে, পাহাড়ে সে খুব

সহজ স্বাভাবিক বোধ করত, অত্যন্ত দ্রুত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পেঁাছে যেত, যার ফলে তার অনুসরণকারী মঙ্গোলরা সব থেকে অপ্রত্যাশিত জায়গায় তার আবির্ভাবে বিস্মিত হয়ে যেত।

কিন্তু সময়... সময় তাকে কোথাও ধরে রাখতে পারছে না — না ইসফাখানে, না জর্জিয়াতে, সবজায়গা থেকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বুদ্ধির অতীত প্রবাহ দিয়ে... এমনকি তার চরিত্রের গুণ — তার অসম-সাহসও তার সময়ের কাছে অপ্রয়োজনীয় পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দিল।

এখন ভাল করে লক্ষ্য করে সে বুঝতে পারল এই পথটা চলেছে মায়াফারিকিনের* দিকে, সুলতান যেখানে মালিক গাজীর কাছে আশ্রয় ও সমর্থন পাবে। কিন্তু সে এও অনুভব করল যে এ-ই হল শেষ পথ, এর পরে পথ বন্ধ। এর পরে তার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই — ওপরে মেঘের আড়ালে কুর্দদের বসতিতেও না আর নীচে স্তেপভূমিতে তার বিশ্বাসী তুর্কমেনীয়দের কাছেও না।

সমস্ত শেষ হয়ে গেছে, আবেগের উত্তাপ নিভে গেছে, দিনগুলি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, শেষের ঘণ্টা বেজেছে...

আশ্চর্য, পিতারও তো বয়স অল্পই ছিল, কিন্তু চল্লিশবছর বয়সে যখন জালালুদ্দিনের কোলে তাঁর মৃত্যু হয়, তিনি চলে যান নিরীহভাবে, কেমন যেন বার্ধক্যসুলভ স্বভাবে মাথা পেতে দণ্ডগ্রহণ করলেন, যেন তাঁর জীবনটা এমন অপ্রত্যাশিত ও অর্থহীন ভাবে থেমে যায় নি...

জালালুদ্দিন কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নিতে পারে নি। এখনও তার ভেতরে কি যেন একটু ক্ষেপে উঠছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যদিও এই ক'বছর ধরে সে বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছে, কোন কিছুতেই মাত্রাজ্ঞান নেই — না নিজের ক্ষমতার মোহে, না ধনসম্পদ, নারী দখল করায়; দেখা যাচ্ছে, তার এখনও অরুচি ধরে নি। সে অনুভব করছিল যে এই জীবনে এমন একটা কিছু আছে যা সে পরখ করে দেখে নি, জীবনের কোন এক অদৃশ্য, গোপন দিক তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই নাদেখা কোন কিছুকে পরখ করে দেখার জন্য সহজ সরল জীবনযাপন করতে হবে, ভুলে যেতে হবে অতীতকে, কার ঘরে তার জন্ম হয়েছিল, কোনদিকে হাত উঠিয়েছিল সব ভুলে যেতে হবে। যাতে কেউ মনে না রাখে, না জানে...

---

* মায়াফারিকিন — বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। — লেখক।

এই চিন্তাটা জালালুদ্দিনকে উৎসাহিত করল, জুতোর ডগা দিয়ে ঘোড়াটার পাঁজরে আঘাত করল সে, বর্শা হাতে নিয়ে যে কুর্দটা তাকে অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছিল সে অধৈর্য হয়ে একটু লাফিয়ে উঠল।

এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সহজেই শিকার ধরতে পারবে এই আনন্দে কুর্দটি দাঁড় দোলাতে দোলাতে সামনের সোজা পথ ধরে ছুটে চলল। সে জানত যে ঘোড়া তার সওয়ারকে নিয়ে নদীর কাছে এসে থামবে। মুখটা স্রোতস্বিনী নদীর জলে ডুবিয়ে ফেনা ধুয়ে নেবে প্রথমে, তারপর অনেকক্ষণ ধরে জল খেতে থাকবে...

কুর্দটি পথের ধারে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, আর আইন অনুযায়ী দূর থেকে কোন বাহিনী—যারই হোক, মঙ্গোলদের বা খরেজমবাসীদেরই হোক—দেখতে পেলে অন্য পাহারাদারকে জানাবে সংকেতে, সেই পাহারাদারটি আবার তার পরের জনকে, এইভাবে খবর তাদের বসতিতে পৌঁছে যাবার কথা। আর গ্রামের মোড়ল মুস্তাফা অনুপ্রবেশকারীরা সংখ্যায় কতজন তা জেনে স্থির করে তারা সরু গিরিখাতটা দিয়ে বেরিয়ে এলেই আক্রমণ করা হবে না দরওয়াজা খাত পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের অনুসরণ করা হবে। কুর্দরা নিজেরা তাদের বসতি আইন-দারে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল, কারণ সেটা ছিল পথ থেকে একটু দূরে, সেখানে ঢোকবার বেরোবার পথগুলি এমন নিপুণভাবে লুকান আর খাদগুলির উপর সেতুগুলি এমনভাবে ঢাকা দেওয়া যে নিজেদের লোকেরা ছাড়া আর কেউই সেগুলোকে দেখতে পাবে না।

একাকী অশ্বারোহী এই অঞ্চলে দেখা যায় কচিৎ কখনো। তাই বর্শাহাতে কুর্দটি প্রলোভনে পড়ে নিজের পাহারার জায়গা ছেড়ে চলল তার সঙ্গে, সে নিশ্চিত যে তার দলের লোকরা কেউ সেকথা জানতে পারবে না।

যে দিন থেকে শুরু হয়েছে এই অদ্ভুত যুদ্ধ (পাহাড়ীরা এই যুদ্ধকে অদ্ভুত বলে, তার কারণ ছোটখাট অর্থহীন কতকগুলো ঝগড়ার থেকে এই যুদ্ধের সৃষ্টি বলে তারা মনে করত, যেহেতু তারা কেউই জানত না পৃথিবীর মাটিতে কত দূর পর্যন্ত এই যুদ্ধ বিস্তৃত), পাহারা আরো জোরদার করা হয়েছে—এমন একদিনও যায় নি যে অনুসৃত হয়ে বা কাউকে অনুসরণ করে, যুদ্ধে মত্ত হয়ে পথ হারিয়ে কোন না কোন দল এখানে এসে হাজির হয় নি, কিন্তু একেবারে একা কেউ এদিকে পিছু হঠে আসে নি।

দুয়েকবার মঙ্গোলরা চারজন অশ্বারোহীর ছোট ছোট দল পাঠিয়েছে পাহাড়ে, যাতে তারা জায়গাটা ভাল করে দেখে তাদের পেছনে আসা

সৈন্যদলের যাবার জন্য পথ চিনে নেয় কিন্তু অশ্বারোহীরা ছিল এত সাবধানী আর তাদের ঘোড়াগুলো শিকারীকুকুরের মত এত সতর্ক যে তারা কুর্দদের নড়াচড়া দূর থেকেই বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি গাঢাকা দিয়েছিল।

অশ্বারোহীকে দেখেই কুর্দ মনে মনে চিন্তা করে নিল, কি নেবে ওর থেকে? তরবারি বা অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র ওর কাছে নেই, সাদা সালোয়ার-কামিজ বিশেষ লোভ জাগাচ্ছিল না। ঘোড়াটার হাবভাব আর দৌড় দেখে মনে হয় ভাল জাতের, অন্ধকার না নামা পর্যন্ত ওটাকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে, তারপর পাশের গ্রামে নিয়ে গিয়ে পারসীকদের কাছে বিক্রী করতে হবে।

কুর্দ এইসব কথা ভাবছিল অশ্বারোহীকে অনুসরণ করতে করতে আর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে। আর একটা অদ্ভুত জিনিসও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল — যখন অশ্বারোহী লাগামে টান দিচ্ছিল তখন সূর্যের আলো পড়ে কি যেন একটা জিনিস ঝকঝক করে উঠছিল বারবার। কি ওটা? হাতের একটা আংটির পক্ষে ওটা বড় বেশী ঝলক। কৌতূহল কুর্দকে আরো উত্তেজিত করে তুলল, সে এখন সব সতর্কতা ভুলে গিয়ে ছুটে চলল নদীর দিকে।

ওদিকে জালালুদ্দিন অনেকক্ষণ আগেই শুনতে পেয়েছে নদীর আওয়াজ, ঘোড়া ছোটাচ্ছিল সেদিকে কিন্তু পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়া চওড়া প্রবল জলের ধারা এমন হঠাৎ দেখা দিল গিরিখাতে যে ঘোড়াটা গতি সংবরণ করতে না পেরে প্রায় নদীর মাঝখানে গিয়ে পড়ল।

জালালুদ্দিন ঘোড়া থেকে নামল, হিমঠাণ্ডা জল তার খালি পা যেন জ্বালিয়ে দিল। শীতে কুঁকড়ে টলে গেল সে, কোন রকমে শক্ত মাটির ওপর পা রাখল। ঘোড়াটা জল শুঁকল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল তারপর জল খেতে লাগল একটু একটু করে, থেমে থেমে আর মালিকের দিকে তাকাতে লাগল।

জালালুদ্দিন অনুভব করল পাগলের মত ছুটেচলার উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে আসছে, তার গতিবিধি ধীরে ধীরে সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। অনেকদিন বাদে এই প্রথম কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই, চোখ না কুঁচকেই সে চারপাশে তাকাল: লাল বনগোলাপের ঝোপের দিকে, পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট্ট ঝরণাটার দিকে।

ঘোড়াটা পাথরে সাবধানে পা ফেলে ফেলে মালিকের পেছন পেছন যাচ্ছিল, তারপর তীরে এসে তার আপাদমস্তক শুঁকতে লাগল।

জালালুদ্দিন কে সে, কেন সে এই বন্য জনহীন এলাকায় পালিয়ে

এসেছে সে সবকিছু ভুলে বসেছিল কেমন এক অদ্ভুত উদাসীন ভঙ্গীতে। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে এসে দাড়িতে পড়ে চকচক করছিল আর যে কুর্দটা ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল তার দিকে, তার কাছে এই মুখটা কেবল জানা, দেখাই মনে হল না, মনে হল সে যেন কেমন সব সুদূর অনুভূতি, ঘোলাটে অথচ অস্পষ্ট স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। কিন্তু অতীতের কঠোর শৃঙ্খলাহীন জীবনের ছাপ পড়া এই উদাসীন মুখ কি বলতে পারে তাকে? আশ্চর্য! কুর্দ কেবল নিজের মনে স্থির করল: তার মতই খাটো কিন্তু মজবুত চেহারার এই যুবকটির সঙ্গে খুব সহজে পেরে ওঠা যাবে না, তা সে অস্ত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও।

শেষ পর্যন্ত কুর্দ ভাল করে লক্ষ্য করল যা এতক্ষণ ধরে চকচক করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল আর খুশী হয়ে উঠল এই ভেবে যে এতক্ষণ ধরে অশ্বারোহীকে সে বৃথা অনুসরণ করে নি। চোখের পলক না ফেলে সে জালালুদ্দিনের প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রাখছে, দেখল কেমন করে সে ঘোড়াটাকে ঝোপের দিকে টানল বাঁধবে বলে কিন্তু ঘোড়াটা ভেজা পাথরের ওপর পা দিয়ে হড়কে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে, লাগামটা ছিঁড়ে গেল আর তাতে লাগান দিনারগুলো ছড়িয়ে পড়ল তীরে। অন্যসময় হলে জালালুদ্দিন সেদিকে কোন মনোযোগ দিত না, বিশেষ করে সোনা, মণিমাণিক্য, হীরা, নীলকান্তমণি যতকিছুই ছিল ভূষণ অলংকরণ সে সবই তার কাছে ছিল চুমকি জরির মতন তার ক্ষমতার প্রতীক, কিন্তু এখন সে কেন কে জানে তাড়াতাড়ি করে দিনারগুলিকে কুড়োতে লাগল আর জামার নীচে লুকিয়ে ফেলল সেগুলি।

কুর্দটা ইতিমধ্যে দড়ির প্রান্তে ফাঁস লাগিয়েছে। সে বুঝতে পারল যে নদী পার হওয়ার জন্য কোন তাড়া নেই লোকটির তাই সেও ধীরে সুস্থে তৈরী হতে লাগল।

জালালুদ্দিনের এখনও একটু গোপন আশা ছিল যে তার অন্ততঃ কিছু সৈন্য সাহসী উর-খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলদের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এসে এই নদীর কাছে সুলতানকে খুঁজে পাবে। জালালুদ্দিনের মনে হল কোন অনুচর ছাড়াই মায়াফারিকিনের দ্বারে উপস্থিত হওয়া অপমানজনক, কারণ মালিক গাজীর ব্যবহার তার বরাবর বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হলেও এবারে হয়ত সে সুলতানকে অভ্যর্থনা জানাবে প্রায় প্রকাশ্য বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দ নিয়ে, জালালুদ্দিনের অবমাননা দেখে ছোট ছোট শাসকেরা চিরকালই এমনি করেছে।

জালালুদ্দিন উত্তপ্ত পাথরের ওপরে শুয়ে পড়ে আরাম অনুভব করল; বহুদিন খোলাখুলি রোদ আর হাওয়ার কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয় নি। নদীর আওয়াজে, পাখীর শিসের প্রতি তার মন নিবদ্ধ, সে খুশী মনে ভাবল: সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে সরে এসে একা হতে পারা কি ভাল, কি সুখের কথা...

জালালুদ্দিন যে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা বিপদাশংকার কথা, সমস্ত সতর্কতার কথা ভুলে গিয়ে একেবারে গা ঢিলে দিয়েছে, এটাই শুধু আশ্চর্যের কথা নয়। সবসময় বিতাড়িত, সবসময় অনুসৃত হওয়ার ফলে তার যে কোন আওয়াজ, গন্ধ অনুভব করার প্রচণ্ড ঘ্রাণশক্তি এখন যেন হঠাৎ ভোঁতা হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, তাই সে তার পিছনে কুর্দের নড়াচড়া কিছুই বুঝতে পারল না।

কেবল হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা উদ্বেগ খেলে গেল রাতে তার কাছে নিয়ে আসা সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ায়; সে ভাবল, এখন তার সামনে আসা যেকোন লোকই তার জীবনের শেষ সহালাপী হয়ে দাঁড়াতে পারে... কিন্তু চিন্তা বা উদ্বেগ বোধ করতে ইচ্ছা হল না, তখুনি আবার সব ভুলে গেল।

কুর্দ ওদিকে মাথার ওপর দড়ির ফাঁসটা তুলে ধরে লক্ষ্য স্থির করছে। সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে ছুঁড়ে দিল সে ফাঁসটা, আর সেটা হাওয়ায় শিস্ উঠিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল জালালুদ্দিনের গলায়; কুর্দ শুনতে পেল কেমন এক চাপা অদ্ভুত শব্দ, বেরিয়ে না আসা চীৎকার, যেন বহুদিন আগেই ফাটল ধরা কোন কিছু ভেঙে পড়ল। কুর্দের হাতের দড়িতে এখনও তেমন টান পড়ে নি, সাধারণতঃ যেমন হয়, একটু কাঁপছে কেবল তিরতির করে যেন তার শিকারের দেহে আর একটুও উত্তাপ নেই। লাফিয়ে পড়ে সে দড়িটা টেনে নিয়ে নিপুণভাবে এক ফাঁসেই তার হাতদুটো বেঁধে ফেলল, পাটা চেপে ধরল তার বুকের ওপর আর ভাবল, আশ্চর্য এই শক্তিশালী মজবুত চেহারার লোকটা কেন এমন নিরীহভাবে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, ছটফট করছে না, চেঁচাচ্ছে না, কেবল ঘড়ঘড় করছে, শিস্ দিচ্ছে হাওয়া গেলার চেষ্টায়।

ফাঁদে পড়া লোকটির এই দুর্বল শিস্, অস্পষ্ট স্বর শুনতে কুর্দের এমন ভাল লাগছিল, এমন উত্তেজিত করে তুলছিল তাকে যে তার আর তর সইছিল না লোকটিকে বর্শার এক ঘায়ে শেষ করে দিতে — এত সহজে সে আর কখনও শিকার ধরে নি, আর কখনও তার মনে হয় নি মানুষের জীবন

এত তুচ্ছ, এমন লোভ জাগান নরম। এই চিন্তায় তার গলার ভেতরটা এমন শুকিয়ে গেল যে তার মনে হল তার জিভটা ফুলে গেছে।

কুর্দ বর্শাটা তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখল তার শিকারের জামার ভেতর থেকে মোহরগুলো বেরিয়ে পড়ে চকচক করছে আর ঝিন ঝিন আওয়াজ তুলতে তুলতে গড়িয়ে যাচ্ছে জলের দিকে।

সে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল; ঘোড়াটা ডেকে উঠল, দড়ি থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টায় এক পাশে সরে গেল। জালালুদ্দিনের প্রথম ভয়টা কেটে গেছে, দড়িবাঁধা অবস্থায় সে বসে বসে উপেক্ষার হাসি নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল কেমন করে কুর্দটা মোহরগুলোকে ঠেলে ঠেলে ঢোকাতে লাগল পোশাকের কোমরের মধ্যে।

ইতিমধ্যেই সব বুঝতে পেরেছে জালালুদ্দিন। কিন্তু কেন, কি পাপে এমন হল ? যুদ্ধে সম্মানের মৃত্যু হল না কেন তার অথবা অন্ততঃপক্ষে পিতার মত কোন দ্বীপে বিতাড়িত হয়ে আত্মীয়জনের সান্নিধ্যে মৃত্যু ? বিভিন্নভাবে সে নিজের মৃত্যুকে কল্পনা করেছে কিন্তু কেবল লুঠেরার পদতলে নয়...

কুর্দটা সোনা ভালবাসলেও সোনা দেখে তার মাথা ঘুরে যায় নি – সেই প্রথম ঝোপের মধ্যে কাদের চলাফেরার আওয়াজ শুনতে পেয়ে শক্ত হয়ে গেল, বর্শাটা হাতে চেপে ধরে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

দু'জন অশ্বারোহী জলের কাছে লাফিয়ে পড়ল, 'আপ ! আপ !' শব্দ করে ঘোড়া থামাল। কুর্দ তাদের মধ্যে একজনকে দলনেতা মুস্তাফা বলে চিনতে পারল আর বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সমানে চোখ পিট পিট করতে লাগল।

অন্য দু'জনও কুর্দকে তাদের দলের লোক বলে চিনতে পারল কিন্তু মুস্তাফা সারা পথ মনে রাগ চেপে থাকায়, তার সঙ্গে কথা বলতে চাইল না। সকালবেলায় তারা রওনা দিয়েছে সেই মায়াফারিকিনের প্রবেশপথ থেকে। সেখান থেকেই সে মুখভারী করে কেবল একটা কথাই ভাবছে যে গাজী তার অনুরোধ রাখল না, বোধহয় খোলাখুলি তার সঙ্গে ঝগড়ার সূত্র খুঁজছে, কেমন করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। মুস্তাফার বদলে কথা বলল তার দেহরক্ষী।

'এটা তোর শিকার, আগুর ?' জালালুদ্দিনের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, আর জালালুদ্দিন অবাক আর খুশী হল যে তাদের ভাষা সে বুঝতে পারল। 'দারুণ...'

কুর্দ হতাশ রাগে পা ঠুকল তারপর হাতের মুঠোয় মোহরগুলো চেপে ধরে দু'তিন লাফে এগিয়ে গেল অশ্বারোহীদের দিকে।

'মুস্তাফা, আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব। তুমি বড় ভাগ পাবে... দিব্যি দিয়ে বলছি! কেবল বল নিহত ভাইয়ের জন্য গাজী আমাকে কি দাম দেবে ?!'

গাজীর নাম শুনে জালালুদ্দিন সতর্ক হয়ে কান পেতে রইল আর অবাক হতে লাগল শুনে যে তারা ফারসী ভাষায় কথা বলছে; এখন তার একটু গোপন আশা জাগতে লাগল যে হয়ত তাদেরকে সে নিজের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারবে...

অশ্বারোহী অধৈর্যের ভাব দেখিয়ে আগুরকে কাছে ডাকল আর যখন সে হাতে সোনার মোহরগুলি বাড়িয়ে ধরে আরো কয়েক পা' এগিয়ে গেল তখন বলল:

'কিন্তু তুই তো তোর চৌকি ছেড়ে এসেছিস।' বলে তার মুখের ওপর চাবুকের এক ঘা দিল দারুণ জোরে।

কুর্দ মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল আর ছুটে গেল ঝোপের দিকে, মুস্তাফা বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

দলনেতা তাকাল তার সঙ্গীর দিকে, জালালুদ্দিনের দিকে যেন তাদের তিরস্কার করল এই জন্য যে তারা এমন লজ্জাজনক ঘটনার সাক্ষী হল, তার উত্তরে জালালুদ্দিন নির্লিপ্ত উদাসীন মুখের ভাব দেখাল।

আগুর ঝোপের দিকে লাফ দিল, হাতের এক নিপুণ ঝাঁকানিতেই জালালুদ্দিনের ঘোড়াটা খুলে, তাতে লাফিয়ে উঠে বর্শাটা দোলাতে দোলাতে ছুট লাগাল; আর এ সমস্ত কিছু সে এমন দ্রুত গতিতে করল যে কেউ কিছু চিন্তা করে উঠতে পারল না — কেবল মুস্তাফা তার অনুচরের এমন দ্রুতগতি দেখে খুশীমনে তাকিয়ে রইল পাহাড়ের আড়ালে উধাও হয়ে যাওয়া ঘোড়াটির দিকে।

পাহাড়ে লুঠ করে নেওয়ার পর শিকারকে সাধারণত জীবন্ত রাখা হত না, কিন্তু মুস্তাফা ভাবল এবার তার ব্যতিক্রম হবে, ইঙ্গিতে দেহরক্ষীকে নির্দেশ দিল জালালুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে নিতে। মুস্তাফার মনে পড়ল কাল তার অতিথি হবে বুখারার সদাগর হাজী, তাকে সে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে দাস হিসাবে এই বন্দীকেও দেবে। আর হাজীকে অনুরোধ করবে সে যেন মায়াফারিকিনের শাসকের সঙ্গে তার ঝগড়ায় মধ্যস্থতা করে।

যুদ্ধ শুরুর থেকেই লুণ্ঠনের ভাগ ঠিক ঠিকই দিয়ে আসছে, যেহেতু তাদের লুটপাটের এলাকা গাজীর জমির মধ্যেও গিয়ে পড়েছে, কিন্তু কিছুদিন আগে তারা খরেজমবাসী ভেবে কিছু মায়াফারিকিনবাসীকে আক্রমণ করে বসে। এর উত্তরে মায়াফারিকিনবাসী দশজন কুর্দকে মেরে ফেলেছে, যার মধ্যে একজন হল আগুরের ভাই আর হুমকি দিচ্ছিল যে মুস্তাফা যদি ভালমত মুক্তিপণ না দেয় তবে তারা আইন-দার জ্বালিয়ে দেবে।

মুস্তাফার সঙ্গী ঘোড়া থেকে নেমে দড়ির প্রান্তটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জালালুদ্দিনের হাত দুটি মুক্ত করে দিল। জিজ্ঞাসা করল কৌতুহলবশে নয়, অপমান করার জন্য:

'কোথাকার লোক তুই ?'

জালালুদ্দিন অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু দড়ির ফাঁসটা গলায় আটকে থাকার জন্য কথা বলতে পারছিল না, কুর্দ দড়িটা ঢিলে করে দিল।

'আমি খরেজমের লোক,' কষ্টে উচ্চারণ করল জালালুদ্দিন, বহুদিন আগেই সে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে যে যখন সে সব শক্তি হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে কেমন তোতলাতে থাকে, যদিও ফার্সী আর তুর্কী দুটো ভাষাতেই তার সমান দখল।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হল না তাকে। দেহরক্ষী ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠল আর জালালুদ্দিনকে টেনে নিয়ে চলল পিছনে।

...উঁচু তীরের ওপর থেকে বসতি দেখতে পেল জালালুদ্দিন আর হঠাৎ তার মনে হল মুস্তাফা হয়ত তাকে বিশ্বাস করতেও পারে। প্রবীণ কুর্দটি ঘোড়ায় বসেছিল মর্যাদা নিয়ে, জীবনের ছোটখাট ঝামেলার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে—এমনকি চৌকি ছেড়ে আসা প্রহরীটির মাথায় মেরে নিজের চাবুকটা নোংরা করতে চাইল না—জালালুদ্দিন বুঝল যে এ শুধুমাত্রই লুঠেরা নয়, এ এমন একজন যাকে লুটপাট ছাড়াও কূটনৈতিক কলাকৌশলও জানতে হয়, একজন ছোট শাসক, যার লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত বাঁধা সন্ধি, শপথ আর ঐতিহ্য দিয়ে।

জালালুদ্দিন নিশ্চিত ছিল যে যদি মুস্তাফার সঙ্গে সামনাসামনি খোলাখুলি কথা বলা যায়, তার গোপন কথা জানান যায় তাকে, নিজের পরিচয় দেওয়া যায়, তবে তারা তাকে বুঝতে পারবে, সাহায্য করবে। মুস্তাফাকে সোনার লোভ দেখান যেতে পারে। জালালুদ্দিন মুস্তাফাকে বলবে তাকে মায়াফারিকিনে পেঁৗছে দিতে, এর বদলে সে গাজীর কাছে ভাল পুরস্কার পাবে।

জালালুদ্দিন ঘোড়ার পেছন পেছন ছুটছিল ঢাল ধরে, তার গলার দড়িটা কখনও ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল আবার যখন ঘোড়াটা অসাবধানে পিছল পাথরের ওপর পা ফেলছিল তখন চেপে বসছিল দড়িটা।

এইভাবে তারা এগিয়ে চলল বসতির দিকে, আগুর যে চুপিচুপি তাদের পেছন পেছন চলেছে তা তারা শুনতে পেল না।

চাবুকের আঘাত খেয়ে আগুর পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল, জানত যে তার পেছনে ধাওয়া করা হবে না — আজ হোক কাল হোক আগুর নিজেই মুস্তাফার কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করবে।

ঘোড়াটাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে সে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল — বন্দীর কি হল জানতে সে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। নীচুস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সে যখন দেখল যে তারা জালালুদ্দিনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। মুখের ওপর চাবুকের দাগটা ফুলে উঠেছে, কিন্তু তার কষ্ট হচ্ছিল অন্য কারণে — মুখের মধ্যে কেমন অদ্ভুত উত্তাপ, এমনকি জিভটা চেপে দেখল ফুলে উঠেছে নাকি...

আগুর নীচে ঝাঁপিয়ে পরে মুস্তাফার পিছনে দৌড়াবার কথা ভাবছিল কিন্তু এমন সময় নদীর কাছে ছুটে এল তিনজন অশ্বারোহী। ঘোড়া থামিয়ে তারা নদীর তীরে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে লাগল তারপর চিন্তিতভাবে চারপাশে তাকাল। তাদের মধ্যে একজন হল উর-খান আর কুর্দ বহুদিন এমন সোনা জরি মণিমাণিক্য লাগান দামী পোশাক পরা কোন অশ্বারোহীকে দেখে নি বলে গুঙিয়ে উঠল। অন্য দু'জন তুলনামূলকভাবে সাধারণ পোশাক পরা হলেও তাদের হাতে দামী অস্ত্রশস্ত্র, আমীরের পিছন পিছন তারা নদী পেরিয়ে গেল কার যেন পায়ের ছাপ খুঁজতে খুঁজতে।

যদিও আগুর বুঝল যে এই অশ্বারোহীরা এদিকে এসেছে সেই পথ ধরেই যেখানে আছে তার চৌকি আর ঐ অশ্বারোহীদের অত সোনাদানা যে তার হাতছাড়া হয়ে গেল এই জন্য তার একটুও মন খারাপ হল না। তার চিন্তা হচ্ছিল অন্য কারণে। মাঝে মাঝে বসে পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে সে ছুটে চলল গ্রামের দিকে, তার কষ্ট হচ্ছিল এই কারণে যে বন্দীটি তার লজ্জার সাক্ষী হয়ে রইল।

মুস্তাফার যাবার পথে পড়ল পাঁচটা ছ'টা চৌকি। প্রহরীরা পাহাড়ে বসে বা শুয়েছিল বল্লমটা পাশে রেখে, কিন্তু কেউই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের নেতাকে সম্মান জানাবার চেষ্টা করল না। সেদিকে মুস্তাফা কোন মনোযোগ

দিল না: তার মানে উচ্চতর পদাধিকারীর প্রতি এমন ব্যবহার কুর্দদের সমাজে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।

পাহাড়ে এর আগে জালালুদ্দিনকে অন্যান্য যে সব গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়েছে বাইরের থেকে দেখে যে গ্রামটার দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল তাকেও তেমনই মনে হল। একমাত্র যে ব্যাপারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তা হল এই গ্রামের লোকেরা। চাষবাসও করে না, গরুও চরায় না, এরা নিজেদের মন্দ ব্যবসাতেই নিযুক্ত, কিন্তু তাদের এ কাজও তাদের মুখেচোখে একটুও ছাপ ফেলে নি। তাদের মুখেচোখে কেবল আত্মসংযম আর ঔদাস্য।

যে প্রধান রাস্তাটা দিয়ে তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল জালালুদ্দিনকে সেখানে একটা ঝরনা আওয়াজ করে নেমে এসেছে নদীতে। গ্রামের মেয়েরা যারা জামাকাপড় কাচছিল বা নিজেদের কুটীরের কাছে বসে পশম বাছাই করছিল তারা এই তিনজনের দিকে তাকাল মাত্র একবার। জালালুদ্দিন উচ্চপদের অধিকারী বা শাসকের প্রতি অন্য ব্যবহার দেখে অভ্যস্ত, তাই তার সন্দেহ হল সত্যিই মুস্তাফা তাদের নেতা কিনা। কেবলমাত্র একজন বৃদ্ধ নদীর ধারে বসে জলে পা ডুবিয়ে কি যেন পাতা চিবোচ্ছিল, মুস্তাফাকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করল:

'কি, পাজী কেমন ব্যবহার করল তোমার সঙ্গে? তাড়িয়ে দিল?'

'শুনতেই চাইল না,' গুজগুজ করে বলল মুস্তাফা, 'এত সোনা চাইল...' রাগে শূন্যে চাবুক ঘোরাল।

'লড়ব, তাহলে।' বুড়ো হাতের তালুতে কয়েকটি পাতা দলে আবার মুখে পুরে দিল।

মুস্তাফা উপেক্ষার হাসি হেসে এগিয়ে গেল কোন কথা না বলে।

আগুর ইতিমধ্যে গ্রামে এসে পৌঁছেছে। নদীর কাছে নীচু হয়ে সে জল খেতে লাগল, খাচ্ছে কিন্তু তেষ্টা মিটছে না, জিভটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

যে কুটীরটার কাছে মুস্তাফা ঘোড়া থেকে নামল তার দৃশ্য বা ফটকের চেহারা কোন কিছুই এ রাস্তার অন্যান্য বাড়ীগুলির থেকে আলাদা নয়, দেহরক্ষী তার হাত থেকে লাগামটা নিয়ে আরো দূরে এগিয়ে চলল সঙ্গে মনিবের ঘোড়াটা নিয়ে, আর মুস্তাফা চীৎকার দিল:

'মাতো!'

বেরিয়ে এল এক মোটাসোটা চেহারার মেয়েলোক, স্বামীকে একটি কথাও না বলে তার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া ফাঁসের প্রান্তটা হাতে জড়িয়ে

নিল। একটু বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে কেবল তাকাল জালালুদ্দিনের দিকে। মুস্তাফা তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিল:

'কাল একে উপহার দেব হাজীকে। আর হাজী গাজীর সঙ্গে আমার মিটমাট করিয়ে দেবে...'

'আচ্ছা!' সমর্থনের ভঙ্গীতে বলে মাতো দড়িটা ধরে টানতে টানতে উঠোনে ঢুকল আর মুস্তাফা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল না, কোথায় যেন গেল কি কাজে।

যে উঠোনের মধ্যে জালালুদ্দিনকে নিয়ে আসা হল সেটার চারদিক তেরছা, বেঁকাভাবে বসান পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। আখরোট গাছের নীচে বড় ডেকচি থেকে ধোঁয়া উঠছে, গাছের ডালে বড়ছোট বিভিন্ন আকারের নাল ঝোলান। চামড়ার টুকরোটাকরা চারদিকে মেঝেময় ছড়াছড়ি।

'বোস!' মাতো বন্দীকে আখরোট গাছের কাছে নিয়ে এল, তারপর গাছের দিকে পিঠ করে বেঁধে ফেলল তাকে, হঠাৎ ভয় পেয়ে বাধ্য হয়েছে বন্দী। চলে যেতে যেতে মাতো কেমন যেন গোপন কথা বলার ভাবে বলল, 'ফাঁকা সময় জুতো সেলাই করতে ভালবাসে আমার বুড়ো... এমনি নিজের জন্য।' তারপর আস্তে আস্তে হেলতে দুলতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

যদিও তাকে ভেড়ার মত বেঁধে রাখা হয়েছে আর মহিলাটা তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে যেন তার জিভ নেই তবুও জালালুদ্দিন আগ্রহ নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল... চুলার ধোঁয়া নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অজানা অন্য জীবনের গন্ধ তাকে উত্তেজিত করে ভাবিয়ে তুলেছে।

কি করবে সে এখন? নিজের পরিচয় দেওয়া দরকার নাকি? মায়াফারিকিনে তার ভাগ্যের কি কোন পরিবর্তন হবে? সমস্তই তো শেষ হয়ে গেছে, আবেগের উত্তাপ নিভে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে...

আগুর ইতিমধ্যে এ বাড়ীর একেবারে কাছেই এসে পড়েছে। সেই বুড়ো আগের মতই পাতা চিবোতে চিবোতে এক মুহূর্তের জন্য থামাল তাকে:

'আগুর শুনেছিস? আমাদের মুস্তাফাকে গাজী তাড়িয়ে দিয়েছে। যারা মরল তাদের হয়ে কথা বলার কেউ রইল না আর। হায় হায়!' দু'হাত দিয়ে মাথাটা ধরে এমন ভাব করল যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

এর উত্তর আগদুর গালের ওপর হাত চাপা দিয়ে মুখে একটু আওয়াজ করল কেবল তারপর আবার দৌড় লাগাল।

'আর এটা?' ভাবল জালালুদ্দিন। 'এই যে নতুন কথাটা?'

ও যদি নতুন নাম নেয়, সাধারণভাবে জীবনযাপন করে, সাধারণ পোশাকে খালি পায়ে হাজীর উট চরিয়ে বেড়ায়? তাহলে কেমন হয়? কেমন করে সেই নতুন জীবন কাটান যায়? সে রাতে সেই মেয়েটিকে একথা জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে নি সে...

আগের জীবন শেষ হয়ে গেল আর এই অন্য জীবন সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই, এই অজ্ঞানতা তার ভয় ধরিয়ে দিল।

মাতো বাড়ীর থেকে বেরিয়ে এল কাশতে কাশতে। বাড়ীর দোরগোড়ায় বসে জালালুদ্দিনের দিকে না তাকিয়েই কুমড়ো কাটতে লাগল। পাঁচিলের ওপাশে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে মাথা তুলল, উদ্বিগ্নভাবে কান পেতে রইল আর যখন দেখল আগদুর কেমন অদ্ভুতভাবে বুকের কাছে বর্শাটা চেপে ধরে ছুটে এসে ঢুকল উঠোনে তখন সে নীচুস্বরে কি যেন গজগজ করল।

আগদুর জালালুদ্দিনের দিকে তাকাল, তারপর জিভটা বার করে আবার সেটাকে আঙুল দিয়ে ছুঁল।

চারদিক হিম হয়ে গেল যেন এমন মারাত্মক অদ্ভুত আর ভয়ংকর তার এই ভঙ্গী, জালালুদ্দিন কেঁপে উঠল, সে বাঁধা আছে সেকথা ভুলে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করল।

'মাতো!' চীৎকার করল আগদুর। 'খরেজমের এই লোকটা এখনও বেঁচে আছে কেন?!'

'কি বলছিস তুই? কি মতলব করেছিস?' মাতো আগদুরের পথ আটকাতে গেল ব্যস্ত হয়ে। 'ওর বয়স অল্প, হাজীর কাছে কাজ করুক...'

কিন্তু আগদুর ততক্ষণে লাফ দিয়ে পড়েছে আখরোট গাছের কাছে।

'আমার যে ভাইকে ওরা মেরে ফেলেছে সে আরো ভাল ছিল!' বলে সে সর্বশক্তি দিয়ে জালালুদ্দিনের মাথার ওপর বর্শাটা তুলল, আবার তার শুনতে ইচ্ছে হল, সেই হালকা শিস্, সেই অস্পষ্ট চীৎকার যা তার মনে ধাঁধাঁ ধরিয়ে দিয়েছিল...

এ হল হিজরার ৬২২ সনের গ্রীষ্মকালের শেষের ঘটনা। এর কয়েকদিন বাদে, শরতে, সাধারণত যেমন হয় অঝোরধারায় বৃষ্টি নামল পাহাড়ে।

নদী ফেঁপে ফুলে উঠে জালালুদ্দিনের দেহটাকে বয়ে নিয়ে এল মায়াফারিকিন শহরের একটা পুকুরে। গাজীর কাছে সুলতানের মৃত্যু হল বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে থাকা অজুহাত, সে আদেশ দিল আইন-দারের সব পুরুষমানুষকে মেরে ফেলতে আর গ্রামটা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে।

মায়াফারিকিনবাসীদের দলের নেতৃত্বে ছিল উর-খান আমীর, যে শহরে ঢুকে আসতে পেরেছিল আগুর তার চৌকি থেকে দূরে চলে গিয়েছিল বলে...

সূচী

কাইপের দ্বিতীয় যাত্রা	৩
ছোট জনবসতি অঞ্চল	৫৭
ডাক দাও মা	১৬১
আলোকপাতের মুহূর্তে	২৫১

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
বাড়ি নম্বর ৩৩, সি—১৪
তাশখন্দ—৭০০০১১
সোভিয়েত ইউনিয়ন

'RADUGA' PUBLISHERS
HOUSE No. 33, C-14
TASHKENT-700011
SOVIET UNION

'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৭ সালে
প্রকাশিত হয়েছে

মিরজা ইব্রাহিমভ। গল্প-সঞ্চয়ন

মিরজা ইব্রাহিমভ্ (জন্ম — ১৯১১ সাল) — সোভিয়েত আজেরবাইজানের গণলেখক, গদ্য ও নাট্যরীতির অনেক সাহিত্য রচনার লেখক, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের প্রবন্ধের সমালোচনামূলক এবং সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে রচনার স্রষ্টা।

এই বইটি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের দেশের বহুজাতীয় সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখকের সঙ্গে। লেখকের ছোট গল্পগুলি বহুদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাদের বাস্তবতায়। সেগুলিতে আছে উৎপাদনমূলক, প্রতিদিনের, নৈতিক এবং পারিবারিক সমস্যার চিত্র।

'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে

বরিস পলেভয়। মানুষের মতো মানুষ

১৯৪১ সালের শীতকালে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত জঙ্গী বিমানের বৈমানিক আলেক্সেই মারেসিয়েভ এক অসমান বিমান-যুদ্ধে ফ্যাশিস্টদের হাতে ঘায়েল হন। চূর্ণবিচূর্ণ দুটি পা নিয়ে, ঠাণ্ডায় প্রায় জমাট ও ক্ষুধার্ত অবস্থায়, প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করে আঠারো দিন পথ চলার পর তিনি নিজেদের লোকজনের কাছে এসে পেঁছান। সামরিক হাসপাতালে অপারেশন করে মারেসিয়েভের দুটো পা কেটে বাদ দিতে হল। এত কষ্ট সহ্য করার পরও এই মানুষটি নতুন শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করলেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে, ক্রমাগত তালিম দিয়ে মারেসিয়েভ তাঁর অবাধ্য শরীরকে বশে আনেন। তিনি নতুন করে বৈমানিকের উচ্চ দক্ষতা আয়ত্ত করলেন, ফিরে এলেন বাহিনীতে। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি রণাঙ্গনে ছিলেন।

'মানুষের মতো মানুষ' উপন্যাসে লেখক বরিস পলেভয় আলেক্সেই মারেসিয়েভের মুখ থেকে শোনা তাঁর জীবন ও কীর্তির সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

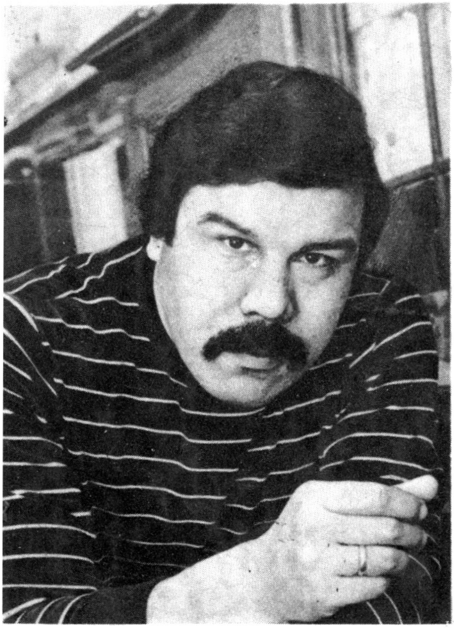

তিমুর পুলাতভের জন্ম ১৯৩৯ সালে বুখারা শহরে, যেখানে বহুদিন আগে থেকেই বহু জাতি-উপজাতির বসবাস। এখানে বাস করত তাজিক, উজবেক ও তুর্কমেনীয় জাতির লোকরা... তাই ছেলেবেলা থেকেই তিমুর পুলাতভ গড়ে উঠেছেন ‘প্রকৃত বুখারাবাসী’ — বহুভাষাভাষী হিসেবে। পরে শিক্ষালাভের সময় রুশভাষাও প্রবেশ করে তাঁর জীবনে। বর্তমানে তিমুর পুলাতভ — সুপরিচিত সোভিয়েত উজবেক লেখক। তাঁর মৌলিক, কল্পনাভিত্তিক (লেখকের নিজের মতে) উপন্যাসগুলি সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে খ্যাতি অর্জন করেছে, অনূদিত হয়েছে আরবী, উর্দু ও সুইডিশ ভাষায়।

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ‘কাইপের দ্বিতীয় যাত্রা’, ‘ডাক দাও মা’, ‘ছোট জনবসতি অঞ্চল’ উপন্যাসগুলি ও ছোটগল্প ‘আলোকপাতের মুহূর্তে’। পরস্পরের মধ্যে মিল নেই এই উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির কিন্তু পড়ার পক্ষে একই রকমের আকর্ষণীয়। প্রতিভাবান লেখকের এই সৃষ্টিগুলি পাঠককে তাঁর ধ্যানধারণা ও লেখক হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। লেখক কোন উপদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন না, কোন কিছু শেখাতে চাচ্ছেন না। তিনি যেন আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁর রচনাবলীর নায়কদের সঙ্গে মিলে ভেবে দেখার, আলোচনা করার জন্য, কোন কিছু নিয়ে তর্ক করার বা হাসাহাসি করার, আর হয়ত বা কোন কিছু স্বীকার করার...